জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

১৯৪৭-১৯৭১

২য় খণ্ড

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

(১৯৪৭ - ১৯৭৯)

২য় খণ্ড

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা
মাওলানা আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন মোল্লা

পরিবেশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (১৯৪৭ - ১৯৭৯)
২য় খণ্ড

প্রকাশক : আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

নির্ধারিত মূল্য : ২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Jamaate Islamir Itihas : 1947-1979 (2nd part).
Published by : Abu Taher Mohammad Masum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price: 240.00 (Two hundred forty) taka only.

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের কাহিনীই ইতিহাস। ইতিহাস প্রায়শঃই পুনরাবৃত্ত হয়। তাই অতীত জানা মানে বর্তমানকেই জানা। ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্যও তাই, অতীতের আয়নায় বর্তমানকে দেখে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। ইতিহাস পাঠে পাঠকের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়।

জামায়াতে ইসলামীরও রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। জামায়াত গঠনের লক্ষ্যে মাওলানা মওদূদী (রহ.) ১৯৪১ সালের ২৬ থেকে ২৯ শে আগস্ট এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে সারা ভারত থেকে ৭৫ জন মর্দে মুসলিম উপস্থিত হন এবং জামায়াতে ইসলামী হিন্দ গঠিত হয়। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী গোপন ব্যালটে সর্ব সম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচিত হন এবং দলের গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের একমাত্র রুকন ও মজলিসে শূরা সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন বাকেরগঞ্জ জেলাধীন পটুয়াখালী শহরের জনৈক উর্দুভাষী মাওলানা আতাউল্লাহ খান বোখারী। প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর সমগ্র ভারতবর্ষে এ নামেই পরিচিত ছিল দলটি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে স্বাধীনভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টো দেশ জন্ম লাভের পর জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান তখন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের পৃথক কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করে। বিভাগ পূর্বকালে নিখিল ভারত জামায়াতের মোট রুকন সংখ্যা ছিল ৬২৫ তার মধ্যে ২৪০ জন ভারতে থেকে যান এবং ৩৮৫ জন নিয়ে পাকিস্তানে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কাজ শুরু হয়।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত কোন সরকারই জামায়াতে ইসলামীকে স্বাভাবিক গতিতে কাজ করতে দেয়নি। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছিল দ্বীন বিজয়ের প্রত্যাশায় এ কাফেলাটি। আর এ আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) কে বার বার কারা প্রকোষ্ঠে বন্দি করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাতারাতি তাঁর জীবন লীলা শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাশীন কায়েমী স্বার্থবাদীদের সকল চক্রান্ত মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

ইকামাতে দ্বীনের প্রত্যয় দীপ্ত কাফেলাটি স্বাধীনতা পূর্ব আইউব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। আর তাই ১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার জামায়াতে ইসলামীকে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আমীরে জামায়াত ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৩ জনসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ষাটজন নেতাকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কারা প্রাচীরে আটকে রাখা হয়। জামায়াতের প্রতি এই জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হাইকোর্ট গুলোতে মামলা দায়ের করা হলো, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়। অত:পর ২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট জামায়াতকে নিষিদ্ধকরণ, নেতাদেরকে হয়রানি ও গ্রেফতারীকে অন্যায়, বেআইনি এবং বাড়াবাড়ি বলে ঐতিহাসিক রায় দেন। উল্লেখ্য, এই রায় যিনি ঘোষণা করেন তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস। এই রায়ের ফলে মাওলানা মওদূদীসহ সকল নেতা কারা মুক্ত হন এবং জামায়াতে ইসলামী সারাদেশে আবার কর্ম তৎপরতা শুরু করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠী এদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

এই বইটিতে প্রধানত জামায়াতে ইসলামীর ১৯৪৭-১৯৭৯ সালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ০৭ বছরের ইতিহাস অনেক আগেই প্রথম খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৪৭-১৯৭৯ সময়কালের ইতিহাস জানার আগ্রহ পাঠক সমাজের দীর্ঘ দিনের। সে দাবি বাস্তবে রূপদানের জন্য বেশ আগ থেকেই চেষ্টা চলছিল। অনেক পরে হলেও জামায়াতে ইসলামীর ১৯৪৭-১৯৭৯ সালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য পাঠক বৃন্দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকলে বা কোন পরামর্শ থাকলে তা আমাদের নিকট সরবরাহ করে কৃতার্থ করবেন আশা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
০৪ এপ্রিল ২০২২

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমীরে জামায়াতের কথা

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় মানুষের অতি পরিচিত একটি সংগঠনের নাম জামায়াতে ইসলামী। অনেক পথ পেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী আজ এদেশের গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)। যে প্রেক্ষাপটে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) জামায়াতে ইসলামী গঠন করেছিলেন তা হলো ১৯৪০ সালে যখন পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয় তখন তিনটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথমত দেশ বিভক্ত না হলে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কি করা যেতে পারে ? দেশ বিভক্ত হলে যে সব মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে ? দেশ বিভক্ত হলে মুসলমানদের অংশে যা পড়বে তাকে মুসলমানদের পরিচালিত অনৈসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত ? এসব প্রশ্নের সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানের জন্যই জামায়াতে ইসলামী নামে দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৪১ সালে মাত্র ৭৫ জন সদস্য নিয়ে নিখিল ভারতে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানে সংগঠনটি "জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান" নামে কাজ শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানে সাংগঠনিক কাজ যথারীতি শুরু হলেও কয়েক বছর পর পূর্ব-পাকিস্তানে কাজ শুরু হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে কাজ শুরু করেন বরিশালের কৃতি সন্তান মাওলানা আব্দুর রহিম। তিনি ১৯৪৬ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলায় শিয়ালকাঠি তাঁর নিজ গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম ইউনিট কায়েম করেন। তিনি ১৯৫২ সালের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৫ সালে অত্র শাখার আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কাছে তিনি আমীরের দায়িত্ব অর্পন করেন।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে সংগঠনে যোগদানের পর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দাওয়াত প্রদান ও সংগঠন সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করতে থাকেন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্বে জামায়াত এদেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠনে পরিণত হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জামায়াত কখনই কোন সন্ত্রাস করেনি এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে সমর্থন দেয়নি। শত বাধা প্রতিবন্ধকতাকে জামায়াতে ইসলামী সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মোকাবিলা করেছে। জামায়াতে ইসলামী একটি সন্ত্রাস ও ভায়োলেন্স বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র বানাতে চায়।

জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে বর্ণাঢ্য ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ২য় খণ্ড (১৯৪৭-১৯৭৯) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। গ্রন্থটি পাঠে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস জানার পাশাপাশি পাঠক সমাজ যেন তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই ফরিয়াদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.bjilibrary.com

—— সূচিপত্র ——

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কী ১৫
ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে ১৬
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন ১৬
জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৭
জামায়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠা লাভ ১৯
জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী ২২
পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী ২৪
দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও মাওলানা মওদূদী ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ ২৮
স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২৮
দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জামায়াতে ইসলামী ২৯
পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন যেভাবে শুরু ৩০
ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৩১
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা ৪৩
ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী ৪৬
জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা আব্দুর রহীম ৪৭
পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ইউনিট ৪৮
ঢাকায় কাজের সূচনা ৪৮
স্বাধীনতা উত্তর পাকিস্তানের নেতৃত্ব ৫০

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে স্মারক লিপি প্রদান ৫১
সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ৫৩
মাওলানা আব্দুর রহীমকে প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারি নিয়োগ ৫৪
পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াত প্রতিনিধিদের সফর ৫৫
পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রথম আমীর ৫৭
প্রথম প্রাদেশিক অফিস ৫৭
মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ৫৮
ফাঁসির কক্ষে মাওলানা মওদূদী ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

জনাব আব্দুল খালেকের জামায়াতে যোগদান ৬৯
অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে যোগদান ৭০
- অধ্যাপক গোলাম আযমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৭
- কারাগারে অধ্যাপক গোলাম আযমের রুকনিয়াতের শপথ ৭৯
- রংপুরে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক তৎপরতা ৭৯

অঞ্চলভিত্তিক সাংগঠনিক দায়িত্ব বন্টন ৮০
জনাব আব্বাস আলী খানের জামায়াতে যোগদান ৮১
সংগঠনের নির্দেশে আব্বাস আলী খান সাহেবের চাকরি থেকে ইস্তফা ৮৬

পঞ্চম অধ্যায়

করাচি রুকন সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল ৮৯
প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন ৯০
মাওলানা মওদূদীর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর ৯১
- ঢাকায় মাওলানার অবস্থান ৯৩
- মাওলানা মওদূদীর ৪০ দিনের সফর সূচি ৯৩
- সভা-সম্মেলনে মাওলানার আলোচনার বিষয় ৯৫
- মাওলানা মওদূদীর সফরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ৯৫

মাওলানা মওদূদীর সফরের পর ৯৬
আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা ৯৯

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) রাজনৈতিক চিত্র (১৯৫৫-৫৮) ১০০
প্রাদেশিক আমীর হিসাবে মাওলানা আব্দুর রহীম ১০২
প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযম ১০৩
মওলানা ভাসানীর নতুন দল ন্যাপ গঠন ১০৪
মাছিগেটে রুকন সম্মেলন ১০৪
মাছিগেটে রুকন সম্মেলনের পরে বাংলাদেশে জামায়াতের তৎপরতা ১০৬
তৃতীয় দফা কর্মসূচি যেভাবে চালু হলো ১০৭
ঢাকায় তিন দফা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ১০৮
পূর্বপাকিস্তান মন্ত্রিসভায় বার বার নাটকীয় পরিবর্তন ১০৯
ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যা ১১০
মাওলানার দ্বিতীয় সফর ও পৃথক নির্বাচন আন্দোলন ১১০
ক্ষমতার পালাবদল ও মার্শাল 'ল ১১২

সপ্তম অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সিরাত সম্মেলন ১১৪
মতিঝিলে দশদিনব্যাপী তারবিয়াতী ক্যাম্প ১১৫
- তারবিয়াতী শিবিরের আলোচক ও আলোচ্য বিষয় ১১৬

জামায়াতের তারবিয়াতী কার্যক্রম ১১৭
সামরিক শাসনের মাঝে সিরাত মাহফিল ও সেমিনার ১১৮
ঢাকায় মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত প্রতিষ্ঠা ১১৯
- তা'মীর মিল্লাতের উদ্যোগে ইসলামী সেমিনার ১১৯
- সেমিনারে পেশকৃত দারস, বক্তৃতা ও বক্তা ১২০

ইসলামী আন্দোলনে সেমিনার অনুষ্ঠানের অবদান ১২০

www.bjilibrary.com

অষ্টম অধ্যায়

সামরিক শাসন থেকে নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন পার্লামেন্ট ১২২
জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত (১৯৬২) ১২৩
জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১২৩
আইয়ুবের কুখ্যাত পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে জামায়াত ১২৪

নবম অধ্যায়

১৯৬২ সালের জুন মাসে জামায়াতে ইসলামীর পুনরায় কাজ শুরু ১২৭
ঢাকার নবাবপুরস্থ কার্যালয় যেভাবে হাত ছাড়া হল ১২৮
নালাখপাড়ায় নিজস্ব অফিস স্থাপন ১২৮
ঢাকা শহর অফিস ১২৯
নিখিল পাকিস্তান লাহোর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ১২৯
নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন ১৩০
- লাহোর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ ১৩৩
- লাহোর সম্মেলন পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠক ১৩৮

১৯৪৯-১৯৬৩ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন ১৩৯
সরকারের রোষানলে জামায়াত ১৪০

দশম অধ্যায়

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী ১৪১
মোনায়েম খানের শাসন ও ইসলামী আন্দোলন ১৪৩
পাক-ভারত যুদ্ধ ও জামায়াতে ইসলামী ১৪৪
আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতের ভূমিকা ১৪৫
শেখ মুজিবের ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফা ১৪৬
পিডিএমএর আট দফা ও জামায়াতে ইসলামী ১৪৮
ঢাকায় DAC (Democratic Action Committee) গঠন ও পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক ১৫০
- ডেমোক্রেটিক একশন কমিটির ৮ দফা দাবি ১৫০

গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব ও মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাতকার ১৫১
গোলটেবিলের শেষ বৈঠক ১৫৪
স্বৈরাচার আইয়ুবের আত্মসমর্পন ও ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ১৫৪
শেখ মুজিবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ ১৫৫
একটি ঐতিহাসিক শাহাদাৎ ১৫৭

www.bjilibrary.com

একাদশ অধ্যায়

জামায়াত কর্মীদের রক্তে রঞ্জিত পল্টনের জনসভা ১৫৯
পল্টনের জনসভা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী ১৬২
১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ ১৬৩
জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ১৬৪
নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াত বনাম আওয়ামী লীগ ১৬৫
জাতীয় সংসদ (পাক কেন্দ্রীয় গণপরিষদ) নির্বাচন-১৯৭০ ১৬৭
পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন-১৯৭০ ১৬৯
নির্বাচনে জামায়াতের প্রাপ্ত ভোটের পর্যালোচনা ১৭০
শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে জামায়াতের মুবারকবাদ ১৭০
নির্বাচনোত্তর সমস্যা ১৭১
ইয়াহইয়া খানের গড়িমসি ১৭৪
১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি ১৭৪
প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসাত্মক পদক্ষেপ ১৭৫
নির্বাচন পরবর্তী পৌনে তিন মাস ১৭৬
জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনোত্তর প্রথম বৈঠক ১৭৯

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি ১৮১
শেখ মুজিবুর রহমান ও আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের মধ্যকার আলোচনা ১৮৩
ঢাকায় আহুত গণপরিষদ মুলতবির প্রতিক্রিয়া ১৮৮
মুজিব ইয়াহিয়া ঐতিহাসিক সংলাপ ১৮৯
১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের আর্মি এ্যাকশন ১৯৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৬
কালো পঁচিশ ও মুক্তিযুদ্ধ ২০০
ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ ২০১
মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ২০৪
মুক্তি বাহিনী গঠন ২০৪
প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন ২০৮
প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তি বাহিনী ২০৮
ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতা চুক্তি ২১৩
পূর্বপাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠন ২১৪
লে. জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ ২১৫
আত্মসমর্পণ দলিল ২১৭
জামায়াত নেতৃবর্গের পশ্চিম পাকিস্তান সফর ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ২১৯

www.bjilibrary.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৯৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা ২২২
১৯৭১-এর পরিস্থিতি ও জামায়াতের বিশ্লেষণ ২২৫
জামায়াতের সামনে ৩টি পথ ২২৮
পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ভারত ভীতির কারণ ২২৯
রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করা এক কথা নয় ২৩৩

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা আগমন ২৩৭
শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ২৩৭
স্বাধীন বাংলায় আওয়ামী শাসন ২৩৮
জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন ২৪০
- মাওলানা মওদূদী ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন ২৪১
- আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি ২৪২
- নির্বাচনের জন্য প্যানেল গঠন ২৪৩

দালাল আইনে অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ২৪৪
জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন ২৪৫
স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর পুনর্গঠন ২৪৬
বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ২৪৭
অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আব্দুস সুবহানকে পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব ২৪৮
ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত ২৫০
দেশব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) ও তাফসির মাহফিল ২৫০
স্বাধীনতা উত্তরকালে ইসলামী রাজনৈতিক দল ২৫২

www.bjilibrary.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী ২৫৩
যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ক্ষমা ২৫৪
সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ২৫৭
মাওলানা আবদুর রহীম জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন ২৬০
১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী ২৬১
একদলীয় শাসন প্রবর্তন ২৬২
শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান ২৬৪
১৯৭৫ সনের নভেম্বর বিপ্লব ২৬৫

ষোড়শ অধ্যায়

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিরাতুন্নবী (সা.) সম্মেলন ২৬৮
বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি সরকারের মনোভাব ২৬৯
ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ২৬৯
বাংলাদেশে জামায়াতের তৎপরতা ২৬৯
বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ প্রতিষ্ঠা ২৭০
জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ ২৭২
১৯৭৭ সালের গণভোট ২৭৩
১৯৭৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২৭৩
অধ্যাপক গোলাম আযমের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ২৭৩
জামায়াতে ইসলামীর আমীর পদে উপনির্বাচন ২৭৪
একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন ২৭৫
১৯৭৯ সালের নির্বাচন ও আইডিএল ২৭৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ২৭৭

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কী

মহান আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণরূপে কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম করার যে জামায়াত বা দল তাই জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামী একটি পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। মানব জাতির কল্যাণের জন্য বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে তার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহী সংগঠনের নাম জামায়াতে ইসলামী। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে নিরন্তর এগিয়ে চলছে এই সংগঠন।

১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর সিটিতে জামায়াতে ইসলামী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ৭৫ জন এবং আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হয়েছিলেন সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত আলাদা দু'টি রাষ্ট্র হলে জামায়াতে ইসলামীও দু'ভাগ হয় এবং ৩৮৫ জন রুকন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে

মানব জাতির ইতিহাস যতো প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস তত প্রাচীন। এ আন্দোলনের ধারক বাহক ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবীগণ। মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরাম এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যার মধ্যে মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে প্রসিদ্ধ কয়েকজন নবীর সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত আছে।

নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহর বাণী ও বিধানের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি ও দেশকে যুগে যুগে বাতিল শক্তির সাথে মোকাবিলা করে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছেন। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) একটি চরম অসভ্য ও বর্বর জাতিকে শুধু ভয়ানক ধ্বংস থেকে উদ্ধার করেননি, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা আল কুরআনের আলোকে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে বিশ্বসেরা উন্নত এক সভ্য জাতিতে পরিণত করেছেন। মানবতার মূর্তপ্রতীক সেই সোনার মানুষগুলোকে নিয়ে তিনি এমন এক সোনালী সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছেন যার নজীর অতীত ইতিহাসে ও বর্তমানকালে পাওয়া যায় না। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) এ কাজটিই করে গেছেন। অতঃপর এ আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মাতে মুহাম্মাদী তথা মুসলমানদের উপর এবং এ ধারা যতদিন পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততদিন চলতেই থাকবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনাধীনে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) মুসলিম আইন উচ্ছেদ পূর্বক দ্বীনে ইলাহী নামে এক উদ্ভট ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী আইন তথা ইসলামকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম ভারতবাসীর প্রিয়ভাজন হওয়া। স্বার্থপূজারী অমুসলিম পণ্ডিত, পরিষদবর্গ এমনকি কবিগণ এবং কিছু ভ্রষ্ট আলেম আকবরকে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা ও প্রেরণা দান করেন।

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের এ চরম সংকট-সন্ধিক্ষণে ইসলামী আন্দোলনের হাতিয়ার নিয়ে মাঠে নামেন এক মর্দে মুজাহিদ হযরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সিরহীন্দ আলফেসানী (রহ.) (১৫৬৪-১৬২৪)। আকবরের পর দ্বীন-ই ইলাহীর ভক্ত-অনুরক্ত তার পুত্র জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে তাঁর সমস্ত রাজশক্তি দিয়েও দ্বীনে ইলাহীকে তার অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেননি।

মুগল সম্রাজ্যের পতনযুগে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) (১৭০৩-৬৩) কলম সৈনিক হিসেবে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইসলামী আন্দোলন না করলেও তিনি ইসলামী চিন্তাধারায় বিপ্লব সাধন করেন। পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখাসহ তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদের নেতৃত্বে তাহরিক মুজাহেদীন নামে এক সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয় এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। কিন্তু কতিপয় মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের সহায়তায় ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে শীর্ষ নেতৃবর্গসহ বহু মুজাহিদীন শাহাদত বরণ করেন। বালাকোট ট্রাজেডির ঠিক একশ বছর পর ১৯৩১ সালে বৃটিশ ভারতে নতুন করে আবার ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন আটাশ বছর বয়স্ক এক যুবক। তিনি হলেন সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯)। তিনিই স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অন্যতম বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বে তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া বাঞ্চনীয়। ১৯০৩ সালে হিন্দুস্থানের হায়দারাবাদ রাজ্যের (অন্দ্রপ্রদেশ) আওরঙ্গবাদ শহরে আহলে বাইত অর্থাৎ নবী বংশে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত হুসাইন ইবনু আলী (রা.) বংশের ৪২তম পুরুষ। তাঁর

www.bjilibrary.com

পিতা সাইয়্যেদ আহমদ হাসান মওদূদী (১৮৫৫-১৯২০) এবং মাতা রুকাইয়া বেগম অত্যন্ত পরহেজগার ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অল্প বয়সেই কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, মানতেক, আরবি সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় নিখুঁতভাবে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের বই পুস্তক পাঠ করে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯২০ সালে পিতার মৃত্যুর পরে সতেরো বছর বয়স্ক কিশোর মওদূদীকে জীবিকার জন্য সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করতে হয়। সাপ্তাহিক "তাজ" (পরবর্তীকালে দৈনিক) জব্বল পুরের একটি শীর্ষ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে, তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "মুসলিম" এবং পরবর্তীকালে "আল জমিয়তের" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে তথাকথিত শুদ্ধি আন্দোলনের উগ্র সম্প্রদায়িক নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জনৈক মুসলিম যুবকের হাতে নিহত হলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। মিঃ এম. কে. গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সহ হিন্দু নেতৃবর্গ বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের সকল দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও ইসলামী জিহাদের সকল অপ-ব্যাখ্যা ও অপ-প্রচার দ্বারা ভারতের সর্বত্র চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকেন। তৎকালে ভারতীয় আলেমগণের একমাত্র সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। এ সময়ে দিল্লীর জামে মসজিদে জুময়ার জামায়াতে প্রদত্ত এক আবেগময়ী ভাষণে সিংহপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের এতদসংক্রান্ত এক প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে মাত্র তেইশ বছরের যুবক মওদূদী "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" শীর্ষক ছয়শত পৃষ্ঠাব্যাপী এক তথ্যবহুল গবেষণামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পরিবেশনায় দারুল মুসান্নেফীন আযমগড় থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি মাওলানা মওদূদীর প্রথম প্রচেষ্টা হলেও তা ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, গভীর ইসলামী জ্ঞান ও শক্তিশালী লেখনী শক্তির স্বর্ণ-ফসল। তিনি নিজেই একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে ঐ গবেষণাই তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের চিন্তা ধারা বিনির্মানে তথা রাজপথে নিয়ে গেছে।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ

১৯৪১ সালের ২৫ শে আগস্ট লাহোরের পুঞ্চরোড, মুবারক পার্কে (ইসলামিয়া পার্ক) অবস্থিত তরজমানুল কুরআন কার্যালয়ে মাওলানা জাফর ইকবাল সাহেবের বাড়ির নিকট একটি ছোট বাড়ির ক্ষুদ্র কক্ষে সারা ভারত থেকে উপস্থিত ৭৫ জন মর্দে মুসলিম নিয়ে ২৬ থেকে ২৯ শে আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ গঠিত হয়। এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী স্বয়ং বলেন-

প্রকৃতপক্ষে এ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না যে, কোন এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ এক খেয়াল চাপলো যে, সে একটা দল বানাবে এবং কিছু লোক একত্র করে সে একটা দল বানিয়ে ফেলল। বরঞ্চ এ ছিল আমার ক্রমাগত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার ফসল যা একটা পরিকল্পনার রূপ ধারণ করে এবং সে পরিকল্পনার ভিত্তিতেই জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়। ("জামায়াতে ইসলামীর ঊনত্রিশ বৎসর উদযাপন" অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ)

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী গোপন ব্যালটে সর্ব সম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচিত হন এবং দলের গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়। আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম ভাষণে মাওলানা মওদূদী বলেন-

"আমি আপনাদের মধ্যে অধিকতর ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী নই। কিন্তু যখন এ বোঝা আমার উপর চাপানো হয়েছে, তখন আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করব যেন তিনি আমাকে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করেন। জামায়াতের শৃঙ্খলা ও তার আমানতের আমি হেফাজত করব। আশা করছি যে, যতোদিন আমি সঠিক পথে থাকবো আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন এবং যদি আমি ভুল করি, তাহলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। সর্বদা আমি যোগ্যতর লোকের তালাশ করব। এমন লোক পেলে আমিই প্রথমে তাকে সামনে এগিয়ে দেব। আমার জীবন ও মৃত্যু এ উদ্দেশ্যেই এবং আমাকে এ পথেই চলতে হবে। আর কেউ চলুক বা না চলুক আমাকে এ পথেই চলতে হবে।

www.bjilibrary.com

অবশ্য আমি এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত নই যে, এ কাজ চালাবার জন্যে যদি অন্য কেউ এগিয়ে না আসে, তাহলে আমিও এগিয়ে আসব না। এ আন্দোলন তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ কাজের দায়িত্ব আর কেউ না নিলে আমাকেই নিতে হবে। কেউ আমার সহযাত্রী না হলে আমি একাই এ পথে চলবো। গোটা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার বিরোধিতা করলে আমি একাকী তার মুকাবিলা করতে দ্বিধাবোধ করব না।"

বক্তৃতার শেষে মাওলানা বলেন-

"ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে লিখব-তা আমীরে জামায়াতের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে না। বরঞ্চ তা হবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি চাই না যে, এসব বিষয়ে আমার নিজের অভিমতকে অন্যান্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হোক। আর না জামায়াতের পক্ষ থেকে এমন কোন বাধানিষেধ আমার উপর আরোপ করা হোক যে, কোন বিষয়ের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা এবং তা প্রকাশে আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে।

জামায়াতের রুকনদেরকে আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে এ কথা বলছি যে, কেউ যেন ফেকাহ ও কালাম সম্পর্কিত আমার কোন উক্তি অন্যের কাছে চূড়ান্ত দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ না করেন। যিনি কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী, তিনি তার নিজের চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তিতে আমল করবেন এবং যার এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তিনি যাঁর প্রতি আস্থা রাখেন তার চিন্তা-গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের উপর আমল করবেন। এসব ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করার এবং স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার সকলের থাকবে।"

এ বক্তৃতার পর মাওলানা জামায়াতে ইসলামীর প্রথম মজলিসে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নিম্নের ব্যক্তিগণ শূরা সদস্য নির্বাচিত হন[১]

১। মাওলানা মনযুর নোমানী, বেরেলী।
২। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, সরাইমীর।
৩। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, লাক্ষ্ণৌ।

---

[১] *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।*

www.bjilibrary.com

৪। মাওলানা জাফর ফুলওয়ারী।
৫। জনাব নাযীরুল হক- মিরাঠী।
৬। মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দালভী- শিয়ালকোট।
৭। মাওলানা আবদুল আযীয শার্কী- জলন্ধর।
৮। জনাব নসরুল্লাহ খান আযীয-লাহোর।
৯। চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর- শিয়ালকোট।
১০। ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী- এলাহাবাদ।
১১। মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক।
১২। মাওলানা আবদুল জাব্বার গাজী।
১৩। মাওলানা আতাউল্লাহ বোখারী-বাকেরগঞ্জ।
১৪। জনাব কামরুদ্দীন খান-লাহোর।
১৫। মুহাম্মদ বিন আলী উলুভী।
১৬। মুহাম্মদ ইউসুফ-ভূপাল।

উক্ত প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের একমাত্র রুকন ও মজলিসে শূরা সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন বাকেরগঞ্জ জেলাধীন পটুয়াখালী শহরের মাওলানা আতাউল্লাহ খান বোখারী। তার তেমন কোনো বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

২৮শে আগস্ট (৪ঠা শাবান) মজলিসে শূরার নির্বাচনের পর নিম্নলিখিত বিভাগগুলো খোলা হয় :

১। শিক্ষা বিভাগ
২। কেন্দ্রীয় তরবিয়ত বিভাগ
৩। প্রচার বিভাগ
৪। সাংগঠনিক বিভাগ
৫। বাইতুলমাল
৬। দাওয়াত ও তাবলিগ বিভাগ।

২৯ শে আগস্ট সম্মেলনের শেষ দিনে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যে ও দাওয়াত প্রসারের জন্যে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে হবে।
- জামায়াতের রুকন সম্মেলন প্রতিবছর হবে।

www.bjilibrary.com

- জামায়াতের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের একটি প্রতিনিধিদল বছরে অন্তত একবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আঞ্জুমান, দ্বীনী মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছাবার চেষ্টা করবে।
- একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে।

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ ও তার নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এক সময় কংগ্রেসের এক জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯২৮ সালে অজ্ঞাত কারণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটে। উপ-মহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠিত করে রাজনীতিতে একটা স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা না চালিয়ে 'জমিয়ত' অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। কংগ্রেস মনে করতো হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ে মিলে একজাতি, জমিয়ত তাতে বিশ্বাস করতো। মাওলানা মওদূদী কোনদিনই জমিয়তের সাথে একমত হতে পারেননি, যার জন্য তাঁকে জমিয়তের সাথে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে হয়। পরিনামে তিনি ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীও কংগ্রেসের তথা জমিয়তের চিরশত্রুতে পরিণত হন। ১৯৩১ সালের ৩১ জুলাই মাওলানা মওদূদী দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ ফিরে আসেন। হায়দরাবাদের জনৈক আবু মুহাম্মদ মুসলেহ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসিক তরজমানুল কুরআনের' সম্পাদনার দায়িত্বভার মাওলানা মওদূদীর উপর অর্পিত হলে ইসলামী আন্দোলনে এক নয়াদিগন্তের সূচনা হয়।

১৯৩২ সালে উক্ত পত্রিকার মালিকানা খরিদপূর্বক তিনি স্বাধীনভাবে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ-ভারতে ইংগ-হিন্দু শাসন-শোষণে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে গোমরাহী যে রূপ ধারণ করেছিল এবং ইসলাম থেকে তাদের মধ্যে দৈনন্দিন যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা রুখবার জন্য মাওলানা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মাওলানার উপযুক্ত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন ও চেষ্টা-চরিত্রের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর "তানকীহাত" বই-এ যা বাংলায় "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" নামে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সময়ে দার্শনিক কবি ড.

www.bjilibrary.com

স্যার আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) মাওলানা মওদূদীর তরজমানুল কুরআন পাঠে মাওলানার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হন যে, তাঁকে হায়দরাবাদ থেকে পাঞ্জাব হিজরতের আহ্বান জানান। অতঃপর ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ মাওলানা চিরদিনের জন্য পৈতৃকভূমি হায়দরাবাদ ত্যাগ করে পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে "দারুল ইসলাম ট্রাষ্ট" গঠন পূর্বক ইকামতে দ্বীন ও ইশায়াতে দ্বীনের মহান কাজের সূচনা করেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এই মহান ব্যক্তিত্ব কুরআন-সুন্নাহ তথা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মানব জাতির মৌলিক সমস্যা ও তার স্থায়ী সমাধানের জন্য 'মহাসত্যের সন্ধ্যানে' ব্যাপৃত মানুষটি যেন নতুন করে হেরার জ্যোতিতে পরশ পাথর পেয়ে যান। সমকালীন অনেক ওলামা-মাশায়েখ যাচ্ছেন নানাপথে, কিন্তু তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত যেতে হবে, একমাত্র বিশ্ব নবীর (সা.) পথে। অন্য কেউ নয়, তাকে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসংকুল পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব কিছু জেনে বুঝে আবেগমুক্ত হয়ে তীব্র দায়িত্বানুভূতির সাথে ১৯৪১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন জামায়াতে ইসলামী।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষিত ও মাদরাসায় পড়ুয়া দ্বীনি শিক্ষিতদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের অপূর্ব সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটানো জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও অনন্য অবদান। জামায়াত বিরোধীরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকদেরকে মিলিত করে একই চিন্তা ও একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যৌথ নেতৃত্ব সরবরাহ করা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর কীর্তি।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

পাকিস্তান আন্দোলনের মূলে ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রেরণা ও দাবি। ঈমানের দাবিই হলো এই যে, মুসলমান সকল দাসত্ব-আনুগত্য, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, আইন-শাসন ও গোলামী প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও বিধানদাতা মহান আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব-আনুগত্যের জীবন যাপন করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই আইন-শাসন মেনে চলবে। মুসলমান ও মানুষের গোলামী-এ দু'টি কখনো একত্র হতে পারে না। সে গোলামী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হোক অথবা সাংস্কৃতিক ও মানসিক। এ কখনো সম্ভব নয় যে, মানুষের কোন প্রকার গোলামীর পরিবেশে মুসলমান তার ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারে। কারণ ইসলাম তাকে সকল প্রকার গোলামী ও আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একমাত্র রবের অনুগত বানিয়ে দেয়। তাই সত্যিকার মুসলমানের মেজাজ প্রকৃতিই এই হয় যে, সে তাগুত তথা আল্লাহবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে এবং তা উৎখাত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর শেষ নবীর (সা.) নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

ভারত উপমহাদেশে সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসন আমলে বিশেষ করে মুসলিম শাসকগণ যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যিকার মুসলমানী জীবন যাপন করতেন, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও ইসলামী চরিত্র গঠনের কাজ করতেন, তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন শাসক মুসলমানী জীবন যাপন করলেও মোগল শাসন আমলে চরম নৈতিক বিকৃতি ঘটে।

সাধারণত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও ইসলামী চরিত্র গঠনের কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়নি। ফলে নও মুসলিমদের অধিকাংশই ঐ সব মুশরেকি ও জাহেলী রসম-রেওয়াজের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি, যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মেনে চলতো। বাইর থেকে যে সব মুসলমান এ দেশে এসেছিল, তাদের অবস্থাও ভারতীয় মুসলমান থেকে তেমন বেশি ভালো ছিল না। পার্থিব ভোগ-

www.bjilibrary.com

বিলাসের প্রতি তাদের ছিল অধিক আগ্রহ-আসক্তি। শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেশ শাসন করা, ইসলামের কোন খেদমত তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল না।

বিশেষ করে বাদশাহ আকবরের শেষের দিকে তারই উদ্যোগে ভারতভূমি থেকে ইসলামকে নির্মূল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলেছিল। এ ষড়যন্ত্রে শুধু অমুসলিম অমাত্যবর্গই নয়, কতিপয় দুনিয়াপূজারী আলেম ও মুসলিম পণ্ডিতেরাও ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। 'দ্বীনে ইলাহী'র এক আপাত সুন্দর নাম দিয়ে নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুসলমানী নাম রাখা, খাতনা করা, গরুর গোশত খাওয়া, দাড়ি রাখা, মুসলমান মাইয়েতকে কবর দেওয়া প্রভৃতি এ নতুন ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল। নামায-আযান বন্ধ হয়ে গেল। বাদশাহকে সিজদাহ করার প্রচলন হলো। এ ধর্মে হিন্দুদের উৎসব দেওয়ালী, দশোহারা, রাখীপূর্ণিমা, শিবরাত্রি প্রভৃতি পালন করার ব্যবস্থা করা হলো। মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিক সমাজে পরিণত করার সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হলো। মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে তওবা করে এ ধর্মের শপথ গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে এবং আকবরের দরবারের হিন্দু অমাত্যবর্গকে খুশী করার জন্যে যে নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটানো হলো, সে ধর্মে আকবরের দরবারের কোন হিন্দু দীক্ষিত হননি। ইসলামের ইতিহাসে আকবরের ন্যায় এতো বড়ো ইসলামের শত্রুর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আকবর তার গোটা রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়েও কল্পিত ধর্মের গোড়া পত্তন করতে পারেন নি। তার কারণ এই যে, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিকৃতি যতোই ঘটে থাক না কেন, তাদের মনের অভ্যন্তরে ইসলামী চেতনা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিংগের মতো বিদ্যমান ছিল এবং তা প্রজ্বলিত করার জন্যে কিছু আল্লাহর পিয়ারা বান্দাহও এদেশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদেরই একজন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আকবরের নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

আকবরের পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করে 'দ্বীনে ইলাহী, ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হন। এ ধর্মের

www.bjilibrary.com

বিরোধিতা করার অপরাধে শায়খ আহমদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। জাহাঙ্গীর অবশেষে আলফেসানীর কাছে-নৈতিক পরাজয় বরণ করেন। আকবর তার ষড়যন্ত্রমূলক এক অতি অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি এ উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্য তথা মুসলিম শাসনের অধঃপতনের বীজও বপন করেন। তার ফলেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মুসলিম শাসনের রবি অস্তমিত হয়।

পলাশী থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইংরেজ শাসন কায়েমের ফলে মুসলমানরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেই অপসারিত হয়নি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদেরকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। এককালীন শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যে পরাজিতের মানসিকতা সঞ্চার হতে থাকে এবং তারা ইসলাম থেকে অধিকতর দূরে সরে পড়ে। ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাসে ফাটল ধরতে থাকে এবং তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দ্বীনদারী, অপরটি দুনিয়াদারী। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ ও সমাজ পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি দুনিয়াদারী মনে করে তা বর্জন করা হয় এবং জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে ইসলামের আংশিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু ক্রিয়াকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকে দ্বীনদারী মনে করা হয়। এ ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করে সুফীবাদ যা ক্রমশ বেদান্তবাদ, যোগবাদ, খৃস্টীয় বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম উম্মতের একটা অংশকে মোরাকাবা, মুশাহাদা, রিয়াযাত, কামালাত, প্রভৃতি জটিল দার্শনিক ব্যাখ্যার গোলক-ধাঁধায় নিক্ষেপ করে। আকবরের 'দ্বীনে ইলাহী' প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও তার বিষক্রিয়া মুসলিম ও নওমুসলিমদের একটা বৃহত্তর অংশকে এমনভাবে সংক্রমিত করে যে, কিছুটা মুসলমানী এবং কিছুটা হিন্দুয়ানী এমন এক মিশ্র সভ্যতা সংস্কৃতির জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি হয়।

www.bjilibrary.com

দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মাওলানা মওদূদীর অবদান

ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ময়দানে মাওলানা মওদূদীর এক নজীর বিহীন অবদান এই যে, তিনি হিন্দুদের এক জাতীয়তার জোরদার আন্দোলনের মুকাবেলায় স্বতন্ত্র ইসলামী জাতীয়তাকে সু-স্পষ্ট করে তোলেন এবং এই দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two Nation Theory) ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ তার ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগেই জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম শীর্ষনেতা মাওলানা হোসাইন আহম্মদ মাদানী (রহ.) 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত' শীর্ষক বই লেখে হিন্দু-মুসলিম এক জাতি বলে প্রচার করায় ভারতীয় মুসলমানেরা বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল রোগ শয্যায় থেকেও মাওলানা মাদানীর এই ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা করে কয়েক ছত্র কবিতা লেখেন।

ভারতীয় মুসলমানদের এই সংকট মুহূর্তে মাওলানা মওদূদী 'মাসয়ালায়ে কওমিয়াত' নামে একখানা বিপ্লবাত্মক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেকালে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ প্রধান মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী বলেন যে, মাওলানা মওদূদীর বইটির জনিপ্রয়তার কারণে ১৯৩৯ সালে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতাগণ এক কপি করে বই সাথে রাখতেন এবং উহার সাহায্যে এক জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ

১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে (প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ অলি আহাদের ভাষায় "সারা বিশ্বের অন্যতম ক্ষণজন্মা পুরুষ") কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর (১৮৭৬-১৯৪৮) সভাপতিত্বে বংগ-ভারতের অবিসংবাদিত জননেতা শের-ই-বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) প্রণীত ও পেশকৃত ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব কিংবা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত। উক্ত প্রস্তাবে ভারতীয় মজলুম মুসলমানদেরকে সংখ্যা গুরু অমুসলিমদের প্রভাব মুক্ত রেখে পৃথক একটি জাতি ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের যে সব এলাকায় মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ ঐ সব অঞ্চলে মুসলমানদের পৃথক রাজ্য কায়েমের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত বিভাগের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৪ই আগস্ট রাত থেকে তা কার্যকরী হয়। এরই আলোকে যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্ম।

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নিম্ন লিখিত নেতৃবৃন্দদের নিয়ে পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়[২]-

১) নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান- প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী
২) স্যার জাফরুল্লাহ খান (আহমম্মদীয়া সম্প্রদায়)- পররাষ্ট্র মন্ত্রী
৩) গোলাম মোহাম্মদ (আমলা)- অর্থ মন্ত্রী
৪) সরদার আবদুর রব নিশতার (সীমান্ত প্রদেশ)- যোগাযোগ মন্ত্রী
৫) শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল তফসিলী সম্প্রদায়, পূর্ব পাকিস্তান
৬) ফজলুর রহমান (পূঃপাক) শিক্ষা ও শিল্প
৭) পীরজাদা আবদুস সাত্তার (সিন্দু প্রদেশ) খাদ্য
৮) খাজা শাহাবুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান) তথ্য।

---

[২] *অলি আহাদ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫।*

www.bjilibrary.com

দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জামায়াতে ইসলামী

বৃটিশ সরকার ভারতভূমি ত্যাগ করার পূর্বে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) ক্ষমতা হস্তান্তরেরই কথা। কিন্তু তাদের অধীনে মুসলমানগণ তাদের জানমাল, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও তাহযীব-তামাদ্দুন নিরাপদ মনে না করে নিজস্ব আবাসভূমি পাকিস্তানের জন্যে সাত বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছে যা মেনে নিতে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়েছেন। অখণ্ড ভারতে একজাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হিন্দুদের হিংস্র মানসিকতার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। দেশের সর্বত্র মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে চরম বর্বরতা ও পাশবিকতার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। এ সময় মুসলমানদের তাজা খুনে বহু স্থানে ছিল হৃদয় বিদারক কারবালা। হাজার হাজার মুসলিম মহিলা ও বালিকা হিন্দু এবং শিখদের দ্বারা ধর্ষিত ও অপহৃত হয়। বিহার প্রদেশে সর্বাধিক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড হতে থাকে। একজাতীয়তা ও অখণ্ড ভারতের পতাকাবাহীগণ মুসলমানদের জনপদগুলো একটির পর একটি করে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। বহু মানব সন্তানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকার মুসলমান গৃহহারা ও সর্বস্বহারা হয়ে পড়ে। প্রতিদিন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোমহর্ষক ঘটনার খবর আসতে থাকে।

বিপন্নদের আশ্রয় ও ত্রাণ সাহায্য বিতরণের জন্যে পাটনা শহরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিলিফ ক্যাম্প উদ্বোধন করে জনাব আবদুল জাব্বার গাজীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দেশের প্রায় সর্বত্রই দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে জামায়াতের পক্ষ থেকে আশ্রয় শিবির উদ্বোধন, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাকরণ এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সারা দেশে হত্যা ও লুটতরাজের ব্যাপকতার তুলনায় জামায়াতে ইসলামীর ত্রাণকার্য অতি সীমিত হলেও জামায়াত কর্মীগণ জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তাদের এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু সংখ্যালঘু এলাকায় মুসলমানদের বর্বরতার কারণে যেসব হিন্দু বিপন্ন হয়েছেন, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে তাদেরও সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে জামায়াত কর্মীগণ আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

www.bjilibrary.com

ভারত বিভাগের তিন মাস পূর্বে ৯ ও ১০ মে ১৯৪৭ পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচির উপর মাওলানা যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন, তার বিষয়বস্তু 'ভাঙ্গা ও গড়া' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তার পূর্ব বছর (১৯৪৬) কলকাতা, বিহার প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ লোম হর্ষক ঘটনা ঘটে।

ভারত বিভাগের ফলে স্বাধীনভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টো দেশ জন্মলাভের পর জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের পৃথক কর্মসূচি ও কর্ম পদ্ধতি ঘোষণা করে। বিভাগ পূর্বকালে নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর মোট রুকন সংখ্যা ছিল ৬২৫ তার মধ্যে ২৪০ জন ভারতে থেকে যান এবং ৩৮৫ জন নিয়ে পাকিস্তানে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়।

পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন যে ভাবে শুরু

ভারত বিভাগের পরে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় দপ্তর লাহোরে স্থানান্তরিত হয় এবং মাওলানা মওদূদী পুনরায় আমীর নির্বাচিত হন। কিন্তু যে মহান উদ্দেশ্যে লাখ লাখ মুসলমান নরনারী জান মাল ও ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের চিন্তা ও চেষ্টা পরিহারপূর্বক নতুন রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ বৃটিশ প্রভুদের ছাঁচে চলা শুরু করে। রাষ্ট্রকে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার কোন বাসনাই বুঝা গেলনা। মাওলানা মওদূদী লাহোর আইন কলেজেও কয়েকিদন রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে ইসলামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপরে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহর মৃত্যুর পরে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) মাওলানার রেডিও ভাষণ বন্ধ করে দেয়া হলো। ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তিনি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সকল আইন প্রণয়ন সহ ৪ দফা দাবি পেশ করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধী মহল মাওলানার এসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে মসনদ হারানোর ভয়ে ভীত শংকিত হয়ে কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর (৪ঠা অক্টোবর ১৯৪৮) বিভিন্ন অজুহাতে মাওলানাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। কিন্তু এতে ইসলামী আন্দোলন বন্ধ করার বদলে দেশ-বিদেশে তা আরো ছড়িয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ প্রথম পূর্ব বঙ্গ সফরে আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে তাকে এক ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্র নায়কের প্রতি। তিনি ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তার ভাষণটি ছিল চমৎকার এক সময়োপযোগী ভাষণ। সে ভাষণে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি তার বক্তব্যে বলেছিলেন- পাকিস্তান সৃষ্টি যারা মেনে নিতে পারেনি সে সকল চক্রান্তকারীরা এখনও বসে নেই। তারা এখন তাদের কৌশল বদলিয়েছে। তারা আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। সে সকল চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্চার থাকতে হবে এবং আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা মন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। তাহলেই আমরা একটি আদর্শ ও শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে তুলতে পারবো। তার সেই ঐতিহাসিক বক্তব্যটি নিম্নরূপ:

"আসসালামু আলাইকুম।

আমি প্রথমে সম্বর্ধনা আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ঢাকাবাসী এবং প্রদেশের সবাইর নিকট, আমাকে এই সম্মান জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পূর্ব বাংলায় আমার এই সফর, আমার জন্য বড় আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশে পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান, একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরেই অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করছে। এই অঞ্চল সফর করার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে, আমার সফরের কিছুটা দেরি হয়ে গেছে।

আপনারা অবশ্যই কতগুলি জরুরি বিষয় জানেন যে, ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে কী ঘটনা ঘটে গেছে। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী এবং এর নিকটবর্তী এলাকাগুলি থেকে, ওখানে বসবাসরত লাখ লাখ মুসলমানদেরকে, তাদের জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব ভাগ্যাহত মুসলমানদের বাঁচিয়ে রাখা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে, এরূপ

www.bjilibrary.com

ঘটনা খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে যে, একটি নতুন রাষ্ট্রকে এত বড় কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানিতে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে, এই বিরাট এবং কঠিন সমস্যা অত্যন্ত যোগ্যতা ও সাহসের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দুশমনদের মনের বাসনা ছিল, পাকিস্তান জন্মের সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। শত্রুদের কামনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে, তাদের চাপিয়ে দেওয়া কঠিন সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান সক্ষম হয়েছে এবং পাকিস্তান দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশটির জন্ম হয়েছে, আমরা সেই লক্ষ্যপানে কাজ করে যাব।

এই সম্বর্ধনা সভায় যে সব বক্তৃতা হলো, তাতে আপনারা বলেছেন যে, বিপুল সম্ভাবনাময় এই প্রদেশের কৃষিখাত এবং শিল্পখাতকে জোরদার করে তুলতে হবে। প্রদেশের সকল তরুণ, যুবক এবং নারীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে এ অঞ্চলবাসী যেন যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, সে অবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নের কথা বলেছেন। পাকিস্তানের সাথে এই প্রদেশের যোগাযোগ সহজ এবং সুগম করার কথা বলেছেন। শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন। সবশেষে আপনারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, পাকিস্তানের এই পূর্ব অংশের প্রতিটি নাগরিক তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে যেন কোনভাবেই বঞ্চিত না হয় এবং সরকারের প্রতিটি স্তরে তাদের ন্যায্য হিস্‌সা নিশ্চিত করা হয়।

আমি এখনই আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আপনাদের উদ্বেগ নিরসন এবং ন্যায্য দাবিসমূহ কিভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়, আমার সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা সহকারে উল্লিখিত আপনাদের দাবিসমূহের অনেকগুলি বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে হাতে তুলে নিয়েছে এবং কোন রকম শিথিলতা ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে। বিষয়গুলি ভেবে দেখা হবে, এরকমের সময় নষ্ট করারও অবকাশ থাকবে না। পাকিস্তানের এই অংশ, তার ন্যায্য ও পূর্ণ পাওনা যত দ্রুত সম্ভব লাভ করবে। এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাস বলে, পূর্ববাংলার মানুষেরা শৌর্যে-বীর্যে, পরিশ্রমে এবং মেধায় অনেক যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। সরকার এ প্রদেশের তরুণ ও যুবাদের জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং প্রদানের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকার এদেশের যুবকদের তাদের নিজ দেশের সশস্ত্রবাহিনী এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের পথ খুলে দিয়েছে এবং খোলা থাকবে। আমি একথা জোর দিয়ে বলে যাচ্ছি, দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ববাংলার তরুণেরা সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, নিজ দেশকে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা

www.bjilibrary.com

করার জন্য জীবন বিলিয়ে দেবার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারবে না।

এবার আমি এদেশের অন্য আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সে কথা বলার আগে আমি পূর্ব বাংলার অধিবাসী এবং সরকারকে আরেকবার মোবারকবাদ জানাতে চাই এজন্য যে, গত সাত মাসে আপনারা দেশ গড়ার কাজে বহু কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভারত ভাগ হওয়ার পরপরই যে অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল, তার ঢেউ ঢাকার ওপরেও পড়েছে। সে অব্যবস্থাকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এখানকার অনুগত ও ত্যাগী প্রশাসন যে পরিশ্রম দক্ষতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা এবং সালাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ঢাকার সরকার নিজ দেশের মধ্যে যেন পরবাসী ছিল। ভারত থেকে চলে আসা হাজার হাজার সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এখানে মাথা গোঁজার মত, কোন স্থানেরই ব্যবস্থা ছিল না। গত বছরের (১৯৪৭) ১৫ আগস্টের আগে ঢাকা ছিল একটি মফস্বল টাউন মাত্র। সুশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারেনি, এমন একটি নবগঠিত প্রশাসনের নিকট বিরাট মাথা ব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ভারতের রেলওয়ে সহ অন্যান্য প্রায় ৭০ হাজার কর্মচারীদের পরিবার পরিজনদের আশ্রয় এবং পুনর্বাসন করা। ভারত বিভক্তির কারণে সৃষ্ট গোলযোগ, হুমকি এবং অনেকটা ভয়ের মুখে এসব লোকেরা কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে জীবন বাঁচাবার জন্য এখানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

একইভাবে এখান থেকে হিন্দুরা পাইকারীভাবে দেশত্যাগ করার ফলে প্রশাসনে হঠাৎ শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রশাসন, যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এই সময়ে প্রশাসনের সবচেয়ে জরুরি কাজ হয়ে দাঁড়ায়, কত দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সংগঠিত ও সচল করে তুলে প্রদেশকে অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে তোলা। আমাদের এই নতুন প্রশাসন কঠিন পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জাতিকে রক্ষা করেছেন। প্রশাসন সকল বাধা সরিয়ে ফেলে মানুষের জীবন যাত্রাকে স্বাভাবিক এবং সুগম রেখেছেন। আরেকটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রশাসন কেবল নিজেদের সংগঠিত করে তুলেনি; প্রশাসনের অব্যবস্থার সুযোগে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তাকেও মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার সুমহান দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছে।

একই সাথে এসব ব্যাপারগুলি সমাধানের জন্য জনগণ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ এ অঞ্চলের

www.bjilibrary.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির প্রতি। তারা এ রাষ্ট্র গঠনে এবং পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ভারত বিভক্তির পরবর্তী কয়েকটি মাসে, লাগাতারভাবে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর যে নারকীয় তাণ্ডব, জুলুম এবং হত্যা নেমে এসেছিল, এতসব উস্কানীর মুখেও এদেশবাসী চরম সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এত ভয়াবহ অবস্থা ঘটে যাওয়া স্বত্ত্বেও পূর্ববাংলায় এবারের পূজার সময় হিন্দু ভাইয়েরা প্রায় ৪০ হাজার মিছিল বের করেছেন। এসব মিছিলে কোন অশান্তির ঘটনা ঘটেনি এবং উৎসব পালনে কোন নির্যাতনের বা বাধার খবর আমার কাছে আসেনি।

যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক আমার সাথে একমত হবেন যে, গত কয়েক মাসে সারা ভারত জুড়ে যে মহাতাণ্ডব ঘটে গেল, তার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে কিছুই ঘটেনি। বরং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জানমাল নিরাপত্তায়, কঠোর নজর রাখা হয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, পাকিস্তান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম। কেবল ঢাকার সংখ্যালঘুরা নয়। সারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা অনেক দেশের চেয়ে এখানে অধিক নিরাপদ এবং জীবনহানি ঘটনার কোন শংকায় শঙ্কিত নন। আমরা যে কোন মূল্যে, কঠোর হাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে দেবো না। আমার সরকার কোনরূপ গণরাজত্ব অথবা বন্য গণআদালত সৃষ্টি হতে দেবে না।

আমি আবারও একই কথা উল্লেখ করছি, সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশে, ত্যাগ স্বীকারকারী একটি প্রশাসন গড়ে তোলা, অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য প্রায় ৪ কোটি মানুষের খাদ্যের সংস্থান এবং শান্তি বজায় রাখা আমার সরকারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। অনেকে প্রশাসনের এসব বিষয়কে বিবেচনায় আনতে চান না। এগুলি যে অতি সহজ সাধারণ ব্যাপার, তা ধারণা করাও মোটেই উচিত হবে না। সমালোচনা অতি সহজ, দোষ বের করা আরো সহজ। মানুষের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় জনতা অতি তাড়াতাড়ি সেসব ভুলে যায় এবং যেসব কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে তাও ভুলে যাবে। অথচ পাকিস্তানের আজাদীর সংগ্রামে আমাদেরকে কত পরীক্ষা, বিপদ, মুসিবত এবং খুন ঝরাতে হয়েছে এবং পাকিস্তান লাভের পর গত কয়টি মাসের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করতে কী সব দিন কেটে গেছে তা কী জনতার মনে পড়ছে ? মনে আছে কী?

প্রশাসনের কথা বার বার এসে যাচ্ছে। আমি জানি, আমরা যা যা আকাঙ্ক্ষা করছি তা পুরোটা বর্তমান প্রশাসন মিটাতে পারছে না অথবা এ শাসন ব্যবস্থায় অনেক খুঁত রয়ে গেছে। আমি বলিনা যে, এই অবস্থাকে উন্নত করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

এমনটাও নয় যে, একজন দেশপ্রেমিকের সমালোচনা গ্রহণ করা যাবে না। বরং সৎ সমালোচনাকারীদের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতে সাহায্য করুন। কিন্তু আমি যখন দেখি, কিছু কিছু মহল কেবল অভিযোগের পর অভিযোগ করে যাচ্ছেন এবং আমাদের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন; যেসব ভাল কাজ করা হয়েছে তার সামান্য প্রশংসা বা স্বীকৃতি দিতে বড় কুণ্ঠাবোধ করেন, তখন সরকারে যারা আছেন এবং প্রশাসনের নিবেদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যারা দেশের জন্য দিনরাত অক্লান্ত খেটে মরছেন তাদের মাঝে নেমে আসে গভীর হতাশা। আর এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আমি বেশি কষ্ট পাই।

ভাইদের বলবো, আমরা যেসব ভাল কাজ করেছি তার প্রশংসা না করতে পারুন তবে না করুন। অযথা অভিযোগ এবং সমালোচনা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না। একটা দেশের বিরাট প্রশাসনের মধ্যে অবশ্যই ভুলত্রুটি কিছু না কিছু ঘটতে পারে বা ঘটেছে। মানুষের পক্ষে শতকরা একশত ভাগ নির্ভুল ও সুবিচারপূর্ণ প্রশাসন নিশ্চিত করা সত্যি সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে, পাকিস্তানের প্রশাসনকে যতটা সম্ভব অন্যায় ও ত্রুটিমুক্ত রেখে সৎ, দক্ষ, গতিশীল, উপকারী এবং ন্যায় বিচারবোধ সম্পন্ন একটি কর্মচঞ্চল প্রশাসন হিসাবে গড়ে তোলা।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কীভাবে এ ব্যবস্থা অর্জন করা যেতে পারে? হ্যাঁ, সরকারের উদ্দেশ্যকে সামনে এনে সে ব্যবস্থা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেটা হলো সরকার কীভাবে জনগণের সেবা করতে চায়, সরকার কী কী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী কী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা জনগণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে হবে।

আপনারা জেনে রাখুন, সরকার বদলের ক্ষমতা এখন আপনাদেরই হাতে। আপনাদের যত দিন ইচ্ছা এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে পারেন এবং যখনই অপছন্দ হবে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিতে পারবেন। ক্ষমতার এই পরিবর্তন অনিয়মতান্ত্রিক পথ ধরে করা যাবে না। আপনাদের হাতে যে ক্ষমতা এসেছে, সেই অধিকারকে নিয়ম মোতাবেক প্রয়োগ করার চর্চাকে অনুশীলন করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার এবং পরিবর্তনের নিয়মগুলি রপ্ত করে নিতে হবে। শাসনতান্ত্রিক নিয়মের ভিত্তিতেই এক সরকারের বদলে অন্য সরকার আসবে এবং যাবে।

অতএব, সরকার বদলের ক্ষমতা এখন আপনাদের হাতে। আমি আপনাদের কাছে আকুল আরজ করবো, আপনারা আরো অধিক ধৈর্যের পরিচয় দিন। বর্তমানে যারা সরকারের হাল ধরে আছে তাদেরকে সমর্থন দিন। তাদের সাথী

www.bjilibrary.com

হোন। তারা যে, অসুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন এবং তাদের পক্ষে আপনাদের সকল সমস্যা রাতারাতি পূরণ করা যে অনেকটা অসম্ভব, সেটাও উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আপনারা সহযোগিতার হাত আরো বাড়িয়ে দিলে, আমাদের দেশের সমস্যা শুধু একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠার।

আমার সবিনয় প্রশ্ন এই লক্ষ জনতার কাছে, আপনারা কী আপনাদের এবং আপনাদের পূর্ব পুরুষদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটিকে রক্ষা করবেন নাকি আমাদের বোকামীর জন্য দেশটিকে ধ্বংস করে দেবেন? আপনারা কী চান এই দেশটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক? আমি জানি, আপনারা নিজ দেশের ধ্বংস চাইবেন না বরং জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে দেশটিকে রক্ষা করবেন। এজন্য দরকার একটি কাজের। সেটি হলো আমাদের সকলের মধ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্য এবং সংহতি। আপনারা জেনে রাখুন, আমাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত দেশটির মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের দুশমনেরা বসে নেই। আমাদের মধ্য থেকে, আমাদের মানুষকে বেছে নিয়ে, অর্থ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের সকল স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিতে তারা ইতিমধ্যে উদ্যত হয়েছে। আমার আকুল আহ্বান, আপনারা এসব ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন। এদের মনভুলানো এবং আকর্ষণীয় শ্লোগানের মায়াজাল থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করুন।

এরা বলা শুরু করেছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সরকার তাদের মাতৃভাষা বাংলা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হাতে নিয়েছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। আমি সুস্পষ্টভাবে এবং পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, আমাদের ঐতিহাসিক দুশমনদের এজেন্ট এবং অনেক কমিউনিষ্ট আমাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। আপনারা যদি এদের ব্যাপারে সজাগ না থাকেন তবে এরাই আপনাদের ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। আমি বিশ্বাস করি, ভারত থেকে পূর্ববাংলা বেরিয়ে আসাকে এরা মেনে নিতে পারেনি। এরা পূর্ববাংলাকে ভারতের সাথে মিশিয়ে দেখতে চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ষড়যন্ত্রকারীরা দিবাস্বপ্ন দেখছে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা কখনও তাদের দেশকে ভারতে মিশিয়ে নেবে না এবং মিশতে দেবে না। আমাকে জানানো হয়েছে যে, প্রদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বহুলোক দেশ ত্যাগ করেছে। ভারতের পত্রিকাগুলি দেশ ত্যাগের সংখ্যাকে দশ লক্ষেরও বেশি বলে মিথ্যা সংবাদ ছাপছে। আমাদের সরকারের হিসাব মতে এই সংখ্যা বেশি করে ধরলেও দুই লাখের উপরে যাবে না। এতে আমি একটা স্বস্তিবোধ করছি এজন্য যে, সংখ্যালঘু যেসব ভাইরা দেশ ত্যাগ করেছেন তারা কিন্তু মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের নির্যাতনের ফলে দেশ ত্যাগ করছেন না। আমাদের

www.bjilibrary.com

দেশের সংখ্যালঘুরা যে স্বাধীনতা এখানে ভোগ করছেন এবং নিজেদের সহায় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে গ্যারান্টি পাচ্ছেন ঠিক একই অধিকার ভারতের সংখ্যালঘুরা পাচ্ছেন না। তাদের দেশ ত্যাগের কারণগুলি তালাশ করলে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধবাজ নেতাদের বেফাঁস কথাবার্তা একটি অন্যতম কারণ। তারা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান ভারতের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ বেধে যাবে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন চলছে তার প্রতিক্রিয়া এখানেও দেখা দিবে। অমূলক এই ভয় এবং নির্যাতনের আশংকায় অনেক হিন্দু দেশ ত্যাগ করছেন। তাছাড়া ভারতের কতিপয় পত্রিকায় হিন্দুদেরকে, পাকিস্তান ছেড়ে আসার জন্য অবিরতভাবে লেখালেখি চলছে। এদের লেখাগুলির মধ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতনের মনগড়া ও মিথ্যা কাহিনীকে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারতের হিন্দু মহাসভা এদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। এত মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও এদেশে প্রায় সোয়া কোটি সংখ্যালঘু সমাজ শান্তিতে তাদের নিজ জন্মভূমিতে বসবাস করছে এবং অন্যদেশে যাওয়ার চিন্তা প্রত্যাখ্যান করছে। আমি আবার উল্লেখ করতে চাই, আমরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার প্রশ্নে কোন শৈথিল্য বা দ্বিধার সুযোগ রাখবো না। ভারতের চাইতে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জানমালের হেফাজত সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে আমরা কঠিন সংকল্পবদ্ধ। পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি এবং প্রতিটি মানুষের পূর্ণ নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, আমরা কোন সম্প্রদায়, শ্রেণি এবং জাতির বিভেদকে বরদাস্ত করবো না।

ভাল বলছি কী মন্দ বলছি জানিনা। সবার কাছে প্রীতিকর নাও হতে পারে। আমি কিছু নাজুক কথা এখন বলবো। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এখানে আসা অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কোন মহল স্থানীয় মুসলমানদের দিয়ে, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর পথ বেছে নিয়েছে। একই সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের অপেক্ষাধীন, রাষ্ট্রভাষা উর্দু কী বাংলা ভাষা হবে, তা নিয়ে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। আমি এও জানতে পারলাম যে, সুযোগ সন্ধানীরা তাদের দুরভিসন্ধিকে অর্জন করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসনকে বিব্রত করে তোলার জন্য ঢাকার ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। এই সভায় উপস্থিত আমার যুবক এবং ছাত্র বন্ধুরা, আমি তোমাদেরই একজন, যে কিনা তোমাদের জাতির ভালবাসার এবং তোমাদের বিকশিত জীবন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় গত দশটি বছর আরামকে হারাম করে দিয়েছি। ঈমানদারী এবং বিশ্বস্ততাকে বুকের ভিতরে চেপে ধরে জীবনের এ সময়গুলিকে ব্যয় করেছি। এরকমের একটি লোকের মুখ থেকে তোমাদেরকে সাবধান হওয়ার কথা শুনাতে চাই; তোমরা যদি কোন

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক দলের হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো, তবে যে ভুল ঘটে যাবে, তা হয়তো আর কোন দিন শোধরানো সম্ভব হবে না। তোমরা মনে রেখ, যে দেশটি এখন আমাদের, এটি একটি বিপ্লবের ফসল। বর্তমান সরকারতো আমাদের নিজেদের সরকার। আমরা তো এখন আর গোলাম জাতি নই। আমরা এখন একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক। আমাদের দেশকে আমরা কীভাবে চালাবো তা আমরাই ঠিক করে নেব। স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিকের মতই আমাদের আচরণ হতে হবে। কারো রাজত্বের অধীনে বা কোন বিদেশী কলোনীর মধ্যে আমরা এখন আর বাস করছি না। আমরা গোলামীর শিকল ছিঁড়ে ফেলেছি, উপড়ে ফেলেছি। আমার যুবক বন্ধুরা, আমার স্বপ্নের পাকিস্তানের তোমরাই নির্মাতা। তোমাদের কাছে আমার আকুল মিনতি, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। কারো চক্রান্তের শিকার হয়ো না। তোমরা নিজেদের মধ্যে সুমহান ঐক্য এবং সংহতি গড়ে তোল। যুবকরাই সকল কিছু বদলে দিতে পারে এমন নজির গড়ে তোল। তোমাদের আসল কাজ নিজেদের প্রতি সুবিচার করা। অর্থাৎ নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। পিতা-মাতাকে সম্মান করা আর স্বদেশ, স্বজাতির কল্যাণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখা। তোমরা যদি শিক্ষায়, গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পার তবে দেশ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শিক্ষিত দেশই কেবল শক্তিশালী দেশ হতে পার। আমি তোমাদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য আকুল আহ্বান জানিয়ে গেলাম। তোমাদের শক্তি, প্রতিভাকে যদি অপচয় করে ফেল তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গভীর মনস্তাপে সারাটা জীবন দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা কলেজ ইউনিভার্সিটির পড়াশুনা শেষ করে, পূর্ণ বিবেচনা করার শক্তির অধিকারী হয়ে, দেশকে গড়ে তোলার জন্য সত্যিকারের অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এতগুলি কথার মধ্য দিয়ে, আমি তোমাদেরকে পুনরায় হুঁশিয়ার করে জানিয়ে রাখতে চাইঃ পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলার যে বিপদসমূহের কথা আগে বলেছি, তা আমাদের উপর থেকে এখনও কেটে যায়নি। আমাদের ঐতিহাসিক দুশমনেরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে শত চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। তারা এখনও বসে নেই। এখন তারা তাদের কৌশল বদলিয়েছে। তারা এখন আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা খুঁজছে। আর তারা ভাল করেই জানে, আমাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা জাগিয়ে তুলতে পারলে, আমরা বিভক্ত হয়ে যাব এবং তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। আর আমরা যতক্ষণ না আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতাকে আমাদের মন থেকে, চিন্তা থেকে এবং রাজনীতি থেকে ছুঁড়ে ফেলতে না পারবো, ততদিন পর্যন্ত আমরা একটি শক্তিশালী ও আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত এবং গড়ে তুলতে পারবো না। আমরা কী এই পরিচয়ে পাকিস্তান করেছি যে, আমরা বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচী, পাঠান, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি

www.bjilibrary.com

অবশ্যই আমাদের জাতিসত্তার এক একটি ইউনিট। আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই তেরশত বছর আগে আমাদের কাছে যে হেদায়েত এসেছে, সে কথা কী আমরা ভুলে গেছি।

আমি ইতিহাসের সত্য কথাটি বলতে চাই, এই পাকিস্তানে আমরা যে যেখানেই বাস করছি, আমরা সকলেই বহিরাগত। এই বাংলায় যারা বাস করছেন, তারা কেউই এখানের আদি অধিবাসী নন। সুতরাং আমরা বাঙালি, আমরা পাঠান, আমরা পাঞ্জাবী বলে কী লাভ? আমাদের সকলের প্রথম পরিচয় আমরা মুসলমান।

ইসলাম আমাদেরকে এই কথাই শিক্ষা দিয়েছে। আমি মনে করি তোমরা আমার সাথে একমত হবে যে, আগে আমরা কি ছিলাম বা না ছিলাম, কিভাবে এখানে আসলাম, এসবের প্রাসঙ্গিকতার চেয়ে, বর্তমানে আমাদের প্রধান পরিচয় আমরা মুসলিম। প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা, তোমাদের একটি স্বাধীন দেশ হয়েছে। এটা ছোট্ট একফালি জমির দেশ নয়। এখন একটি বিরাট ভু-খন্ড তোমাদের হয়েছে, এই ভু-খন্ডটির মালিকানা কোন পাঞ্জাবীর, কোন সিন্ধির, কোন বেলুচির, কোন পাঠানের বা কোন বাঙ্গালীর নয়। এটি আমাদের, তোমাদের সবার। তোমরা একটা কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছো, যেখানে সকল ইউনিটের প্রতিনিধি রয়েছে। তাই বলতে চাই, তোমরা যদি একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাও, তবে আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের কাছে আরজ করছি, তোমরা প্রাদেশিক হিংসা, আঞ্চলিক ক্ষুদ্রতাকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বিভেদের আরো যেসব রয়েছে, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব এসবকেও দূরে সরিয়ে রাখ।

এ ধরনের বিরাজিত অবস্থা নিয়ে, পরাধীন আমলের সরকারগুলির মাথা ব্যথা ছিল না। তারা এরূপ অবস্থায় অস্বস্তিবোধ করতো না। তাদের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যের দিকে। ভারতবর্ষকে যেভাবে এবং যতভাবে শোষণ করা যায় তাকে নিরূপদ্রব রাখতেই আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নজর রাখতো। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, বর্তমান আমেরিকার কথা ধরুন, তারা যখন ব্রিটিশদের তাদের দেশ থেকে বের করে দিয়ে নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, তখন তাদের দেশে এত জাতি-গোষ্ঠী ছিল যার বর্ণনা শেষ করা যাবে না। স্পেনিক, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের নিজেদের ভিতর জাতিগত সমস্যা ছাড়াও, শত সমস্যা নিয়ে তারা সেখানে বাস করতো। লক্ষ্য করুন, এতসব সমস্যাকে কাটিয়ে তারা পৃথিবীর একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর আমাদের ভিতর এ ধরনের কোন জটিল সমস্যার অস্তিত্বই নেই। তাছাড়া,

www.bjilibrary.com

আমরা সবেমাত্র পাকিস্তান হাসিল করেছি। মনে করুন, আমেরিকায় ফরাসী বংশোদ্ভূত কেউ একজন যদি বলে, আমি একজন ফরাসীয়। আমি পৃথিবীর অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য। আমার এই এই গৌরব রয়েছে। অন্যরাও যদি অনুরূপ কথা বলতো, তাহলে পরিস্থিতি বা কী দাঁড়াতো? তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি করার যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং এর ফলে অতি অল্প সময়ে তারা, তাদের ভিতরকার সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং স্ব স্ব জাতি, গোষ্ঠীর বিভেদের দেওয়ালকে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তারা নিজেদের জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, স্পেনিক পরিচয় মুছে দিয়ে আমেরিকান হিসাবে পরিচয় দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের ভিতর নিজ দেশের জাতিগত চেতনা, এত শক্তিশালী হয়েছে যে, তারা এখন গর্বভরে বলে থাকে আমি একজন আমেরিকান অথবা আমরা আমেরিকান। সুতরাং এরকম করেই কী আমরা নিজেদের চিন্তা করতে পারি না? আমরা সবাই কী আমাদের দেশ পাকিস্তান, আমি, আপনি এবং আমরা সবাই পাকিস্তানী, এই ধারণাকে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি না? আমি আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ করে যাচ্ছি আপনারা প্রাদেশিকতা এবং আঞ্চলিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ফেলুন। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা রাজনীতিতে যদি প্রাদেশিকতার বিষ ঢুকে যায়, আপনারা কখনও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবেন না। পাকিস্তানকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার যে সংকল্প পোষণ করি, তা অর্জিত হবে না। আপনারা মনে করবেন না, আমি আপনাদের পরিচয়ের অমর্যাদা করছি। এরকম অবস্থার মধ্য দিয়েই ধ্বংসকামী দুষ্টচক্র জন্ম নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এরা এভাবে বলে থাকে পাঞ্জাবিরা বড় অহঙ্কারী আবার অবাঙ্গালি বা পাঞ্জাবিরা বলে থাকবে বাঙালিরা এমন, এমন। এরা আমাদের পছন্দ করে না, তারা আমাদেরকে এদেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এরকমের পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই দুশমনদের কৌশল এবং চক্রান্তের বিষাক্ত জাল। এ ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেলে সেটা সমাধান করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে বলে, আমার মনে হয় না। দেশপ্রেমিক ভাইদের প্রতি আহ্বান জানাই, এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

ভাষাকে ইস্যু করে, যা কিনা আমি আগেও বললাম, মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট। তিনি বলেছেন, এ বিষয়কে ইস্যু করে কোন নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মহল, দুশমনদের অর্থপুষ্ট কোন এজেন্ট যদি প্রদেশের শান্তি-শৃংখলা বা উন্নতিকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালায় তবে তা কঠোর হাতে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রদেশের অফিসিয়াল ভাষা যদি বাংলা করতে হয় তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার নির্বাচিত

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের রয়েছে এবং তারাই তা নির্ধারণ করবেন। আমি বিশ্বাস করি, এই সমস্যার সমাধান অবশ্যই এই প্রদেশের অধিবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যথা সময়ে নিষ্পত্তি ঘটবে। আমি পরিস্কার ভাষায় একথা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, বাংলা ভাষার প্রশ্ন নিয়ে এই প্রদেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনে, চাকরি-বাকরিতে কোনরূপ হতাশা, উদ্বেগ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ঘটবে না। আবারও বলছি এ প্রদেশের অধিবাসীরাই তাদের প্রাদেশিক ভাষা যথা সময়ে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। কিন্তু, আমি আপনাদের কাছে এ কথাটি পরিস্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই, নিখিল পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হতে হবে। কোন প্রাদেশিক ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে না। আর এ ব্যাপারে আপনাদেরকে যারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে তারা অবশ্যই পাকিস্তানের জানি দুশমন। রাষ্ট্রের যদি একটি রাষ্ট্র ভাষা না করা যায়, তাহলে সে রাষ্ট্রটিকে একটি শক্তিশালী ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বড় বড় দেশগুলি দিকে আপনাদের তাকাতে বলবো। যেসব দেশসমূহে রাষ্ট্রভাষা কয়টি এবং অধিকাংশের বোধগম্য ভাষাটিকে কী রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি? সুতরাং, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুই হওয়া দরকার। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার বিষয়টিও এ মুহূর্তের কোন বিষয় নয়। সময়ের প্রয়োজনের সাথে মিলিয়ে, রাষ্ট্র ভাষার বিষয়টির সুরাহা করা হবে।

বক্তৃতায় আমি বারবার যে কথা বলছি, তা হলো, প্রিয় দেশবাসী আপনারা পাকিস্তানের দুশমনদের মিষ্টি কথার ফাঁদে পা দিবেন না। এসব দুশমনরা স্বদেশের এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। এরা পঞ্চম বাহিনী। আমি দুঃখিত এবং ব্যথিত যে, এদের পরিচয়ে রয়েছে মুসলিম নাম। আমার এসব ভাইয়েরা সর্বনাশা ভুলের পথে পা বাড়িয়েছে।

আমরা কোন দেশদ্রোহমূলক তৎপরতাকে বরদাশত করবো না। আমরা পাকিস্তানের দুশমনদের সহ্য করবো না। আমাদের দেশে কোন বিশ্বাসঘাতকদের দেখতে চাই না। এসব পঞ্চম বাহিনীর সদস্যরা তাদের অপতৎপরতা এখনই বন্ধ না করলে, আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এসব নাশকতামূলক কাজ বন্ধ করতে কঠিন পথ বেছে নিবে। এরা জাতির জন্য বিষ।

আমি ভিন্নমত পোষণ করার অধিকারের বিষয়টি বুঝি এবং মানি। এদিক ওদিকে কেউ কেউ বলেছেন, আমাদেরকে কেনো একটি মাত্র পার্টিতে থাকতে হবে? অন্যটিতে নয় কেনো? এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য হলো এবং আশা করছি আপনারাও একমত হবেন যে, আমাদের অক্লান্ত মেহনত এবং সংগ্রামের ফসল হিসাবে, সবেমাত্র ৭ মাস হলো আমরা পাকিস্তানকে হাসিল করেছি। আর মুসলিম লীগের মাধ্যমেই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। এদেশের অনেক

www.bjilibrary.com

নের কথা বলবো, তারা আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহীতো বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধীতা করেছেন বা উদাসীন ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন যে, পাকিস্তান হয়ে গেলে, তারা সে সময়ে যে সুযোগ-সুবিধা বা মেয়ী স্বার্থ ভোগ করছিলেন, সেগুলিকে হারিয়ে ফেলবেন। এদের অনেকে আমাদের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে তৎপর ছিলেন। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে সকল ষড়যন্ত্র, ক্রোধ এবং বিরোধিতার বিরুদ্ধে প্রাণপন সংগ্রাম করে আমরা পাকিস্তানকে অর্জন করে এনেছি। সারা দুনিয়া অবাক বিস্ময়ে আমাদের এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এজন্য মুসলিম লীগ আমাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত। দেশবাসীর কল্যাণের লক্ষ্যে এবং দেশকে রক্ষা করার অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে আমাদের এই বিশ্বস্ত দলটিকে সুসংগঠিত করা দরকার নয় কী? নাকি হঠাৎ গজিয়ে উঠা দলসমূহ, যাদের নেতৃত্বে রয়েছে এমন সব লোকজন যাদের অতীত নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তাদের হাতে পাকিস্তানের নেতৃত্ব তুলে দিলে তারা বহু ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া দেশটির বিনাশ ঘটাবে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে?

সমবেত জনতা আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই আপনারা কি পাকিস্তান টিকে থাকুক তা চান কিনা? (জনতা উত্তর দিল চাই) আপনারা পাকিস্তান অর্জন করেছেন তার জন্য বেজার না খুশি। (জনতার উত্তর খুশি খুশি) আপনারা পাকিস্তানের অংশ স্বাধীন পূর্ব বাংলা ইন্ডিয়ার সাথে মিলে যাবে তা কি চান? (জনতার উত্তর না না)। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমি খুশি হলাম। আপনারা তাহলে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জেহাদে নেমে পড়ুন। পাকিস্তানকে গড়ে তুলতে সমৃদ্ধ করে তুলতে এ সময়ের দাবি হলো আপনারা মুসলিম লীগে শরীক হোন এবং দেশের খেদমতে নেমে পড়ুন। নতুন গড়ে ওঠা দলগুলির নেতাদের অতীতকে জানুন। এই মুহূর্তে আমাদের বিভক্ত হওয়া উচিত হবে না। আমি এসব দল সমূহের বিরুদ্ধে কোন মনোভাব পোষণ করিনা বা হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য আপনাদের আরো যদি দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় এমনকি জীবন কুরবানি দিতে হয় এসবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার এ দাবিটি জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করতে চাই। একটা জাতির কল্যাণের জন্য একটা দেশকে গড়ে তোলার পেছনে আপনাদের মেহনত বৃথা যাবে না। এই পথ বেয়েই আমরা পৃথিবীতে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং সম্মানিত জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে পারবো। শুধু জনসংখ্যার হিসেবে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হয়ে থাকতে চাই না, শক্তি সমৃদ্ধির সাথেই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতিগুলি থেকে শ্রদ্ধা সম্মান অর্জন করে নিতে চাই। এ কথাগুলি বলেই আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের তৌফিক দানের জন্য মুনাজাত করছি।"[৩]

---

[৩] অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫।

www.bjilibrary.com

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা

মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ওয়াদা করেছিলেন যে একটি স্বাধীন দেশ হাতে পেলে তাঁরা দেশটিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর তাঁরা সেইসব কথা বেমালুম ভুলে যান। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করেন পাকিস্তানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম উপযোগী না আমেরিকান প্রেসিডেনসিয়াল সিস্টেম, তা নিয়ে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে করাচির জাহাংগীর পার্কে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম রাজনৈতিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের প্রতি চারটি দফার ভিত্তিতে 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

দফাগুলো হচ্ছে-

- ❖ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর।
  সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।
- ❖ ইসলামী শারীয়াহ হবে দেশের মৌলিক আইন।
- ❖ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল করা হবে।
- ❖ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই শারীয়াহর সীমা লঙ্ঘন করবে না।

এভাবে জামায়াতে ইসলামী ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন শুরু করে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন

১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে গভর্নর জেনারেল হন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান। লিয়াকত আলী খান সরকার ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। প্রায় ২০ মাস জেলে রাখার পর ১৯৫০ সালের ২৮শে মে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করে, গণপরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে। প্রধানমন্ত্রী আস্থাশীল ছিলেন যে বহুধাবিভক্ত আলিম সমাজ এই জটিল বিষয়ে কখনো একমত হতে পারেবে না এবং কোন সর্বসম্মত প্রস্তাবও পেশ করতে পারবে না।

১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচিতে সারা দেশের সকল মত ও পথের ৩১ জন শীর্ষ আলিম একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে একত্রিত হন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী। এতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করেন। আলাপ-আলোচনার পর তা চূড়ান্ত হয় এবং এটি একটি মূল্যবান দলীল- "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি" হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

দফাগুলো ছিলো নিম্নরূপ :

১। দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
২। দেশের আইন আল কুরআন ও আসসুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
৩। রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার উপর সংস্থাপিত হবে।
৪। রাষ্ট্র মা'রুফ প্রতিষ্ঠা করবে এবং মুনকার উচ্ছেদ করবে।
৫। রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সম্পর্ক মজবুত করবে।
৬। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দেবে।
৭। রাষ্ট্র শারীয়াহর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবে।

www.bjilibrary.com

৮। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৯। স্বীকৃত মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দ্বীনি স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০। অমুসলিম নাগরিকগণ আইনের আওতায় পার্সোনাল ল' সংরক্ষণ ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১। রাষ্ট্র শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অমুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।

১২। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।

১৩। রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪। রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকবে।

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।

১৬। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্র প্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

১৭। রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর কাজের জন্য মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধ্বে হবেন না।

১৮। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।

১৯। সরকারি ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।

২০। ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।

২১। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

২২। আল কুরআন ও আসসুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ নীতিমালা বিপুল সংখ্যায় মুদ্রণ করে সারা দেশে ছড়ানো হয়। এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সারা দেশে বহুসংখ্যক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আর এর মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৭১ সালে দুনিয়ার মানচিত্রে যে ভূখন্ডটা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, এখানে ৮ম শতাব্দী থেকেই দ্বীন ইসলামের আলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিস্তার শুরু হয়। ১২০১ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বংগ বিজয়ের বহু আগেই আরব বনিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম দিয়ে এ এলাকায় দ্বীন ইসলামের আলো পৌঁছে। হযরত শাহ জালাল (র.) শাহ মাখদুম (র.) খান জাহান আলী প্রমুখের সাথে সমকালীন জালেম হিন্দু রাজা ও জমিদারদের চক্রান্তে এবং বেয়াদবীর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। সুতরাং ইতিহাস থেকে একথাই প্রমাণিত যে, শাসকের ধর্ম হিসাবে নয়, বরং ইসলামের সৌন্দর্য ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন মুসলিমলীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে পাকিস্তান ভূক্তির জন্য পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা যে স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে ভোট দেয় (শতকরা প্রায় ৯৪%) ভারতের আর কোন মুসলিম প্রদেশে এত বেশি ভোট পাকিস্তানের পক্ষে পড়েনি। পাশাপাশি ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ গুরুদাসপুর জেলা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে লাখ-লাখ মুসলমান অর্বণনীয় ত্যাগ-কুরবানির জজবা নিয়ে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে শূন্য হাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭-৫০ খৃ:) হিজরত করে ছিন্নমূল মুহাজির হিসাবে অমানবিক জুলুম নির্যাতনের নিষ্ঠুর শিকার হয়।

১৯৪৬ সালের ৫-৭ এপ্রিল উত্তর ভারতের এলাহাবাদ শহরের হরওয়ারা নামক বস্তিতে জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় ভারত ভিত্তিক রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এর সেক্রেটারি মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ কর্তৃক দেয়া রিপোর্টে ১৯৪৫-৪৬ সালের মার্চে মোট ৪৮৬ জন রুকনের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন বাংলাদেশের। উক্ত রুকন সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর সাথে মাওলানা আব্দুর রহীমের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হন।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা আব্দুর রহীম

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি বৃহত্তর বরিশাল জেলার কাউখালী থানার শিয়ালকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মোঃ খবীর উদ্দীন ও আকলি-মুননিসার ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা সন্তানের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম ছিলেন ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। ছারছিনা আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নেসার উদ্দীন আহম্মদের (১৮৭২-১৯৫২) বড় ছেলে মাওলানা আবু জাফর মুঃ সালেহ এর সহপাঠী মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ১৯৩৮ সালে ঐ মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে আলিম পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৪০ সালে ফাজিল ও ১৯৪২ সালে কামিল-উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত হন এবং মাদরাসার কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে (১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে) কুরআন-হাদিসে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত হন।

মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৪৫ সালে কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে মুসলিম সংগঠনের প্রত্যক্ষ সমর্থনে এক বিশাল সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। তখন এদেশের আলেম সমাজের নিকট ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলে ধারণা ছিল না বা মনে করতো না। তারা ধর্মকে নিছক একটি ধর্ম মনে করতো এবং ইসলামী রাজনীতি করা নাজায়েজ মনে করতো। এই সময়ে কলকাতা জীবনের শেষ পর্যায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর উর্দুভাষায় লেখা কয়েক খানা ছোট বই বিশেষত 'ইসলামী হুকুমত কিস তারাহ কায়েম হোতি হ্যায়' পড়ে মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। তিনি মাওলানা মওদূদীর ঠিকানা যোগাড় পূর্বক তাঁকে চিঠি লিখেন, জবাবে মাওলানা মওদূদী মাওলানা আব্দুর রহীমকে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়ে তাঁর বৈপ্লবিক স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। এমনি এক সময়ে এ ভূ-খণ্ডে তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েমের জন্য ১৯৪৫ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

www.bjilibrary.com

পূর্ববংগ ও আসামের প্রথম ইউনিট

১৯৪৬ সালে ৫-৭ এপ্রিল এলাহাবাদের রুকন সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ২৮ বছরের যুবক মাওলানা আব্দুর রহীম। বর্তমান পিরোজপুর জেলার কাউখালী পৈতৃক থানাধীন শিয়ালকাঠি নিজ গ্রামের ১০/১২ জন যুবকসহ বেশ কয়েকজন লোক নিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রথম ইউনিট গঠন করেন।[৪] পূর্ববংগ ও আসামে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম হালকার (ইউনিট) আমীর ছিলেন আলহাজ্ব মৌলভী লেহাজ উদ্দীন। পেশাগতভাবে মাওলানা আব্দুর রহীম এই সময়ে নাজিরপুর থানাধীন রুঘুনাথপুর হাই মাদ্রাসায় হেড মাওলানা পদে চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি জামায়াতে ইসলামীর আরেকটি ইউনিট চালু করেন বলে প্রকাশ। রঘুনাথপুরে সর্ব ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির দু'জন সদস্য অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরেকজন সম্ভবত: ভবাণীসেন এ দু'জন কমরেডের সাথে প্রায়ই ধর্ম নিয়ে বিতর্কের ফলশ্রুতিতে মাওলানা ইসলাম ও কমিউনিজমসহ ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকখানা বই লেখেন।

ঢাকায় কাজের সূচনা

১৯৪৭ সালের শেষভাগে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হবার পরে কেন্দ্রীয় সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানেও কাজ চালানোর তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জনাব খুরশিদ আহম্মদ বাট নামে একজন সরকারি কর্মচারী ঢাকায় বদলী হন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানেও তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করবেন। তিনি ঢাকায় আসার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় জামায়াত থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম বাংলাভাষী রুকন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমকে বরিশাল থেকে ঢাকায় আসতে পত্র দেন। মাওলানা আব্দুর রহীম জবাবে জানান ঢাকায় থাকার জন্য কোন জায়গা ঠিক করে জানালে তিনি নির্দ্বিধায় চলে আসবেন। ঢাকার নীলক্ষেতে একটি প্রশস্ত কামরা ভাড়া করে মাওলানা আব্দুর রহীমকে জানানো হলে তিনি ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় আসেন।

---

[৪] *মাওলানা মওদূদী- জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর, প্রকাশকাল- ১৯৭০।*

www.bjilibrary.com

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি কেন্দ্র থেকে মাওলানা রফী আহম্মদ ইন্দোরীকে ঢাকায় পাঠানো হলে আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা জলিল আশরাফ নদভী সাহেব সহ নিম্নলিখিত চার ব্যক্তি ঢাকা শহরে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতি কাজ শুরু করেন :

১. মাওলানা রফী আহমদ ইন্দোরী
২. খুরশীদ আহমদ বাট
৩. মাওলানা কারি জলিল আশরাফ নদভী ও
৪. মাওলানা আব্দুর রহীম।

মাওলানা আব্দুর রহীম ছিলেন কলকাতা আলীয়া মাদরাসার একজন কৃতিছাত্র ও রিসার্চ স্কলার। চার জনের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম ব্যতীত তিনজনই ছিলেন উর্দুভাষী এবং সাংগঠনিক কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সে জন্য পুরাতন ঢাকার লালবাগ-নবাবপুর এবং নতুন ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকায় উর্দুভাষী মুহাজিরদের মধ্যে দাওয়াতি কাজের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের তখন অভাব ছিল এবং বাংলায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আহ্বানকারীও তেমন একটা ছিল না। তাই মাওলানা আব্দুর রহীম একই সাথে ইসলামী সাহিত্য এবং তাফহীমুল কুরআন অনুবাদের কাজ করেন এবং দায়ী ইলাল্লাহ হিসাবেও কাজ চালিয়ে যান। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎ করে মাওলানা আব্দুর রহীম তার পিতার অসুস্থতা ও মাওলানা মওদূদীর গ্রেফতারের খবর পান এবং তিনি তার পিত্রালয় কাউখালী চলে যান। ফলে প্রায় এক বছর দাওয়াতি কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি মাওলানা আব্দুর রহীম পুনরায় ঢাকা আসার পরে তাঁকে সার্বক্ষণিকভাবে আন্দোলনের উর্দু সাহিত্য বাংলায় তরজমা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সময়ে ইতিপূর্বে উল্লেখ্য তিনজন উর্দুভাষী ব্যতীত আরো কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ঢাকা শহরে কাজ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তারা হলেন :

১. মাওলানা মনযুর আহমদ জামেয়ী- আমীর, ঢাকা শহর;
২. শেখ আমীন উদ্দীন- বিহারের ছোট নাগপুর থেকে বগুড়ায় আসেন এবং ছোট একটি জর্দার দোকান শুরু করেন। আর সেখান থেকেই তিনি এবং তার ছেলে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

www.bjilibrary.com

৩. সাইয়্যেদ হাফিজুর রহমান- প্রতিষ্ঠাতা হেড মাষ্টার রহমাতুল্লাহ মডেল হাই স্কুল, লালবাগ, ঢাকা।

৪. খাজা মাহবুব এলাহী- প্রথম প্রাদেশিক সভাপতি পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ, পূর্বপাকিস্তান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর তরুন সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় ছাত্রদের সংগঠন, ইসলামী জামিয়তে তালাবা, পাকিস্তান। এ সংগঠনটি ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ নামে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৫৬-৫৮ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি ছিলেন মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী (১৯৩৬-৯২)। মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম এ ভূখন্ডে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজের সূত্রপাত হয়। ব্যারিস্টার কোরবান আলী ও মাওলানা আব্দুস সুবহান সে সময় সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীকে সহযোগিতা করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর পাকিস্তানের নেতৃত্ব

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ১১ সেপ্টেম্বর ইন্তিকাল করায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী (মুখ্য মন্ত্রী) খাজা নাজিম উদ্দীন গর্ভনর জেনারেল হন। ১৯৫১ সালে ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াব জাদা লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিম উদ্দীনকে (১৮৯৪-১৯৬৪) প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্ব পাঞ্জাবের গোলাম মুহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মালিক ফিরোজ খান নুন (১৯৫০-৫৩) ও মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব নূরুল আমীন। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলনের কঠোর প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি তখন দারুনভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হন। এ সময় পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন তুঙ্গে এবং এ আন্দোলনের প্রতি দুর্বলতার-অপরাধে (?) খাজা নাজিম উদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত পূর্বক তাঁর শূন্যপদে তৎকালীন আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলীকে (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। (১৭ মার্চ ১৯৫৩) ১৯৫৩ সালের ৩ এপ্রিল থেকে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান।

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে স্মারকলিপি প্রদান

১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম ময়দানে ডাকসুর পক্ষ থেকে এক বিরাট ছাত্রসমাবেশের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের ঢাকায় প্রথম আগমন উপলক্ষে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মারকলিপি দেবার উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন। ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে এতে শরীক হবার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৪৮-এর ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করার জন্য একটি মেমোরেন্ডাম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর (যিনি বিচারপতি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন) এবং পরবর্তীতে একটি কমিটি স্মারকলিপিটি চূড়ান্ত করে।

ইউনিভার্সিটি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মুয়াযযাম হোসেন তখন বিদেশে থাকায় ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব সুলতানুদ্দীন আহমদকে সভাপতিত্ব করতে হয়।

ছাত্র মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর সামনে মেমোরেন্ডামটি কে পাঠ করে শুনাবে এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি'র উপরই এ দায়িত্ব দেওয়া স্বভাবিক ছিলো। কিন্তু স্মারকলিপিতে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক দাবি-দাওয়ার তালিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ থাকায় সবাই একমত হলো যে, ঐ পরিস্থিতিতে একজন হিন্দু ছাত্রের হাতে প্রধানমন্ত্রীকে তা পেশ করা মোটেই সমীচীন নয়। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ডাকসু'র জিএস গোলাম আযমকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমাবেশে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র যোগদান করায় বিরাট জিমনেশিয়াম গ্রাউন্ডের বাইরের রাস্তাও ভর্তি হয়ে যায়। সভামঞ্চে সভাপতির ডানপাশে প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান আসন গ্রহণ করেন। পরবর্তী ঘটনা ডাকসুর তৎকালীন জিএস গোলাম আযম (পরবর্তীতে আমীরে জামায়াত) নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

> *"আমি যখন মাইকের নিকট দাঁড়ালাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, আমার মাত্র হাত দু'য়েক পেছনেই বেগম রানা বসা আছেন। আমি পড়ে শুনাতে শুরু করলাম। ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পাকিস্তানের সার্বিক সমৃদ্ধি ও*

www.bjilibrary.com

উন্নয়নে আমাদের সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্যের গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং প্রাদেশিক ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ মনোভাবের প্রতি কঠোর নিন্দাবাদ জানিয়ে যা পড়া হলো তাতে খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী টেবিলে হাত চাপড়ালেন। চমৎকার ইংরেজিতে রচিত স্মারকলিপিটি ধীর গতিতে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করে পড়ে শুনাচ্ছিলাম।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে লেখা প্যারাটি যখন পাঠ করলাম তখন সমাবেশের সবাই হাততালি দিয়ে জোর সমর্থন জানান। হাততালি দীর্ঘায়িত করার সুযোগ দেবার জন্য আমি থামলাম। পেছনে বেগম রানার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'লেংগুয়েজ কি বারেমে সাফ সাফ কাহ দেনা' (ভাষার বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দেবে)।

আবার পড়া শুরু করলাম। ভাষার দাবি সংক্রান্ত প্যারাটি আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে আবার পড়ে শুনালাম। সমাবেশে হাততালি আরও জোরে চললো এবং অনেকেই দাঁড়িয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করলো। হাততালি থেমে যাবার পর আবার দীর্ঘ মেমোরেন্ডামের বাকি অংশ পড়ে শুনালাম।

আয়নার বাঁধাই করা ফ্রেমে স্মারকলিপিটি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমার সাথে হাত মিলিয়ে নীরবে তা গ্রহণ করলেন।

এরপর তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। ঐ বছরই মার্চ মাসে কায়েদে আযম জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, আর কোন ভাষা নয়' উচ্চারণ শুনে আমি আরও কয়েকজন ছাত্র নিয়ে রাগ করে হলে চলে গেলাম। একদিন পর কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কায়েদে আযম ঐ একই কথা উচ্চারণ করার প্রতিবাদে কতক ছাত্র 'নো নো' আওয়াজ দিলে তিনি বিস্মিত হয়ে থামলেন।

আমি আশঙ্কা করলাম যে, প্রধানমন্ত্রী কায়েদে আযমের দোহাই দিয়ে নিশ্চয়ই ঐ কথাই উচ্চারণ করবেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি রাগত স্বরে বললেন, 'এসব যদি প্রাদেশিকতা না হয় তাহলে কাকে প্রাদেশিকতা বলা যায়?' ধমকের সুরে বললেন, 'দেশের স্বার্থে ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে আঞ্চলিকতাকে বরদাশত করা হবে না।'

আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেলো যে, যদি ভাষার ব্যাপারে কায়েদে আযমের মতো বলে ফেলেন এবং বেগমের পরামর্শ অনুযায়ী স্পষ্ট করে তেমন কোনো ঘোষণা দিয়ে বসেন, তাহলে না জানি কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমি তখন কী করবো? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে সমাবেশের হাজার হাজার ছাত্রের প্রচণ্ড সমর্থন সত্ত্বেও মঞ্চে আমার চুপ মেরে হযম করা কী করে সম্ভব হবে? প্রতিবাদে আমাকে দাঁড়িয়ে 'নো নো' বলতেই হবে।

আমি এ মানসিক অস্থিরতায় ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম প্রধানমন্ত্রীর সুর বদলে গেছে। তিনি অন্যান্য দাবি সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে লাগলেন। ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেবার পরামর্শ দিলেন।

www.bjilibrary.com

জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য হবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। তিনি বলতে পারতেন যে, একা আমার পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়। গণপরিষদ বা পার্লামেন্টই সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি সমাবেশের অবস্থা বিবেচনা করেই হয়তো ভাষার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। আমরা তাঁর বক্তৃতায় সন্তুষ্ট না হলেও প্রতিবাদ করার মতো সুযোগও পেলাম না। একজন চালাক নেতা হিসেবে তিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন।"

সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা (১৯৪৮-৫৬)

পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ সময় থেকেই মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে থাকেন। মার্কিন পারিকল্পনার ভিত্তিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি উপেক্ষার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ১৯৪৮ সালেই গঠিত হয়েছে এবং তারা মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে তমদ্দুন মজলিসের দ্বারা পথ নির্দেশ পেয়ে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করে।

১৯৫২ সালের মে মাসে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। অবশ্য আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' বাদ দেয়ার জন্য ১৯৫৫ সালে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৫৩ সালে হাজী মোঃ দানেশকে সভাপতি ও জনাব মাহমুদ আলীকে সম্পাদক নির্বাচন করে পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল নামে একটি বামপন্থী দল গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বৈদেশিক নীতিকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ক্রমশঃ দ্বিধাবিভক্তির দিকে আগায়। অত:পর ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ই ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ পূর্বক কাগমারী সম্মেলনে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।

www.bjilibrary.com

মাওলানা আব্দুর রহীমকে প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারি নিয়োগ

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় দাওয়াতী কাজের জন্য লোকের অভাব ছিল।

এমতাবস্থায় ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে কেন্দ্রের নির্দেশে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম যোগদান করেন এবং সম্মেলন শেষে সংগঠন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের সংস্পর্শে কিছুদিন কেন্দ্রে অবস্থান করেন। কেন্দ্রীয় জামায়াত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে একজন বাংলাভাষীকে কাজের দায়িত্ব অর্পন করলে কাজের অগ্রগতি হতে পারে। তদনুযায়ী ১৯৫২ সালের শেষদিকে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম করাচী থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং জামায়াতে ইসলামী পূর্বপাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সালের মে মাসে ঢাকাস্থ বনগ্রাম রোডে জামায়াতে ইসলামীর এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কতিপয় জামায়াত কর্মী ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট সুধী-সমর্থক যোগদান করেন যাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস ও বহু ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আবুল কাশেম, ড. নুরুল হক ভুইয়া প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। স্মরণযোগ্য ইতিপূর্বে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ উল্লেখিত ভাষা সৈনিক ও ছাত্র নেতাদের উদ্যোগে বাংলাদেশে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রয়াস তুঙ্গে ওঠে এবং সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। অবশ্য অধ্যাপক গোলাম আযম ব্যতীত আর কেউই পরবর্তীতে জামায়াত নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। স্বয়ং অধ্যাপক গোলাম আযম তখনো পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াত ও তামদ্দুন মজলিসের নেতা ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অধ্যাপক গোলাম আযম ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ জন্যে তিনি কারাবরণও করেছেন।

www.bjilibrary.com

পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াত প্রতিনিধিদের সফর (১৯৫২)

১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন জনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা প্রশমিত হলে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ছ'জন নেতৃস্থানীয় সদস্য এদেশে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ তথা সংগঠন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক সফরে আসেন। এ প্রতিনিধিদলে ছিলেন-

১। জনাব মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, লাহোরী (সাংবাদিক)
২। জনাব চৌধুরী আলী আহম্মদ খান, (অবঃ প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার)
৩। জনাব মাওলানা আব্দুল গফফার হাসান, আমীর শিয়ালকোট জেলা, পাঞ্জাব
৪। জনাব মুহাম্মদ বাকের খান
৫। জনাব মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আযীয শর্কী
৬। জনাব সরদার আলী খান, আমীর, সীমান্ত প্রদেশ।

প্রতিনিধি দল দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পরিকল্পিতভাবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা শহর এবং জনগুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর সফর করেন।

হযরত শাহ জালাল ইয়ামনীর পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত সিলেট ও বাণিজ্যনগরী চট্টগ্রামসহ পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহ সফরে পশ্চিম পাকিস্তানী টিম সদস্য ছিলেন মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, মুহাম্মদ বাকের খান ও মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আযীয শর্কী। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম এ টিমের সাথে দু'ভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহর সহ পশ্চিম অঞ্চলের জেলা সমূহ সফরে ছিলেন মাওলানা আব্দুল গফফার হাসান, সরদার আলী খান ও চৌধূরী আলী আহম্মদ খান। এই সময়ে খুলনা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব সবেমাত্র রুকন হলেও এই উর্দুভাষী প্রতিনিধি দলকে তিনি নানাভাবে সফরে সহযোগিতা দিয়েছেন। খুলনা সফরে তিনি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন পূর্বক

www.bjilibrary.com

সম্মানিত মেহমানদের থাকা খাওয়া, খুলনা মিউনিশিপাল পার্কে জনসভা ও সুধী সমাবেশের ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় জামায়াতের সবচেয়ে বর্ষিয়ান জননেতা ও সাবেক এম এন এ শামসুর রহমান এ সময়ে জামায়াতে যোগদান কারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিনিধি দল সিলেটের দরগাহ মসজিদে ও হাসান মার্কেটে (তৎকালীন গোবিন্দ পার্কে) জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকশত লোক জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করেন।

পাকিস্তানী উক্ত শক্তিশালী টিমের সফরের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর কেন্দ্রিক যারা দায়িত্বে ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলো উল্লেখযোগ্য-

১। ঢাকা- অধ্যাপক ওযায়ের, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। চট্টগ্রাম- মাওলানা আমীন খান রেজভী/মুহাম্মদ ইবনে আলী উলুভী।
৩। খুলনা- মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, সাবেক এম এনএ, তৎকালীন হেড মাওলানা, খুলনা আলীয়া মাদরাসা, খুলনা।
৪। বরিশাল- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, হেড মৌলভী, বরিশাল টাউন স্কুল।

প্রতিনিধি দলের ব্যাপক সফর ও গণসংযোগ শেষে ঢাকার আর্মানিটোলা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মালিক নসরুল্লাহ খান আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও পরিচিতি পেশ করা হলে অনেকেই প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ পূর্বক জামায়াতে যোগদান করেন । প্রখ্যাত মুফতী দ্বীন মুহাম্মদসহ পুরাতন ঢাকার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি এ সময়ে জামায়াতের শুভাকাঙ্ক্ষী হন।

www.bjilibrary.com

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রথম আমীর চৌধুরী আলী আহম্মদ খান

১৯৫২ সালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় জামায়াতের সিদ্ধান্তক্রমে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য চৌধুরী আলী আহম্মদ খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর নিযুক্ত হন। তিনি প্রাদেশিক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রহীমসহ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় চারমাস বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সফর করেন এবং আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি করেন। অতপর কয়েক মাসের জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যান।

চৌধুরী আলী আহম্মদ একজন উচ্চপদস্থ জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। মোটা আয়ের চাকরি ছাড়ার পরে হালাল রুজির প্রত্যাশায় তিনি একটি হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ হাতে রান্না করে গ্রাহকদের খানা পরিবেশন করতেন। এমনকি স্বহস্তে সবকিছু সাজিয়ে খানা পরিবেশন করে তাদের সাথে আন্তরিকতা সহকারে গল্পগুজবে লিপ্ত হতেন। তার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং হেকমতের সাথে ইসলামী সাহিত্য পরিবেশন করতেন। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে চৌধুরী সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের আমীর হিসাবে পুন:আগমন করেন এবং তদানীন্তন গোটা পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী সংগঠন সম্প্রসারণ ও মযবুত করণে মনোযোগ দেন।

প্রথম প্রাদেশিক অফিস : ২০৫, নবাবপুর রোড

১৯৫২ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হলে ২০৫ নবাবপুর রোডে একটি দ্বিতল ভবন ভাড়া নেয়া হয়। ঢাকা শহর ও প্রাদেশিক কাজের শুভ সূচনা এই ভবনেই। জামায়াতের মহান প্রতিষ্ঠাতার প্রণীত উর্দু কিতাবের অনুবাদ কাজে মাওলানা আব্দুর রহীম ছাড়াও ১৯৫৩ সালে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে খুলনা থেকে ঢাকায় আনা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশীদের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন মাওলানা ইউসুফ ১৯৫০ সালে ঢাকা আলীয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর কয়েক খানা উর্দু বই পড়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯৫৩ সালের শুরুতে খুলনা আলীয়া মাদরাসা হতে বিদায় নিয়ে তিনি কিছুদিন

www.bjilibrary.com

ঢাকায় অবস্থান করেন। ঐ সময় মাত্র দু'খানা পুস্তিকা বাংলায় অনূদিত ছিল, একটি শান্তিপথ অন্যটি ইসলামের জীবন পদ্ধতি।

১৯৫২ সালের পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল, ১৯৫৬ সালের শুরুতে বিশ্ববরেণ্য 'ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও শিক্ষক' মাওলানা মওদূদী (র.) পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ দিনের প্রথম সফরে এলে উক্ত ভবনেই অবস্থান করেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন প্রাদেশকি সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের স্মৃতিচারণ নিম্নরূপ :

> *"জামায়াতে ইসলামীর এমন আর্থিক সংগতি ছিল না যে, মাওলানাকে মধ্যম মানের কোন হোটেলও থাকার ব্যবস্থা করা যায়। জামায়াতের সাথে জড়িত কারো এমন বাড়ি ছিল না, যেখানে মেহমান হিসেবে রাখা যায়। ২০৫ নং নবাবপুর রোডের দোতালায় প্রাদেশিক ও শহর জামায়াতের অফিসেই থাকা খাবার ব্যবস্থা করতে হলো। মুহতারাম মাওলানা ও মিয়া তোফায়েল আহমদ (কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি) আমাদেরকে বুঝতেই দেননি তাঁরা কোন অসুবিধা বোধ করছেন'। ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার উক্ত অফিস সীল করে দেয়। অনেক মূল্যবান এই কিতাবের লাইব্রেরি, ফাইল ও ফার্নিচার প্রায় সপ্তাহ খানেক পর্যন্ত সরকারি লোক (পুলিশ) তালিকাভুক্ত করে সরিয়ে নেয়। কিন্তু সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরেও তা আর ফেরত পাওয়া যয়নি"।*[৫]

মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ

১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ হঠাৎ সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষ মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করেন।

"কাদিয়ানী সমস্যা" পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে মাওলানা মওদূদীর এবং তাঁর সহকর্মী মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ ও জনাব নকী আলীকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত অভিযোগেই মাওলানা মওদূদীর প্রতি ৮ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

যে পুস্তিকা প্রণয়নের জন্যে গ্রন্থকারের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হলো, সে গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত করার সাহস কর্তৃপক্ষের হলো না। সামরিক আদালতে

---

[৫] *অধ্যাপক গোলাম আযম-জীবনে যা দেখলাম, ২য় খন্ড।*

www.bjilibrary.com

বিচার চলাকালে লাহোর শহরেই উক্ত পুস্তিকা শত শত সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছিল। পুস্তিকাটির কোথাও এমন কোন বিষয় ছিল না যা আইনের চোখে দুষণীয় হতে পারে। বরঞ্চ 'কাদিয়ানী সমস্যা' গ্রন্থখানিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলামগণ এবং ইসলাম ও ইসলামী আইনের দুশমনগণ ছলে-বলে কৌশলে ইসলামী আন্দোলনের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সেনানীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান এবং বহির্জগত থেকে সরকারের এহেন হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতার তীব্র নিন্দা করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবি উঠে। পৃথিবীর সমুদয় মুসলিম দেশে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, সামরিক আইনের প্রধান কর্মকর্তা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে মাওলানাকে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ফাঁসীর আদেশে মাওলানা মওদূদীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সমগ্র মুসলিম জগতে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং আল্লাহরই জন্যে জান কোরবানের যে মহান মহিমাময় নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতি ফাঁসির আদেশ, অতপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড জামায়াতে ইসলামীকে ভগ্নোৎসাহ না করে বরঞ্চ তার কর্মীবৃন্দকে শত গুণে জিহাদী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বহুগুণে বর্ধিত করেছে। আবহমান কাল থেকে ইসলামী আন্দোলন বিরোধী শক্তির ধাক্কা খেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তার দুর্বার অনমনীয় শক্তির সম্মুখে যারাই প্রতিরোধ গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে, তারাই ভেসে গেছে এর প্রবল স্রোতে, মুছে গেছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের নাম ও নিশানা।

এক শ্রেণির ইসলাম ও ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী লোক মাওলানা মওদূদীর প্রতি এ মিথ্যা অভিযোগ করে থাকেন যে, পাঞ্জাবের কাদিয়ানী দাঙ্গার জন্যে তিনি প্রধানত দায়ী এবং তাঁরই উস্কানিতে তথায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। আসলে এটা মোটেই 'কাদিয়ানী দাঙ্গা' ছিল না এবং এতে হাজার হাজার লোকও নিহত হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হলো কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করার জন্যে সর্বদলীয় কনভেনশন সরকারের নিকট দাবি জানান। সরকার এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে উক্ত কনভেনশন সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ঘোষণা করে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে সরকার এবং

www.bjilibrary.com

জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রাম। একে দমন করার জন্যে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সামরিক বাহিনীর গুলীতে ১১ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়। (মুনির রিপোর্ট- পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য) মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা বরঞ্চ সর্বদলীয় কনভেনশনের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ও বিরোধিতা করেছে এবং জনসাধারণকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। তাঁর প্রতি উক্ত অভিযোগ যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রসূত, অমূলক ও ভিত্তিহীন, তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন নিরপেক্ষ মানুষ মাত্রই অকপটে স্বীকার করবেন।

মুনির রিপোর্টের কোথাও এ গোলযোগের জন্যে মাওলানাকে দায়ী করা হয়নি। এর জন্যে প্রধান দায়ী অধুনালুপ্ত "আহরার"[৬] দলের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য দলকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, দেশের এক শ্রেণির সুবিধাবাদী আদর্শহীন রাজনৈতিক দল আহ্‌রার দল প্রধানদেরকে নিয়ে নিজেদের দল গঠন করে আপন অপকর্ম ঢাকবার জন্যে মাওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাব হাঙ্গামার জন্যে দায়ী করে।

এছাড়া 'কাদিয়ানী সমস্যা' বই লেখার অপরাধে মাওলানার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়, পাঞ্জাব গোলযোগের সাথে সে বইয়েরও কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের অন্ধ দুশমনেরা এখানেই মারাত্মক ভুল করেছে। যে বইয়ের জন্যে প্রাণদণ্ডাদেশ হলো, সে বই বাজেয়াপ্ত হলো না, কোনদিন হয়নি, এখনো সে বই বাজারে পাওয়া যায়। সে বইয়ের মধ্যে এমন একটি ছত্রও নেই যার জন্যে লেখকের কোন ন্যূনতম শাস্তিও হতে পারে। কিন্তু বিনা দোষে হলেও ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে রাতারাতি শেষ করতে হবে। অতএব একটা কারণ তো দেখাতেই হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জন ও দলকে যে এভাবেই বিজয়মণ্ডিত করেন, তা সম্ভবত ইসলাম বিরোধীদের জানা ছিল না। সূরা মুজাদালায় ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা (বিপদে-আপদে, অত্যাচার ও উৎপীড়নে) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। তারাই আল্লাহর দলভুক্ত। অতএব সাবধান, মনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর দল জয়যুক্ত হবে।"

---

[৬] *আহরার পার্টির প্রধান ছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান যিনি পরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি হয়েছিলেন।*

www.bjilibrary.com

ফাঁসির কক্ষে মাওলানা মওদূদী

কারাগারে মাওলানা মওদূদী যখন ইবাদতে মশগুল, এমনি এক সময়ে তাঁকে জানানো হলো মৃত্যুর পরওয়ানা। মৃত্যুদণ্ডাদেশে আল্লাহর পিয়ারা বান্দার চোখে-মুখে নেই কোন ভীতির চিহ্ন, নেই কোন উদ্বেগ। হাসিমুখে ফাঁসির আদেশ মেনে নিলেন ধন্যবাদের সাথে।

এ বিষয়ে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তকখানার প্রকাশক ও মুদ্রাকর জনাব সাইয়েদ নকী আলীর বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো-

"০৮ই মে দেওয়ানী ঘরের প্রাচীন টেনিসকোর্টে আমরা মাগরিবের নামায পড়ছিলাম। মাওলানা ছিলেন ইমাম। মুক্তাদীদের মধ্যে জেলের নম্বরদার এবং বাবুর্চি ব্যতিরেকে আমরা ছিলাম পাঁচজন- মিঞা তোফাইল মুহাম্মদ, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ, চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর এবং আমি। আমরা যখন দ্বিতীয় রাকআতে, তখন হঠাৎ দরজা খুলে গেল এবং তারপর শোনা গেল কয়েকজনের পদধ্বনি। কিছু ফিসফাস এবং প্রত্যাবর্তনের শব্দ।

সুন্নাতের সালাম ফিরাতে না ফিরাতে আবার শোনা গেল খটাখট। কয়েকজন সৈনিক এবং জেলখানার কর্মচারীকে ভিতরে আসতে দেখা গেল। একজন বললেন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কে?

মাওলানা শান্তকণ্ঠে বললেন- এই যে আমি, বলুন।

সরকারি কর্মচারী- তাসনীম সংবাদপত্রে দু'টি বিবৃতি প্রকাশের জন্যে আপনার সাত বছর সশ্রম কারাবাস এবং মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজের তিন বছর। উভয়ে প্রত্যুত্তরে, "আচ্ছা ঠিক আছে" বলে নীরব রইলেন।

কর্মচারী পুনরায় বললেন- 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তক প্রণয়নের জন্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মৃত্যুদণ্ড এবং তার মুদ্রাকর সাইয়েদ নকী আলীর নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

আমরা উভয়ে "আচ্ছা ধন্যবাদ" বলে চুপ করে রইলাম।

মাওলানার মৃত্যুদণ্ড ছিল একবারে অপ্রত্যাশিত। তবু কারও মুখে ছিল না কোন উদ্বেগ। তবে মন চিন্তা-ভাবনায় ভরে গেল। আমরা সকলে তাকালাম মাওলানার দিকে। দেখলাম তাঁর ধীর প্রশান্ত মূর্তি। দৃষ্টিতে বিরাট গভীরতা যেন গহীন সমুদ্রের অসীম গভীরতা।

www.bjilibrary.com

কর্মচারী মাওলানার হাতে একটুকরো কাগজ দিয়ে বললেন-
মাওলানা, আপনি ইচ্ছা করলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণভিক্ষা চাইতে পারেন।
মাওলানা নীরবে মৃদু হাস্য সহকারে কাগজটুকু হাতে নিলেন।
কর্মচারী বিদায়ের সময় বলে গেলেন-
- মাওলানা প্রস্তুত হোন আপনাকে একটু পরেই যেতে হবে।
- কোথায় ?
- ফাঁসির কুঠুরিতে।
- আমি তৈরি আছি।
অতঃপর আমরা নীরবে দেওয়ানী ঘরের কামরার দিকে চললাম। যেতে যেতে কর্মচারীকে বলতে শোনা গেল-
মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ এবং সাইয়েদ নকী আলী আপনাদেরও যেতে হবে। কিন্তু, আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের কাল সকালে নিয়ে যাব।

আমি এবং মালিক সাহেব যেন শুনেও শুনলাম না। কারণ মাওলানার মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ আমাদের এত শোকাভিভূত করেছিল যে, অন্য কোন দিকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল না।

দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে সত্যপথের পথিকদের কতই না লাঞ্ছনা, কতই না নির্যাতন নিপীড়ন। আমরা সকলে দ্বীনে হকের নগণ্য খাদেম, সত্যপথের সংগ্রামী পুরুষদের সমপাংক্তেয় হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। অপরাধ ? কাদিয়ানী সমস্যা বই প্রকাশের অপরাধ ? এ তো শুধু দুনিয়াকে প্রতারণা করার জন্যে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অপরাধ হচ্ছে এই যে, আমরা পাকিস্তানে জাতি ও সরকারের যুক্ত শক্তিকে ইসলামের জন্যে ব্যবহার করতে চাই। আল্লাহর দ্বীন কায়েম করাই আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছি। শুধুমাত্র এই ছিল আমাদের অপরাধ।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মাওলানাকে সত্যি সত্যিই ফাঁসিকক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এমন মনীষী যিনি শুধু পাক ভারতেই নন, সমগ্র আরব জগতেও বিরাট শ্রদ্ধার পাত্র আজ ফাঁসিকক্ষে? আমি ভাবছিলাম, একি সত্যি ?

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদকে আজ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হবে ? জাতির মূল পরিচালকগণ, যারা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে পাকিস্তানে ইসলামের জয়জয়কার দেখতে চায় না- আজ এই পদক্ষেপ করতে চলেছে ? সত্যিই কি ইসলামী আন্দোলন তার শৈশবেই এই মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হবে ?

মাওলানার ধীর গম্ভীর স্পষ্ট উক্তি আমার কর্ণকুহরে ঝংকৃত হতে লাগল- "আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণ ভিক্ষা চাইব না। এমন কি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণ ভিক্ষা না চায়- না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই নিবেদন।"

মিঞা তোফাইল মুহাম্মদ সাহেব মাওলানার হোল্ড অল খুলে বিছিয়ে দিলেন। আমরা সকলে মিলে তার মধ্যে জিনিসপত্র ভরতে লাগলাম। চামড়ার সুটকেসটা মাওলানা এবং আমি সাজিয়ে ফেললাম। কারণ এসবই মাওলানার বাড়িতে ফেরত পাঠাতে হবে।

এদিকে একটা ছোট্ট বিছানা মাওলানার সঙ্গে ফাঁসিকক্ষে পাঠাবার জন্যে তৈরি করা হলো। একটা কাপড়ে বাঁধা একখানা কুরআন মজীদ এবং লোটা-গ্লাসও এসবের সঙ্গে দেয়া হলো।

আমার মুখে কথা ছিল না। হৃদয় কাঁপছিল। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। মাওলানার মৃত্যুদণ্ডের ধারণা যেন ইলেকট্রিসিটির মতো শরীরের অনু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল। তোফাইল সাহেবের অবস্থাও ছিল ঠিক এমনি। মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ তাঁর ভাব-গম্ভীর মূর্তি নিয়ে পায়চারী করছিলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে দোয়াও বেরুচ্ছিল। আমাদের সবার বয়োজ্যেষ্ঠ চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের অবস্থা ছিল আজিব। তিনি শুধু দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। ইসলাহী সাহেব কখনও পায়চারী করছেন, কখনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তাঁর দমিত আবেগ-উচ্ছ্বাস রক্তবর্ণ ধারণ করে মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়ে পড়ছিল।

www.bjilibrary.com

বিছানাপত্র বাঁধতে বাঁধতে মনকে শক্ত করে একবার বলে ফেললাম-
- মাওলানা, প্রাণভিক্ষা না করার সিদ্ধান্ত তো আপনার নিজস্ব। এ সিদ্ধান্ত জামায়াতকে মেনে নিতে হবে তার কোন মানে নেই। জামায়াতের লোক বাইরে অবস্থা বিবেচনা করে যা সিদ্ধান্ত করবে তা আপনাকে মানতেই হবে।

মাওলানা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বললেন-
আমি জামায়াতের দৃষ্টিতেও আমার এ সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এ সিদ্ধান্ত জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া আপনাদের কর্তব্য।

এর মধ্যে জেল কর্মচারী এসে পড়ল। আমাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শান্ত, যেমন ঝড়ের প্রাক্কালে সমুদ্র থাকে শান্ত-শিষ্ট।

কিন্তু মাওলানা? ইসলামী আন্দোলন ও সত্য পথের বীর সেনানী, যাঁকে শাহাদতের মর্যাদা দানের ঘোষণা করা হয়েছে, সেই মাওলানা একেবারে শান্ত, ধীর-স্থির, অবিচল।

মাওলানা আমাদের সকলের সাথে বুক ভরে কোলাকুলি করলেন। তা ছিল এমন আন্তরিক যে, চিরদিন মনে থাকবে।

জিনিসপত্র কিছুটা আমরা নিলাম এবং কিছুটা জেলের নম্বরদার। কামরা থেকে বেরিয়ে দেওয়ানী ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে মাওলানাকে বিদায় দিলাম। এবার বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা তুফান আত্মপ্রকাশ করল। মিঞা তোফাইল সাহেব এবং আমি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং আমি ফিরে এসে জায়নামাযে সিজদায় পড়ে গেলাম।

ইসলাহী সাহেব, মালিক সাহেব এবং চৌধুরী সাহেব আগে থেকেই সিজদায় পড়েছিলেন।

আমরা সকলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলাম। কান্নার বেগ অপ্রতিহত, অশ্রু জোয়ার উদ্দাম, অফুরন্ত।

এভাবে কতক্ষণ কাটালাম জানি না। হঠাৎ নম্বরদারের কঠোর পদধ্বনি তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। দেখি, মাওলানার কাপড়, খাবার, বাসন, জুতা প্রভৃতি ফেরত এনেছে। কুরআন মজিদখানাও ফেরত এনেছে। কারণ ফাঁসির কুঠুরিতে কুরআন মজিদ রাখার কোন স্থান নেই।

www.bjilibrary.com

মাওলানা ইসলাহী সাহেব মাওলানার কাপড় আমার হাত থেকে নিয়ে বার বার চুমো দিতে লাগলেন, চোখে ও বুকে তার মধুর স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলেন। কারণ এ কাপড় ছিল আল্লাহর পথে মুজাহিদের, যিনি ছিলেন ফাঁসিকক্ষে আবদ্ধ, শাহাদাতের অমৃতপানের প্রতীক্ষায়।

মিঞা তোফাইল সাহেব মাওলানা ইসলাহীর হাত থেকে সে কাপড় নিয়ে মুখে-চোখে-বুকে লাগাতে থাকলেন। আমাদের সকলেরই অশ্রুজলে সে কাপড় সিক্ত হয়ে পড়ল।

তাঁর জন্যে আমাদের এই যে প্রাণঢালা ভালবাসা তা কিসের জন্যে?
- তিনি কি আমাদের কোন আত্মীয় ছিলেন ?
- তাঁর সাথে আমাদের কি কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিল ?
- এ প্রেম ভালোবাসা কি এক বর্ণ-গোত্র হওয়ার কারণে ?
- এ কি ছিল একই দেশের অধিবাসী হওয়ার জন্যে ?
- না, না, শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিতে চলেছেন। শুধু ইসলামের সম্পর্কই আমাদের ভালবাসাকে করেছিল এতখানি ঐতিহাসিক ও নিঃস্বার্থ।

মাওলানার সীমাহীন খোদাপ্রেম এবং খোদার পথে প্রাণ উৎসর্গ করার আকুল আগ্রহ জগতকে করল স্তম্ভিত। জেলখানার কর্মচারীদেরকেও করল বিস্ময়- বিমুগ্ধ এবং রেখে গেল ইসলামের ইতিহাসে এক পরম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ফাঁসিকক্ষে মাওলানাকে পরতে দেয়া হলো ইজারবন্দবিহীন পায়জামা। মাওলানা নম্বরদারকে জিজ্ঞেস করলেন-
"ভাই, ইজারবন্দ দিতে ভুলে গেছো ?"
নম্বরদার বললে-
"মাওলানা, ফাঁসির আসামীকে ইজারবন্দ দেয়া হয় না। কারণ যদি সে তাই দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে ?"
মাওলানা মৃদু হাস্য সহকারে বলেন-
"আরে যে প্রাণভরে শাহাদাতের জাম পান করতে যাচ্ছে, সে কি এমনই নির্বোধ যে, আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাবে ?"

www.bjilibrary.com

ফাঁসিকক্ষে মাওলানার কোন উদ্বেগ নেই। প্রাণনাশের জন্যে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। মুখে-চোখে কালিমার কোন চিহ্ন নেই। কুরআন মজিদের পরিবর্তে সাইয়েদ আহমদ শহীদের (রঃ) জীবনী পড়তে পড়তে অতি স্বাভাবিক পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর আপন গৃহের নিদ্রা আর ফাঁসিকক্ষের নিদ্রায় কোন পার্থক্য সূচিত হলো না।

মাওলানার এ সময়ের আর একটি অমূল্য বাণী এই যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত ফাঁসির আদেশে অধীর হয়ে পড়লে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-
"জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, যমীনে হয় না।"

কি দৃঢ় প্রত্যয়! কি অটুট মনোবল!

ফাঁসিকক্ষে মাওলানার অবস্থা মাওলানার মুখে শুনুন। মাওলানাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

দেওয়ানী ঘরের পরিবেষ্টনীর মধ্যে যখন আমাকে ফাঁসির আদেশ শুনান হলো এবং সাথে সাথে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণভিক্ষার অধিকারও দেয়া হলো, তখন আমার মনের মধ্যে তিন প্রকার ধারণার উদয় হলো।

প্রথমটি এই যে, জালিমের কাছে করুণাপ্রার্থী হওয়া আমার আত্মমর্যাদার পরিপন্থী।

দ্বিতীয় এই যে, কিসের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হবো? এজন্যে কি যে, আমাকে কেন জান্নাতে পাঠান হচ্ছে ? এটা সত্য কথা যে, সারা জীবন দ্বীনের খেদমত করে অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করাতে বেহেশত লাভের ততটা নিশ্চয়তা নেই, যতটা আছে শাহাদাত বরণ করে। অতএব আমি কি একথা বলব যে, আমাকে জান্নাত থেকে মুক্তি দাও ?

তৃতীয় কথা এই যে, আমার মতো লোক যদি আজ প্রাণভিক্ষা করে, তাহলে এদেশের সাধারণ লোকের মন থেকে মর্যাদাবোধ মুছে যাবে।

অতএব, আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের একথা কঠোর চাপ দিয়ে বলে দিলাম আমার বাড়ির কোন লোক, অথবা জামায়াতের কোন লোক আমার পক্ষ থেকে যেন ক্ষমাপ্রার্থী না হয়। নতুবা আমি কোনদিন তাদের ক্ষমা করব না।

www.bjilibrary.com

যখন আমাকে ফাঁসির কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমাকে আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হলো। আমার সবকিছু কেড়ে নেয়া হলো। এমনকি আমার পরিধেয় বস্ত্রও কেড়ে নিয়ে জেলের বস্ত্র দেয়া হলো। ইজারবন্দবিহীন পায়জামা দেয়া হলো। তা দেখে প্রথমত মনে করলাম যে, হয়ত ভুলে ইজারবন্দ দেয়নি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ইজারবন্দ মোটেই দেয়া হয় না। কারণ কয়েদী নৈরাশ্যে যদি তা দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে। বাধ্য হয়ে পায়জামার সামনের দুই মাথা একত্রে করে পরতে হলো। কিন্তু তা সতর ঢাকার উপযোগী হলো না এবং নামায পড়তেই বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। কুরআন মজিদ প্রথমত সঙ্গে রাখতে চাইলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে, শোবার মেঝে ছাড়া তা রাখবার কোন স্থান নেই, তখন ফেরত দিলাম। যা হৃদয়ে গাঁথা ছিল তাই সঙ্গে রয়ে গেল।

যা হোক, সবাই চলে যাওয়ার পর এক নম্বরদার এলো এবং সরকার ও মন্ত্রীদের প্রাণভরে গালাগালি করলো। এরপরে এলো দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। প্রত্যেকেই সরকারকে অভিসম্পাত করে গেল।

রাতের বেলায় ফাঁসির কুঠুরিতে এত চিৎকার আর্তনাদ শুরু হলো যে রাত দু'টোর আগে ঘুম এলো না। কেউ কোন পীর বুযুর্গের নাম ধরে ডাকছে। কেউ বা কবিতা আওড়াচ্ছে এবং কেউ বিড়বিড় করে বকেই চলেছে- 'মাওলা বাঁচাও, মাওলা বাঁচাও'।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্পর্কে মাওলানার কি ধারণা ছিল তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

আমার এই ধারণা ছিল যে, যদি জনসাধারণের পক্ষ থেকে বিরাট বিক্ষোভ করা না হয়, তাহলে সরকারের যা মনোভাব, তাতে তারা ফাঁসি দিয়েই ফেলবে। যদি তারা এ পদক্ষেপ করার সুযোগ পায়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত মারাত্মক। এরপর এদেশের দ্বীনের কাজ বহুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জনসাধারণ যদি সচেতন হয়ে কাজ করে এবং সরকারকে যদি একবার পিছপা হতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদেরকে পিছনে হঠতেই হবে এবং ইসলামী আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। এ সময়টা হচ্ছে সারাদেশের জন্য এক বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সময়।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় দিন শেখ সুলতান আহমদ এবং সফদর সাহেব ছেলেদের নিয়ে দেখা করতে এলেন। তারা আবার আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার কথা বললেন। আমি তাদের শাসিয়ে বললাম, যেন তারা কিছুতেই ক্ষমাপ্রার্থী না হন।

অতঃপর মিঞা মাহমুদ আলী কাসুরী এলেন। তিনিও ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তার নিজের খেদমত পেশ করতে চাইলেন। তাঁকে আমি বললাম যে, একথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফাঁসির কুঠরিতে বিশেষ ধরনের কষ্ট ছিল কি না। তার উত্তরে মাওলানা বলেন-
একে তো সেই পরিধেয় বস্ত্র ছিল অসঙ্গত ও অপর্যাপ্ত এবং চিৎকার হট্টগোল। দ্বিতীয় অসুবিধা এই ছিল যে, ফাঁসিকক্ষের গঠনটাই সকল মওসুমে কয়েদীদের জন্য কষ্টদায়ক ছিল। আলো-বাতাসহীন সংকীর্ণ কক্ষ। রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপায় নেই। তদুপরি ফাঁসির কুঠুরিতে আহার দেয়া হয় সি-ক্লাসের যা একেবারে অখাদ্য।

তৃতীয় দিনে প্রায় বেলা দু'টার সময় একজন দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললেন, 'মাওলানা আপনাকে মুবারকবাদ জানাই, আপনার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়েছে।' তারপর এ সংবাদ দিতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। এর কিছু পরে মাওলানা নিয়াজী এবং আমাকে সেখান থেকে বের করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া হলো।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

জনাব আব্দুল খালেকের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

জনাব আব্দুল খালেক ১৯২১ সালে কুমিল্লা জেলার কসবা থানার দেবগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খুবই ধর্মভীরু মানুষ। নিজ বাড়িতে আরবি পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। অতপর কিছুদিন হিফজখানায় পড়াশুনা করার পর তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১৯৫২ সালে মাওলানা মওদূদী (র.) এর রচনাবলীর সাথে পরিচিত হন। মনোযোগ সহকারে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করে জনাব আব্দুল খালেক ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং ১৯৫২ সালের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

আব্দুল খালেক তখন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিসে চাকরিরত ছিলেন। জনাব আব্দুল খালেকের (১৯২১-৭৯) জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি একজন দক্ষ ও সফল সংগঠক ছিলেন। উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন না করেও তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন, হাদীস, তথা ইসলামী সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁরই দাওয়াতে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছিলেন। কোন উচ্চতর ডিগ্রী ছাড়াই তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপকদের ওপরে অধ্যাপনা করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

জনাব আব্দুল খালেক তৎকালীন প্রাদেশিক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রহীমকে নিয়ে ঢাকার সিদ্দিক বাজারে সর্ব প্রথম বাংলাভাষীদের মধ্যে জামায়াতের একটি ইউনিট কায়েম করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে। উল্লেখ্য জনাব আবদুল খালেক ১৯৫৩ সালে মাত্র এক বছরের মধ্যেই রুকন হন। বাংলাভাষীদের মধ্যে তিনি হলেন জামায়াতের (বাংলাদেশে) তৃতীয় রুকন। ১৯৫৭ সালে তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় আমীর হন। ১৯৬৮-'৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারি ছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায় "ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম দাওয়াত ও শিক্ষা আমি

www.bjilibrary.com

তার কাছে পাই এবং তার দারসে কুরআন আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণীত করেছে।" তিনি ছিলেন অসাধারণ একজন বাগ্মী, তিনি এমন যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ও সুললিত কণ্ঠে দারসে কুরআন পেশ করতেন যে, বিভিন্ন পন্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও তা শুনে সম্মোহিত হয়ে যেতেন।

আব্দুল খালেক একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। অধুনালুপ্ত দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে মাওলানা আব্দুর রহীম পাকিস্তান জামায়াতের নায়েবে আমীর নিযুক্ত হলে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্দুল খালেক তখন সেক্রেটারির দায়িত্ব লাভ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাঁর জামায়াতে অংশগ্রহণে জামায়াত যে জনপ্রিয়তা ও গতিশীলতা পায় তা অবর্ণনীয়। বিগত অর্ধ শতাব্দীব্যাপী তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্ব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশ-বিদেশে সর্বাধিক আলোচিত, প্রশংসিত এবং এদেশের বৃহত্তম ইসলামী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অধ্যাপক গোলাম আযমের সুযোগ্য, সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭০ সালেই জামায়াত এ ভূখন্ডে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক, রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৫০-৫৫) জনাব গোলাম আযম একই সাথে রংপুর তাবলিগ জামায়াতের আমীর ও তমদ্দুন মজলিসের সংগঠক পদে বহাল ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে তিনি গাইবান্ধায় তাবলিগ জামায়াতের প্রোগ্রামে এসে জনাব আব্দুল খালেকের নিকট জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেয়ে আকৃষ্ট হন। তাঁর মতো এত উঁচু মানের মুরব্বী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করায় গোটা পাক-ভারতের তাবলিগি নেতৃবৃন্দের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের ব্যাপারে তিনি তার লেখনিতে যেভাবে বলে গেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো[৭]-

"আমার নিকট জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক কখনো যোগাযোগ করেনি। রংপুরে এর কোন সংগঠন ছিলো না। এ নামে কোন সংগঠন আছে বলেও আমার জানা ছিলো না। আল্লাহরই অপার মহিমা যে, তিনি আমাকে অলৌকিকভাবেই পথ দেখালেন। অর্থাৎ ঘটনাক্রমে আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ ছাড়াই জামায়াতের দাওয়াত পেয়ে গেলাম। ঘটনাটি রীতিমতো চমকপ্রদ।

ঢাকা থেকে তাবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ইঞ্জিনিয়ার মুকীত ভাইয়ের চিঠি পেলাম। তিনি লিখলেন যে, ঢাকা থেকে পায়দল এক জামায়াত উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা কোন যানবাহনে নয়; হেঁটে পথে পথে স্থানে স্থানে অবস্থান করে অমুক তারিখে গাইবান্ধার বড় মসজিদে পৌঁছবেন। আমি যেন রংপুর থেকে এক জামায়াত নিয়ে সেখানে তাদের সাথে মিলিত হই। এ নির্দেশ মোতাবেক আমি নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছলাম। ঐ মসজিদটি ছিলো দোতলা। দিনটি ছিলো শুক্রবার। ঢাকা থেকে আগত তাবলীগী ভাইদের সাথে পরিচয় হলো। তারা জানালেন যে, মসজিদের ইমাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতির সাথে তারা যোগাযোগ করেছেন এবং জুমআর পর আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

জুমআর ফরয নামাযের পর কমিটির সভাপতি ঘোষণা করলেন যে, সবাই সুন্নাত নামাযের পর বসবেন। তাবলীগ জামায়াতের পক্ষ থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল খালেক বক্তব্য রাখবেন। আমি অত্যন্ত উৎসুক হলাম। জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য শুনবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলাম।

সভাপতি প্রথমে আমাকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলেন। আমি তাবলীগ জামায়াতের ৬টি উসূল পেশ করে যথারীতি ঢাকা থেকে আগত জামায়াতের সাথে তাবলীগী সফরে শরীক হবার দাওয়াত দিলাম। কে কে ১, ২ বা ৩ দিনের জন্য শরীক হতে পারেন, সে বিষয়ে কথা বলার সুযোগ রইলো না। সভাপতি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল খালেককে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানালেন। তিনি কালেমায়ে তাইয়েবার বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করলেন এবং আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবী (সা.) এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের আহ্বান জানালেন।

তিনি বক্তৃতা শেষ করেই আমার সাথে হাত মিলালেন এবং পরিচয় নিলেন। দেখা গেলো যে, আমরা একই মহকুমার অধিবাসী। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার (তখনও

---

[৭] *অধ্যাপক গোলাম আযম- জীবনে যা দেখলাম, ২য় খন্ড।*

www.bjilibrary.com

মহকুমাই ছিলো) কসবা থানার আখাউড়ার নিকটতম দেবগ্রামে তার বাড়ি। আর নবীননগর থানার বীরগাঁও আমার বাড়ি। এভাবে একটু ঘনিষ্ঠতাবোধ সৃষ্টি হলো। তিনি এক রকম জোর করেই আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। তাবলীগের ভাইদের থেকে ছুটি নিয়ে আমি তার সাথে গেলাম।

তিনি জামায়াতে ইসলামীর অফিসে নিয়ে গেলেন। অফিসটি একটি বাড়ির বৈঠকখানায় অবস্থিত হলেও অফিস হিসাবেই সাজানো। ঘরটি টিনের। চারদিকে বেড়ায় আরবি ও উর্দুতে ছাপানো বেশ কয়টি বড় ও কতক ছোট পোস্টার সাঁটানো রয়েছে। এক পাশে একটি চৌকিতে বিছানা পাতানো এবং এর পাশেই ছোট একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। জানা গেলো, তিনি ঐ বিছানায় ঘুমান এবং ঐ টেবিলে পড়েন। আর প্রশস্ত বৈঠকখানায় সাপ্তাহিক কর্মী বৈঠক বসে। পোস্টারগুলোতে কুরআনের আয়াত ও উর্দু তরজমা বড় বড় সুন্দর অক্ষরে লেখা রয়েছে।

মাদুর পাতা মেঝেতে একটি চাদর বিছিয়ে আবদুল খালেক সাহেব আমাকে নিয়ে বসলেন। মিনিট দশেক কথা বলেই উর্দুতে লেখা দু'টো চটি বই দিয়ে বিদায় করলেন। বিদায়ের সময় একটি প্রশ্ন ছুড়ে মারলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বললেন, "ইসলাম শুধু ধর্ম নয় এবং রাসূল (সা.) শুধু ধর্মনেতা ছিলেন না; ইসলাম আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। রাসূল (সা.) ২৩ বছর পর্যন্ত যা করেছেন এর সবটুকুই ইসলাম। তিনি মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের সব বিধান বাস্তবে চালু করে দেখান। রাসূলের জীবন থেকে শুধু ধর্মী বিধানটুকু গ্রহণ করলে ইসলামের একটি অংশ মাত্র পালন করা হয়। রাসূলের সবটুকু জীবন মিলেই পরিপূর্ণ ইসলাম।

একমাত্র ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই মানুষকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দিতে সক্ষম। কিন্তু মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, শোষণ ও সুবিধা ভোগ করার জন্য নবীদের বিরোধিতা করেছে।

জামায়াতে ইসলামী কুরআনের আইনের ভিত্তিতে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়তে চায় বলেই সরকার জামায়াতের এতো বিরোধী। এক বছর আগে সরকার মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলো। যারা জামায়াতে কাজ করছে তারা জেল ও ফাঁসির পরওয়া করে না।

আপনাকে মাওলানা মওদূদীর লেখা দু'টো চটি বই দিচ্ছি। এ বইগুলো এখনো বাংলায় অনূদিত হয়নি বলে উর্দু বই-ই দিলাম। বই দু'টো পড়বেন এবং একটি প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করবেন। প্রশ্নটি হলো, "আপনি যে জামায়াতে কাজ করছেন, সে জামায়াত যদি রাসূলের ইসলামই কায়েম করতে চায়, তাহলে দেশের অনৈসলামী সরকার ঐ জামায়াতের বিরোধিতা কেন করে না ?"

www.bjilibrary.com

মাওলানার বইগুলো অধ্যয়নের পর অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব আব্দুল খালেক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। এরি মধ্যে আব্দুল খালেক সাহেব ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক সাহেবের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তিনি জানালেন গাইবান্ধা মিউনিসিপ্যাল পার্কে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ঢাকা থেকে নেতৃবৃন্দ আসবেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব যেন অবশ্যই উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। দাওয়াতি চিঠি পেয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি ভাবলেন সম্মেলনে গেলে জামায়াতকে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ হবে। নানান প্রতিকুলতা পেড়িয়ে সময় মতো তিনি গাইবান্ধা পৌঁছে যান। আছরের নামাজের পর মিউনিসিপ্যাল পার্কে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় উপস্থিত হয়ে জামায়াত দায়িত্বশীলদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। অবশ্য ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবি জানানোর প্রেক্ষিতে তিনিও ঐ জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। জনসভায় বক্তব্য শুনে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের তাগিদ অন্তরে অনুভব করতে থাকেন।

সম্মেলন শেষ হবার পর এশার নামায ও খাওয়া-দাওয়া শেষে রাত সাড়ে ১০টায় আবদুল খালেক সাহেব অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরবর্তী ঘটনা অধ্যাপক আযম সাহেব নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন-

"মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক মুহাম্মদ ওযায়ের আমার সাথে বসলেন। আবদুল খালেক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আসাদ গিলানী সাহেব খুব ক্লান্ত বলে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। বগুড়া থেকে আগত শায়খ আমীনুদ্দীনও উপস্থিত ছিলেন।

আমার ধারণা ছিলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের দায়িত্বশীল হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীমই আমার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু দেখা গেলো, অধ্যাপক ওযায়ের অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন এবং আমার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আবদুল খালেক সাহেব আমাকে রংপুর তাবলিগ জামায়াতের আমীর হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সম্ভবত ব্যবস্থাপনার ব্যস্ততার কারণে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আমি তাঁর উপস্থিতি কামনা করছিলাম। এক মাস আগে তিনি আমাকে যে দু'টো বই দিলেন এবং একটি প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা

www.bjilibrary.com

করতে বললেন এর প্রতিক্রিয়া কী তা তিনি জানতে চাইবেন বলে আশা করেছিলাম।

আমি তাবলীগ জামায়াতের আমীর-এ পরিচয়ের সূত্র ধরে অধ্যাপক ওয়ায়ের ভয়ানক আক্রমণাত্মক ভাষায় তাবলীগ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে অবিরাম বলতে থাকলেন। এ জামায়াত ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসাবে পেশ করে জনগণকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইসলামের চরম ক্ষতি করছে। এ জাতীয় আরও বেশকিছু কথা বলে আমাকে এমন কতক প্রশ্ন করলেন, যার কোন জওয়াব আমার নিকট ছিলো না।

গত এক মাসে আমার মন জামায়াতের দিকে আকৃষ্ট না হলে এবং তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা না জন্মালে এবং মাওলানা মওদূদীর লেখা তমদ্দুন থেকে পাওয়া দু'টো ইংরেজি এবং খালেক সাহেবের দেওয়া দু'টো উর্দু বই পড়া না থাকলে অধ্যাপক ওয়ায়েরের বক্তব্য আমার মনে জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষই সৃষ্টি করতো। আমি তো অনেকখানি কাছেই চলে এসেছিলাম। তিনি আমার মনের অবস্থা কিছুই জানেন না। অথচ এভাবে চরম হামলা চালালেন। তার বক্তব্যকে আমি হিকমতের সম্পূর্ণ খেলাফ মনে করেও সঠিক বলে উপলব্ধি করলাম। আমি পরে এক সময় আবদুল খালেক সাহেবের নিকট অভিযোগ করেছি যে, অধ্যাপক ওয়ায়ের হিকমত ও মাওয়েযাতুল হাসানার সম্পূর্ণ খেলাফ কাজ করেছেন। আমি তাঁর কথায় জামায়াতে যোগদান করতাম না, বরং জামায়াত থেকে আরও দূরেই চলে যেতাম। আবদুল খালেক সাহেব অধ্যাপক ওয়ায়েরকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি নাকি মন্তব্য করেছেন, "তাবলীগের লোক অন্ধ হয়ে থাকে। তাদেরকে বুঝানো যায় না। আমার অভিজ্ঞতা এটাই। তাই আমি মনের ঝাল মিটিয়ে বলেছি। তিনি তাবলীগ বাদ দিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে আসবেন না বলে ধরে নিয়েই আমি কথা বলেছি।"

রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় বৈঠক শেষ হলে নেতৃবর্গ যার যার রুমে শোয়ার জন্য চলে গেলেন। শায়খ আমীনুদ্দীন ও অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের জন্য একটি কামরা বরাদ্দ ছিল রাতে ঘুমানোর জন্য। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযম সারা রাত জেগে মহান মুনিবের দুয়ারে ধরনা দিতে থাকেন। একটু সময়ও তিনি ঘুমাননি। এ রাতটি ছিল অধ্যাপক গোলাম আযমের জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য রাত। এ রাতেই তিনি ইকামাতে দ্বীনের মহান কাফেলা জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছিলেন। সেই ঘটনা তিনি যেভাবে লিখেছেন:

www.bjilibrary.com

"ঐ রাতটি আমার জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রাতেই আল্লাহ তাআলা আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন। এ সিদ্ধান্ত আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

শায়খ আমীনুদ্দীন বেশ বয়স্ক লোক। উর্দুভাষী হলেও বাংলা বুঝেন। আমি তার সাথে উর্দুতেই আলাপ করলাম। অধ্যাপক ওয়ায়ের উর্দু ও ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলেছেন। আক্রমণাত্মক কথাগুলো বেশির ভাগ ইংরেজিতেই বলেছেন। শায়খ আমীনুদ্দীনের সাথে পরিচয় হলো। তিনি বিহারের অধিবাসী। কোলকাতায়ই বেশি থাকতেন। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে এসে বগুড়ায় বসবাস করতেন। কথাবার্তায় তিনি খুবই মিষ্টভাষী ও হাসিমুখী। রাত ১২টায় দু'জনই শুয়ে পড়লাম।

১০/১৫ মিনিট পরই শায়খ সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। আমার মনে বিরাট তোলপাড়। ঘুম আসার কোন লক্ষণই নেই। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের প্রচন্ড আগ্রহ সত্ত্বেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। অধ্যাপক ওয়ায়েরের আক্রমণাত্মক কথাগুলো তাবলীগ জামায়াত ত্যাগ করার জন্য সহায়ক হলেও তাবলীগ জামায়াতের সাথীদের ও বড় বড় আলেমদের মহব্বত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিচ্ছিলো। তমদ্দুন মজলিস ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়নি। কারণ জামায়াতে ইসলামীতে তমদ্দুনের দাওয়াত পূর্ণমাত্রায়ই রয়েছে। কিন্তু তাবলীগ জামায়াতে যে ধর্মীয় জযবাবোধ করতাম এর আকর্ষণ ত্যাগ করা কঠিন মনে হলো। রাত তিনটা পর্যন্তও যখন ঘুম এলো না তখন উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদ পড়তে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেক নামায পড়ার পর অস্থিরচিত্তে দোয়া করতে থাকলাম।

দুআ' মানে তো আল্লাহর সাথে কথা বলা। আমি আমার মাবূদের সাথে মনে মনে কথা বলে তৃপ্তিবোধ করি না। বিশেষ করে শেষ রাতে দুআ' করতে আওয়াজ না করলে মজাই পাই না। আরবি দুআ'ই হোক বা বাংলায় দুআ' হোক, উচ্চারণ করেই দুআ' করি। সাধারণত এমন আওয়াজ হয় যে, কাছে কেউ থাকলে শুনতে পায়। সে রাতে আমার মানসিক অস্থিরতার কারণে দুআ'র সময় আওয়াজ একটু উঁচু হবারই কথা। ঘরে আরও একজন আছেন সে হুঁশও হয়তো তখন ছিলো না। অত্যন্ত আবেগের সাথে দীর্ঘ সময় আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে রইলাম। দুআ'র ভাষা এখনও ভুলিনি। কারণ ওটা আমার জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণ ছিলো।

"হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র হেদায়াতের মালিক। ইসলামের নামেই এতো মত ও এতো পথ সৃষ্টি হয়েছে যে, সর্বদিক দিয়ে সঠিক পথ চেনা আমার অসাধ্য। আমি খুবই তৃপ্তির সাথে তাবলীগ জামায়াতে কাজ করছিলাম। তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করার পর তাবলীগকে যথেষ্ট মনে না করলেও এর আকর্ষণ

www.bjilibrary.com

ত্যাগ করতে পারছি না। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তুমিই আমার দিলের মালিক। আমি তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করছি। আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছে দাও। আমার মনের অস্থিরতা দূর করে দাও।"

এসব কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রায় ঘন্টাখানেক আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলাম। ফজরের আযান পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কাটলো। আযানের পর শায়খ আমীনুদ্দীন ঘুম থেকে উঠে ওযূ করে আমাকে হাত ধরে জায়নামায থেকে তুলে রীতিমোত জড়িয়ে ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন, যেখানে ফজরের নামাযের জামাআত হবার কথা। মাওলানা আবদুর রহীম ইমামতি করলেন। কেরাআত শুনতে বেশ ভালোই লাগলো। মোনাজাতের পর শায়খ আমীনুদ্দীন আমাকে ধরে মাওলানা আবদুর রহীমের কাছে নিয়ে বসালেন। আবদুল খালেক সাহেব একটি কাগজ শায়খ আমীনুদ্দীনের হাতে দিলেন। তিনি ঐ কাগজটি ও একটি কলম আমার হাতে দিলেন। আমি কাগজটিতে লেখা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম। আর বেশ কয়জন আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে আছেন।

ঐ কাগজটি জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম ছিলো। বর্তমানে বলা হয় সহযোগী সদস্য ফরম। ফরমটিতে লেখা কথাগুলোর সবই পছন্দ হলো। কোন কথার সাথে ভিন্নমত পোষণের মনোভাব টের পেলাম না। তাই নীরবে ফরমটি পূরণ করে দস্তখত করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শায়খ আমীনুন্দীন মাওলানা আবদুর রহীমকে দুআ' করতে অনুরোধ করলেন। মাওলানা দুআ' করতে থাকাকালেই শায়খ আমীনুদ্দীন আবেগের সাথে উর্দুতে দুআ'র করতে লাগলেন। তিনি দুআ' করলেন, যেন ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহ আমাকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য তাওফিক দান করেন। মাওলানা দুআ'তে কোন আবেগ ছিলো না। শায়খ সাহেবের দুআ' আমার মধ্যেও আবেগ সৃষ্টি করলো।

দুআ'র পর মনে এমন প্রশান্তিবোধ করলাম, যা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। প্রায় মাসাধিককালের মানসিক অস্থিরতার সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট রইলো না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না বলে যে পেরেশানি ছিলো তা দূর হয়ে গেলো। শায়খ সাহেব আবেগের সাথেই সর্বপ্রথম আলিঙ্গন করলেন। এরপর আবদুল খালেক সাহেবও আবেগের সাথে বুক মিলালেন। মাওলানা আবদুর রহীমসহ উপস্থিত সবাই কোলাকুলি করে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।"

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক আযম সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযম একটি বহুল আলোচিত ও অবস্মিরণীয় নাম। তিনি ১৯২২ সালের ৭ নভেম্বর ঢাকা শহরের লক্ষ্মী বাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেব বাড়ি মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির ও পিতামহের নাম মাওলানা আব্দুস সোবহান। তাঁর কমপক্ষে সাত পুরুষের আদি বাসস্থান ছিল বি'বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় বীরগাঁও গ্রামে। ১৯৪৮ সাল থেকে রমনা থানার পূর্ব মগবাজার এলাকায় তাঁর পরিবার ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

নবম শ্রেণি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তিনি 'ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' বর্তমানে কবি নজরুল কলেজে পড়াশুনা করেন। অসাধারন মেধার অধিকারী গোলাম আযম অসুস্থ শরীর নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এস এস সিতে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে দশম স্থান অধিকার করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি সাহিত্যে অনার্স ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি গ্রাজুয়েশন শেষ করে ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্সে ভর্তি হন।

১৯৪৬-৪৭ সেশনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭-১৯৪৮ ও ১৯৪৮-১৯৪৯ সেশনে তিনি ঢাকসুর জিএস (জেনারেল সেক্রেটারি) ছিলেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ঢাকাসহ গোটা দেশ ছিল উত্তেজনা ও আন্দোলনে উত্তাল। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিসংবাদিত ছাত্র নেতা গোলাম আযম এ ঐতিহাসিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের ছাত্র বিক্ষোভে সফল নেতৃত্বদান ও ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার দায়ে ১৪ মার্চ রাতে গ্রেফতার হন তিনি।

www.bjilibrary.com

১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে আয়োজিত সুবিশাল ঐতিহাসিক ছাত্র গণসমাবেশে ডাকসুর পক্ষ থেকে জনাব গোলাম আযম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানকে এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

গোলাম আযম ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্সে ২য় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসাবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তিনি তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হন এবং ০১ (এক) মাস কারাভোগ করেন।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে জামায়াতের দাওয়াত পেয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম একজন সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারি এবং আমীর হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশে সুদীর্ঘ ২৫ বছর জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০০ সালে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর মত বৃহত্তম ইসলামী দলের আমীরের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবসর গ্রহণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে তারই হাতে গড়া নেতা ও কর্মীরা দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছাত্র, পেশাজীবী এবং বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের নিকট তার লেখনী, বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টায়ও তিনি যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন।

www.bjilibrary.com

কারাগারে অধ্যাপক গোলাম আযমের রুকনিয়াতের শপথ

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের কয়েক মাস পরে মাহে রমাদানের ছুটিতে ঢাকায় ১৫ দিন ব্যাপী এক শিক্ষা শিবিরে অংশ নেন। শিক্ষা শিবির শেষে তিনি রুকনিয়াতের আবেদন যথারীতি পূরণ করেন। তখন পর্যন্ত রুকন বানাবার দায়িত্ব সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখাকে দেওয়া হয়নি। তাই তার আবেদনপত্র লাহোরে পাঠানো হয়। রুকনিয়াত মঞ্জুরীর পর ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে জামায়াতের রাজশাহী বিভাগের সংগঠক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য ড. আসাদ গিলানী সাহেব অধ্যাপক আযমের সাথে জেলখানায় সাক্ষাৎপূর্বক তাঁর রুকনিয়াত মঞ্জুরীর খবর দেন এবং কারা প্রাচীরের প্রকোষ্টে শপথ পাঠ করান। উল্লেখ্য রংপুরে অধ্যাপক গোলাম আযমই প্রথম রুকন হয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে জামায়াতের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আর যারা রুকন হয়েছিলেন, তন্মোধ্যে খুলনার জনাব শামসুর রহমান ও মুফতি আব্দুস সাত্তার, বগুড়ার মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির, কিশোরগঞ্জের মাওলানা আব্দুল জব্বার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রংপুরে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক তৎপরতা

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেই অধ্যাপক আযম রংপুরে সংগঠন সম্প্রসারণ ও মজবুত করার কাজে তৎপর হন। তাফহীমুল কুরআন বুঝার জন্য তিনি উর্দুভাষা আয়ত্ব করতে শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই দু'টো ইউনিট কায়েম করেন। একটি কলেজ ক্যাম্পাসে, অপরটি শহরে। কলেজ ইউনিটের নাযেমের দায়িত্ব তাঁর উপরে বর্তায় এবং শহরে ইউনিটের দায়িত্ব কেরামতিয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আলি আহম্মদ এর উপর অর্পিত হয়।

কলেজ ইউনিটে যারা ছিলেন তারা হলেন অধ্যাপক সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইসহাক, জমীরুদ্দীন আহম্মদ, আবুল খায়ের এবং পরবর্তী কালে রাজশাহী

www.bjilibrary.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকৃত ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর গোলাম রাসূল। উল্লেখ্য জনাব আব্দুল খালেকের হৃদয়গ্রাহী দরসে কুরআনের উৎস তাফহিমুল কুরআন (১ম খন্ড) থেকেই বুঝার জন্য অধ্যাপক আযম উর্দু ভাষা আয়ত্ব করতে শুরু করেন।

অঞ্চল ভিত্তিক সাংগঠনিক দায়িত্ব বন্টন

১৯৫৫ সালের প্রথমদিকে সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে গোটা পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয় এবং চারজনের ওপরে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত অঞ্চল সমূহ তখনো পর্যন্ত পূর্ণ বিভাগীয় প্রশাসনিক এলাকা নিয়ে বিভাজিত হয়নি।

১। ঢাকা ও ময়মনসিংহ : অধ্যাপক ওয়ায়ের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
২। চট্টগ্রাম : মাওলানা শের আলী খান।
৩। রাজশাহী ও রংপুর : সাইয়েদ আসাদ গিলানী।
৪। খুলনা ও বরিশাল : মাওলানা আব্দুর রহীম।

প্রাদেশিক সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমকে অতিরিক্ত দায়িত্ব সহ খুলনা শহরে পাঠানো হয়। তিনি খুলনা থেকে জনাব শামসুর রহমানের উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' পত্রিকার ১৯৫১ সাল থেকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। 'তাওহীদ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই জামায়াতের কর্মী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা থেকে 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক তাওহীদ পত্রিকাই ছিল জামায়াতের মুখপত্র।

www.bjilibrary.com

জনাব আব্বাস আলী খানের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

জনাব আব্বাস আলী খান অতি বড় মাপের একজন রাজনীতিক, সু-সাহিত্যিক ও গবেষক ছিলেন। জয়পুরহাটের স্থানীয় একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। সে সময় তিনি ইলমে তাসাউফের একজন দুর্দান্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁর পীর সাহেবের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাসাউফ চর্চায় অনেক উচু স্তরের একজন মানুষ।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে জনাব আব্বাস আলী খান বগুড়ার দায়িত্বশীল শায়খ আমীন উদ্দিনের সাথে দেখা করেন এবং মুত্তাফিক ফরম পূরণ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। কিছু দিন পর তিনি নিজ এলাকায় জামায়াতের একটি ইউনিট কায়েম করেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হন এবং তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব আব্বাস আলী খান-এর রুকনিয়াতের শপথ বাক্য পাঠ করান।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে যারা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন জনাব আব্বাস আলী খান তাদের একজন। এদেশের মানুষের কাছে তিনি এ সংগঠনের ব্যাপক পরিচিতি এনে দেন। জামায়াতে ইসলামীকে জানা এবং এ সংগঠনে যোগদান সম্পর্কে তিনি নিজে যেভাবে লিখে গেছেন পাঠকগণের কল্যাণে তা তুলে ধরা হলো[৮] -

"উনিশ শ' চুয়ান্নর ডিসেম্বর মাস। বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা শেষ হয়েছে। বড়ো দিনের বন্ধ সন্নিকটে।

স্থানীয় একটি মাদরাসায় ধর্ম সভা-ইসলামী জলসা। প্রধান বক্তা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বিশেষ বক্তা অধ্যাপক গোলাম আযম। রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অসুস্থ। টেলিগ্রাম এসেছে আসতে পারবেন না। আসছেন শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম। মাদরাসার সেক্রেটারি বার বার অনুরোধ জানিয়ে গেলেন উক্ত সভায় যোগদান করতে। বল্লেন, স্যার অবশ্যই যাবেন কিন্তু। সেক্রেটারি আমার এককালীন ছাত্র। অনুরোধ উপেক্ষাই বা করি কি করে ?

---

[৮] *স্মৃতি সাগরের ঢেউ, আব্বাস আলী খান।*

www.bjilibrary.com

অগত্যা বিকেলে রওয়ানা হলুম দু'চাকার সাইকেলে চড়ে। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে সভাস্থল।

বেলা ডুবতে তখনো কিছুটা বাকি। সভার বক্তা কোন পীর বা মাওলানা নন। তারা সাধারণতঃ মঞ্চে উঠেন রাতের বেলায়। তাই সন্ধ্যের আগে সভায় লোক তেমন জমে না। কিন্তু বক্তা এবার দুই জাঁদরেল শিক্ষাবিদ। তাই শ্রোতারা এসেছেন আগে ভাগেই।

দেখলুম অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তৃতা করছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও দাড়ি আছে। মাথায় বাবরী চুল আছে। চেহারা গৌর বর্ণের এবং আকর্ষণীয়। কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা করছেন বড়ো সুন্দর মনোমুগ্ধকর ভাষায়। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনছেন।

আমারও বড্ডো ভালো লাগলো। খোশ ইল-হানে কালামে পাকের আয়াত আবৃত্তি করছেন ঘন ঘন। মনে হলো কেরাত শিল্পও রপ্ত করেছেন। সন্ধ্যের পরেও প্রায় ঘন্টা খানেক বল্লেন। শ্রোতারা আরও শুনতে চান। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভাবটাও মিটাতে চান। কিন্তু তিনি রাতের ট্রেনেই রংপুর ফিরে যাবেন বলে শেষ করলেন।

এক সাথে খেতে বসেছি। খেতে খেতে পরস্পরের পরিচয় এবং আলাপচারিতাও হলো। তিনি কলেজের শিক্ষক আর আমি স্কুলের। মিলতো কিছুটা আছেই। বরঞ্চ একই পেশার লোক। তাই মনের মিল সহজেই হওয়ার কথা।

বিদায়ের আগে কিছু বই-পুস্তক কিনলুম তার কাছ থেকে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর লেখা সে বইগুলো।

বল্লুম, বগুড়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর কোন কাজ আছে কি?

বল্লেন, আলবৎ আছে। বগুড়া শহরে শায়খ আমীনুদ্দীন বলে একজন দায়িত্বে রয়েছেন।

মাওলানা মওদূদীর একখানা বই পড়েছিলুম কিছু কাল আগে। উর্দূ বই খুৎবাত। ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ প্রভৃতির মর্মকথা। চমৎকার হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লেখা। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত কোন জামায়াত আছে, আন্দোলন আছে, জান নেসার (উৎসর্গীকৃত) কর্মীবাহিনী আছে তা আমার জানা ছিল না। এ নামেরই এক ব্যক্তিকে গত বছর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো, সংবাদপত্রে দেখেছিলুম।

তাই আগ্রহ বেড়ে গেল তার জামায়াত ও আন্দোলন জানার। তার মৃত্যুদণ্ড ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) ও নমরুদ এবং মুসা কালীমুল্লাহ (আঃ) ও ফেরাউনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.bjilibrary.com

খাওয়া দাওয়া সেরে বিদায় হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার বিদায়ের আগে একটা মোটা অংক তার হাতেও গুঁজে দিলেন। যেমন ধারায় দেয়া হয়ে থাকে বক্তা ও ওয়ায়েযীনকে। কেউ দাতার প্রতি পুরো একীন রেখে চোখ বুঁজেই তা পকেটে রাখেন। কেউ আবার দাবি করে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেন। ওয়াযের পারিশ্রমিক-ন্যায্য পাওনা।

কিন্তু গোলাম আযম পীর মাওলানা নন। মৌসুমী বক্তা নন, তিনি অধ্যাপক। টাকা গুণে দেখে বল্লেন, "না না এতো কেন? আমার যা খরচ হয়েছে তাই দিন। এই ধরুন রংপুর-জয়পুরহাট আপডাউন যাতায়াত এতো টাকা এতো আনা এতো পয়সা। তাই দিন। তার এক পাইও বেশি নেব না। নেবই বা কি করে?"

অংক কষে তাই নিলেন। মৌলভী, পীর ও বক্তাদের বাঁধা-ধরা নিয়মের খেলাপ কাজ করে গেলেন। কে কি মনে করলেন জানি না। কিন্তু আমার বড্ডো ভালো লাগলো। মনে মনে প্রশংসা করলুম অধ্যাপকের। পেশাজীবী বক্তা ও মুবাল্লিগ অধ্যাপকের তফাৎটা উপলব্ধি করলুম।

দ্বীনের মুবাল্লিগের ত তাই করা উচিত। "ইত্তাবেয়ূ মাল্লা ইয়াসআলুকুম আজরান" (ইয়াসীন)। তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে (দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে) কোন পারিশ্রমিক চায় না।

"ওয়া মা তাসআলুহুম আলায়হি মিন আজরিন" (ইউসুফ)। - অথচ তুমি এ দ্বীনি খেদমতের জন্যে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাইছ না।.....

বিদায়কালীন তার ভূমিকাটি বড়ো ভালো লাগলো। পায়ে চুমো দিয়ে নযর নিয়ায দক্ষিণা দেয়া নেই। তাবিজ তুমারের বস্তাও নেই। এটাই তো ইসলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর রাতে সাইকেলে চার মাইল অন্ধকারে পাল্লা দেয়া বিপজ্জনক বলে সবাই থাকতে বল্লেন। তাই রয়ে গেলুম মাদরাসার কামরায় অন্যান্যদের সাথে।

অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল। সকলের মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার ভাষণের। পীর মাওলানাদের মতো ফিসও নিলেন না।

কিন্তু মজার ব্যাপার এক মৌলভী সইতে না পেরে খ্যাঁক করে উঠলেন এবং আবোল তাবোল বকা শুরু করলেন।

বল্লেন, যতো সব ভন্ডামি। জানেন, এরা সব কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে টাকা পায়? তার জন্যে দেখলেন না রেল ভাড়া ছাড়া এক পয়সাও নিলেন না?

বল্লুম- প্রয়োজনের অতিরিক্ত না নেয়াটা কি পাপ কাজ? তারপর কমিউনিষ্টরা কি কলেমা তাইয়্যেবায় বিশ্বাসী? আপনারা কি কালেমার এমন ব্যাখ্যা করেছেন কোন দিন? কালেমা নিজে বুঝেছেন কোন দিন? বেয়াড়া মৌলভী আসল কথার জবাব না দিয়ে উল্টো তর্ক করে। বুঝলুম এরা সব পয়সার গোলাম।

www.bjilibrary.com

আমার লাভ হলো যে, জামায়াত সম্পর্কে জানবার আগ্রহ শতগুণে বেড়ে গেল। তাই মনে মনে সংকল্প করলুম বড়ো দিনের বন্ধ দিয়েই বগুড়া যাব শায়খ আমীনুদ্দীনের সাথে দেখা করতে।

যথাসময়ে বগুড়া গিয়ে বড়ো মসজিদের সামনে একটি লোককে জিজ্ঞেস করলুম-শায়খ আমীনুদ্দীন কে বলতে পারেন?

তিনি একটু দূরে? শীতের দিনে রোদে আরাম করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোককে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, ঐ যে দাঁড়িয়ে শায়খ সায়েব।

কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে পরিচয় দিলুম।

বল্লেন-ওহো, দূরের দরিয়াতো নিকটেই এসে গেছে দেখছি। "আসুন আসুন" বলেই তিনি আমাকে তার ছোট্ট একটি পুস্তকের দোকানে বসালেন।

বল্লেন, একজন পুলিশ অফিসারের মুখে আপনার কথা শুনেছিলাম ভেবেছিলুম আপনার দ্বারা আমাদের কাজ হবে। কিন্তু দেখা করার ফুরসত পাইনি। অবিশ্যি ক'মাস আগে জয়পুরহাট গিয়েছিলুম 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' সম্মেলনে যোগদান করতে। পশ্চিম পাকিস্তানের মানকী শরীফ ও জাকোরী শরীফের পীর সাহেবান এবং দুই অঞ্চলেরর বহুত খুবসুরত জোয়ান জোয়ান বনানালোগ সম্মেলন গোলজার করে রেখেছিলেন। পৌরহিত্য করছিলেন মানকার চরের পীর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। জামায়াত থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল রিপোর্টার হিসেবে। মনে করেছিলুম তিন দিনের সম্মেলনের পর আপনার সাথে দেখা করে আসবো। কিন্তু পয়লা দিনেই এক দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আমার ব্যাগটা একটা কামরায় রেখে হাজতে গেলুম। ফিরে এসে দেখি ব্যাগটা একেবারে গায়েব। প্রয়োজনীয় বহু কিছু ছিল ব্যাগের মধ্যে। পায়জামা, পাঞ্জাবী, তেহবন্দ, চাদর, কিছু বইপুস্তক, কাগজ কলম। সব হারালুম। আর এ সম্মেলনেই আওয়ামী মুসলিম লীগের 'মুসলিম' শব্দটা ছেঁটে ফেলে দিয়ে তাকে অমুসলিম করা হলো। সম্মেলনের গোটা পরিবেশটাই যেন কেমন কেমন লাগছিল। মনটা বড্ডো খারাপ হলো। তাই একেবারে বগুড়া ফিরে এলুম। আপনার সাথে দেখা করা আর হলো না। তা এখন কি খেদমত করতে পারি বলুন।

তার সাথে আমার সুদীর্ঘ দু'ঘন্টা জামায়াতে ইসলামী, মাওলানা মওদূদী, ইসলামী জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। আমার বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব তিনি দেন। তার গভীর ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলুম। তিনি বগুড়াতেই ষাটের দশকে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তার প্রতি রহমত ও মাগফেরাত বর্ষণ করুন।

জামায়াতে ইসলামীতে প্রথমে সমর্থক হিসেবে দাখিল হওয়ার একখানা ফরম তিনি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, বাড়ি গিয়ে হাজার বার চিন্তা ভাবনা করে

www.bjilibrary.com

দেখুন। যদি মন বলে যে, এ জামায়াত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলে ফরমখানা পূরণ করে পাঠিয়ে দেবেন।

তার কাছ থেকে বিদায় হয়ে বাড়ি এলুম। মনের মধ্যে তখন তোলপাড় শুরু হয়েছে। ক'দিন অন্যকিছু ব্যস্ততায় কেটে গেল। তাই বলে মন থেকে জামায়াতের চিন্তা বাদ পড়েনি।

ঠিক মনে নেই, পঞ্চান্ন সালের জানুয়ারি মাসের পয়লা কি দুসরা, তবে শুক্রবার বাদ ফজর তিলাওয়াতে কুরআন পাকের পর আল্লাহর নাম নিয়ে ফরমখানা পূরণ করে ডাকে পাঠিয়ে দিলুম শায়খ সায়েবের কাছে।

এক হপ্তার মধ্যেই জবাব এলো। জবাবের সাথে নির্দেশ এলো একটি ইউনিট গঠনের। সেই সাথে সাঁইত্রিশখানা উর্দু বইয়ের তালিকা পাঠিয়ে বলেছেন তা সত্বর খরিদ করে পড়াশুনা করতে। তার মধ্যে তাফহীমুল কুরআন (১ম খন্ড) এবং তর্জুমানুল কুরআন, গোলাম রসূল মেহেরের- "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ 'শহীদ' উল্লেখযোগ্য কিছু নিজে এবং কিছু স্কুল লাইব্রেরীতে কিনলুম। একটা ইউনিট গঠন করে কাজও শুরু করলুম।

ছাপ্পান্ন সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হলুম। অধ্যাপক গোলাম আযম চাকরি ছেড়ে জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী বিভাগের আমীর হয়েছেন নওগাঁ তার শ্বশুর বাড়ি। সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে আমার রুকনিয়াতের শপথ করালেন। আল্লাহ তায়ালার বন্দেগি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ের জন্যে পুরোপুরি কায়েম করা ও কায়েম রাখার নামইত ইসলাম। আর তা বড়ো কঠিন কাজ। তার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে নফসের সাথে, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সাথে এবং প্রতিষ্ঠিত বাতিল সরকারের সাথে। তাই ত কুরআন হাদীসের কথা। যারা এ কাজ করে তারাই প্রকৃত অর্থে মুমেন এবং মুমেনদের জান মাল আল্লাহ খরিদ করে নেন। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তা হবে চরম মুনাফিকি এবং নিমকহারামি। আল্লাহর খরিদ করা জানমাল তার পথেই ব্যয় করার শপথ করে জামায়াতের রুকন হলুম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলুম যে পথের সন্ধান ইলমে তাসাওউফ আমাকে দিতে পারেনি। ভাগ্য ভালো নইলে আরও কিছুকাল ইলমে তাসাওউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মৎ হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় বসে অর্থহীন তপজপে জীবন কাটিয়ে দিতুম। জীবনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও তত্ত্বকথা ইলমে তাসাওউফের ময়দানে জানতে পারিনি- এ জিহাদের ময়দানে এসে জানতে পারলুম। যে হাকীকত ও মারেফাতের সন্ধানে এতো দিন ছিলাম তার সব কিছুর সন্ধান পেলুম এ জিহাদের ময়দানে।

www.bjilibrary.com

ইতিহাস ঘেঁটে ঘুঁটে দেখলুম সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর (রহ.) পর ইলমে তাসাউফের ময়দান থেকে কোন জিহাদের সূচনা হয়নি, বরঞ্চ বাতিলের সাথে প্রায় ক্ষেত্রে তাসাওউফ পন্থীগণ সমঝোতা করে এসেছেন। মাওলানা মওদূদী ১৯৫৬ সালে প্রথমবার তার পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়া শহরে জনসভায় ভাষণ দেন। তাতে যোগদান করেছিলুম। তার ভাষণ কতমিষ্টি, কত সুন্দর, কত যুক্তিপূর্ণ! মনের গভীরে প্রবেশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এখন আমি পুরোপুরি জামায়াত কর্মী।

সংগঠনের নির্দেশে আব্বাস আলী খান সাহেবের চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদান

আব্বাস আলী খান সাহেব ছিলেন একজন অতি উঁচু মানের আদর্শ শিক্ষক। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ছাত্র-অভিভাবক সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাত্ররা তাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। নিরলস শ্রম আর মেধা দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলছিলেন। এমনি এক সময় ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে সংগঠন থেকে আব্বাস আলী খান সাহেবকে চাকরি ছাড়ার জন্য বলা হলো। সংগঠনিক কাজে যেন বেশি বেশি সময় দেওয়া যায় সে জন্য সংগঠন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদী সম্পন্ন করে কাউকে না জানিয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা চেয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত জমা দেন।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি এক মাস পর্যন্ত খান সাহেবকে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন। খান সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আহ্বান করা হয়। উদ্দেশ্যে ছিল ম্যানেজিং কমিটির সবাই মিলে বুঝিয়ে খান সাহেবের ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করাবেন। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনায় ম্যানেজিং কমিটি খান সাহেবের দরখাস্ত মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি অনুমতি দিলেও ছাত্রদের দাবির কারণে তাঁর স্কুল থেকে বিদায় নেওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে

www.bjilibrary.com

ঘটনাকে তিনি তার রচিত "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" বইতে যেভাবে লিখেছেন তা নিম্নরূপঃ

"ছাপ্পান্ন (১৯৫৬) সালের মাথায় জামায়াত থেকে হুকুম এলো চাকরি ছাড়তে হবে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, ম্যাট্রিক টেষ্ট পরীক্ষা, প্রভৃতি সব সেরে কাউকে না বলে চাকরির ইস্তাফা পত্র দাখিল করলুম। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি, সদস্যবৃন্দ এক মাস ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন ইস্তাফা প্রত্যাহার করার জন্যে। কিন্তু করিই বা কেমন করে? থুথু ফেলে তা কি আবার চাটা যায়? তাছাড়া সংগঠনের কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছি। তার হুকুম অমান্যই বা করি কি করে?

সাতান্ন সালের ফেব্রুয়ারির পয়লা সপ্তায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকা হলো আমার ইস্তাফা পত্র বিবেচনার জন্যে। তখনো আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। অতএব আমার ইস্তাফা পত্র মঞ্জুর করা হলো।

সংগে সংগে খবরটা ছাত্রদের মধ্যে ও বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। দশম শ্রেণীর ফার্স্ট বয় আমার প্রিয় ছাত্র বিনয় কুমার কুন্ডু তড়িঘড়ি ইংরেজিতে (আমারই শেখানো) ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেস (Farewel Address) হাতে লিখে মনোরোম বাধাঁই করে আমার বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। শিক্ষক-ছাত্র বিস্মিত স্তম্ভিত, মর্মাহত, অশ্রুকাতর।

চোখের পানিতে বিদায় নিয়ে বাড়ি এলুম। ভেতরে গেছি বিবিকে বুঝাবার জন্যে। বাড়ি থেকে করা আরামের চাকুরী কেন ছাড়লুম, এখন কিভাবে দিন যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর খবর এলো দু'আড়াইশ' লোক আমার বাড়ি ঘেরাও করেছে। বিবি সায়েবার মন ত এমনিতেই খারাপ। তার উপর বাড়ি ঘেরাও। বল্লেন, খবরদার, বাড়ি থেকে বেরুনো চলবে না। চাকরি ত গেলো। শেষে জানটাও কি দেবে?

বল্লুম, দেখিই না ব্যাপারখানা কি। বলেই বাইরে এলুম, দেখলুম আমার স্কুলের সব প্রিয় ছাত্ররা। নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন একজন যাকে আমি টেষ্ট পরীক্ষায় ডিজঅ্যালাও করেছি।

বল্লো, স্যার আপনাকে আমরা স্কুল ছেড়ে কিছুতেই যেতে দেব না। আমরা ম্যানেজিং কমিটিকে দেখে নেব .....।

ভারি মুস্কিল। আজ ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ। জামায়াত থেকে নির্দেশ এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের বাওয়ালপুরের মাছিগেটে যে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন হচ্ছে তাতে যোগদান করতে। পাসপোর্ট করে

www.bjilibrary.com

ভারতের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট ভিসাও যোগাড় করেছি সংগোপনে। ন' তারিখ রাতে কোলকাতা রওয়ানা হওয়ার কথা। তার দু'দিন আগে এই বাধা।

ছাত্ররা দমবার নয় কিছুতেই। শেষে তাদের কাছে খুবই স্নেহ মাখা ভাষায় এক প্রস্তাব রাখলুম। বল্লুম, সার্কেল অফিসার মাহবুব আলম চৌধুরী আমাদের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। আগামীকাল সকালে তোমাদের একজন বা দু'জন প্রতিনিধি এবং আমি তার বাসায় বসবো। সেখানে যা ফয়সালা হয় মেনে নেব। কেমন? তোমরা ত আমার কথা কোনদিন অমান্য করনি। আল্লাহর মর্জি ছেলেরা রাজী হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে আগে ভাগেই সার্কেল অফিসারকে সব কথা খুলে বল্লুম, আমার বাইরে যাওয়ার কথাও। বল্লুম, যেমন করেই হোক ছেলেদেরকে নিরস্ত করতেই হবে।

বিজ্ঞ সার্কেল অফিসার ছাত্রদের প্রতিনিধিদেরকে বল্লেন, দেখ, উনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন। সেক্রেটারি এবং আমি নিজে তাকে বহু অনুরোধ করেছি, রাজী হননি। এখন তোমরা যদি হৈ চৈ কর, তাহলে লোকে বলবে খান সায়েব ইস্তাফা দিয়ে ছেলেদেরকে উস্কিয়ে দিয়েছেন গোলমাল করার জন্যে। এতে করে তার ভয়ানক বদনাম হবে। তোমরা কি তার বদনাম চাও? তোমরা ত তাকে পরম শ্রদ্ধা কর। তারপর তিনি কিছু দিনের জন্য একটু পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছেন। তোমরা বরঞ্চ একটু সবর কর। তিনি ঘুরে আসার পর তখন দেখা যাবে। আল্লাহর শুকরিয়া ছেলেরা রাজি হয়ে গেল।"

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

করাচীর রুকন সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তানী প্রতিনিধি দল

১৯৫৫ সালের নভেম্বরে করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান, প্রাদেশিক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুর রহীম সদ্য কারামুক্ত রুকন অধ্যাপক গোলাম আযম, রাজশাহী অঞ্চলের আমীর সাইয়েদ আসাদ গিলানী এবং কয়েকজন রুকন যোগদান করেন। উল্লেখ্য- সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের রুকনদের জন্য নির্দিষ্ট প্যান্ডেল ছিল।

উক্ত সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য চৌধুরী আলী আহমদ খান প্রস্তাব করেন যে, এখানে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে, তাই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। তাঁর এ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং যথা সময়ে নির্বাচন সাপেক্ষে মাওলানা আব্দুর রহীমের উপর প্রাদেশিক আমীরের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। চৌধুরী আলী আহমদ খানের সাথে ড. আসাদ গিলানী (যিনি পরে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস নিয়ে আশির দশকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছিলেন) তাকেও অব্যাহতি দেয়া হয়। করাচীর উক্ত শূরা বৈঠকে এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে জনাব আব্দুল খালেককে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠানো হোক এবং সাইয়েদ আসাদ গিলানীর স্থলে উত্তর বঙ্গের জেলাগুলোর দায়িত্ব অধ্যাপক গোলাম আযমের উপরে অর্পিত হোক।

এই সময় গণ-পরিষদ নামে অভিহিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ চলছিলো। পরিষদ সদস্যদেরকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তিনি ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে পি, আই, এ বিমান যোগে করাচী গমন করেন। ঘটনাক্রমে প্রায় চার মাস পরেই ছিল করাচীতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন। এই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন জামায়াতের করাচী শহর

www.bjilibrary.com

শাখার আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ। মাওলানা মওদূদীর The Islamic Law and the Constitution গ্রন্থখানি অধ্যাপক গোলাম আযম পরিষদ সদস্যদের মধ্যে বিতরণে সফলতা লাভ করেন। সর্বাধিক বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী অধ্যুষিত করাচীতে তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস অবস্থান পূর্বক বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

প্রথম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচন

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে লাহোর থেকে আমীরে জামায়াতের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের আমীর নির্বাচনের জন্য অধ্যাপক গোলাম আযমকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, ঈশ্বরদী ও বগুড়াতে মোট রুকন সংখ্যা অর্ধ-শতের বেশি ছিল না।

জামায়াতের সদস্য সংখ্যা যাই হোক, জামায়াতের গঠনতন্ত্র মুতাবিক নির্বাচনী বিধি যথাযথ পালনের জন্য ব্যালট পেপার মুদ্রণ, রেজিষ্ট্রি ডাকে ব্যালট পেপার প্রেরণ এবং নির্ভরযোগ্য লোক মারফত ব্যবহৃত ব্যালট পেপার সংগ্রহ করা হয়। ঢাকা শহর আমীর ও শহরের আরো দু'জন রুকন ভোট গণনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম প্রাদেশিক আমীর নির্বাচিত হন এবং ঢাকা শহরের রুকনদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচিত আমীরকে শপথ পাঠ করান। মাওলানা আব্দুর রহীম প্রথম নির্বাচিত আমীর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জামায়াতের গঠনতন্ত্র মোতাবেক অধ্যাপক গোলাম আযমকে প্রাদেশিক সেক্রেটারি নিয়োগ করেন।

মাওলানা আব্দুর রহীম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হবার পর সাংগঠনিক কাজে বেশ গতিশীলতা দেখা দেয়। পরবর্তী দু'থেকে তিন বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের রুকন সংখ্যা প্রায় দ্বি'গুণ বৃদ্ধি হয়। এঁদের মধ্যে যারা দেশব্যাপী সফল নেতৃত্ব দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তন্মধ্যে মরহুম আব্দুল খালেক, মরহুম আব্বাস আলী খাঁন, মরহুম অধ্যাপক

www.bjilibrary.com

মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মরহুম মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী, মরহুম মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির, মাওলানা আব্দুস সোবহান, মরহুম অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় রংপুর তথা উত্তর বঙ্গের শক্তিশালী সাংগঠনিক জেলা শাখা সৈয়দপুর রুকনদের মধ্যে সর্বজনাব ফারুক আযম, মানাজির, কাইয়ুম শাহেব, মোঃ শামসুদ্দীন খান এবং বরিশালে মাওলানা মু. আব্দুস সাত্তার (কাউখালী), মাওলানা শেহাব উদ্দীন খান (গৌরনদী) প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাওলানা মওদূদীর প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে আগমন

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা মজবুত হবার পরেই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু মিথ্যা মামলায় ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত মর্দে-মুজাহিদ একাধারে কয়েক বছর জেলে আটক থাকায় ১৯৫৬ সালের পূর্বে এ বিরাট ইসলামী চিন্তানায়কের পক্ষে এদেশে আসা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৫৬ সালের শুরুতে মাওলানা মওদূদীর প্রথম ঢাকা আগমন উপলক্ষে ঢাকা শহর জামায়াত সাধ্যমতো যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও প্রচার পত্র বিলি করে মাওলানা মওদূদীর ঢাকা আগমনের বিষয়টি প্রচার করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি পি, আই, এ বিমান যোগে বিকাল তিনটায় মাওলানা তেজগাঁও বিমান বন্দরে পৌঁছেন। বিমান বন্দরে মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানাতে আগ্রহীদের সুবিধার্থে শহরের কয়েকটি স্থানে যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য যারা অধ্যয়ন করেছেন এবং যারা মাওলানাকে মহব্বত করেন বলে ধারণা ছিল প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম, সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম এবং ঢাকা শহর আমীর অধ্যাপক ওসমান রময তাদের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে বিমান বন্দরে আসতে দাওয়াত দেন।

www.bjilibrary.com

দাওয়াত কবুল করে যারা মেহমান হিসাবে বিমান বন্দরে হাজির ছিলেন, তন্মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এম, এন, এ, লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়ার প্রিন্সিপাল ও খাদেম-উল ইসলাম জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী, জমিয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মোফাস্‌সির-ই কুরআন মাওলানা নূর মোহাম্মদ, মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ খান প্রমুখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মাওলানা বিমানের দরজায় পৌঁছামাত্রই মাওলানা মওদূদী জিন্দাবাদ, জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ ইত্যাদি ধ্বনিতে বিমান বন্দর মুখরিত হয়ে ওঠে। সাদা শেরওয়ানী ও উচুঁ টুপি পরিহিত দেখে মেহমানকে সবাই সহজেই চিনে নেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা মাওলানাকে দেখেননি। উল্লেখ্য- মাওলানার সাথে তার সফর সঙ্গী ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফাইল মুহাম্মদ।

বিমানবন্দর থেকে অভ্যর্থনাকারী ছাত্রজনতা মিছিল সহকারে মাওলানাকে তেজগাঁও থেকে নবাবপুর রোডে পৌঁছে দেয়। মিছিলে মাওলানার গাড়ির সাথে অপর গাড়িতে মাওলানা আকরাম খাঁ ও মাওলানা ফরিদপুরী ছিলেন। বিদায় নেবার কালে মাওলানা আকরাম খান মাওলানাকে দৈনিক আজাদ সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী জানান যে আমীরে জামায়াতের শুভাগমন উপলক্ষে তিনি লালবাগে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সাথে এক মাজলিসে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। মাওলানা স্বভাব সুলভ মুচকি হেসে উভয়কে আন্তরিক শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

www.bjilibrary.com

ঢাকায় মাওলানার অবস্থান

প্রাদেশিক ও শহর জামায়াতের অফিসে নওয়াবপুর রোডের ২০৫ নং বাড়ির দোতলায় মাওলানার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে জামায়াতে ইসলামীর এমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল যাতে করে মাওলানাকে কোন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া জামায়াতের এমন কোন কর্মীও ছিল না যার বাড়িতে মেহমান হিসাবে রাখা যায়। আমীরে জামায়াতের জন্য মানানসই থাকার ব্যবস্থা করতে না পারায় তৎকালীন দায়িত্বশীলগণ ব্যথিত ছিলেন।

সফরে অধিকাংশ যাতায়াতের ব্যবস্থা ট্রেনেই করা হয়। তাছাড়া ঢাকা থেকে বরিশাল ও খুলনায় স্টিমারেও গিয়েছেন। মোটরকারে সফর করানোর মত আর্থিক সামর্থও তখনকার জামায়াতের ছিল না।

মাওলানার ৪০ দিনের সফরসূচি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর প্রথম সফরে ৪০ দিন অবস্থান করেন। মাওলানার সফরসূচি ঢাকা থেকে শুরু হয় এবং ঢাকায় শেষ হয়। প্রথম দফায় ৩০ জানুয়ারি সিলেট থেকে শুরু হয়ে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কেনী, মাইজদী (নোয়াখালী) হয়ে ঢাকা। দ্বিতীয় দফায় বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

সফরকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার মুখ থেকে এদেশের মানুষ ইসলাম ও জামায়াতের দাওয়াত সম্পর্কে সরাসরি শুনবার সুযোগ পায়। ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে মিথ্যা মামলায় দণ্ডিত হয়ে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে হাসিমুখে ফিরে আসা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত বড় মাপের একজন আলেমকে তারা সশরীরে দেখতে পান। তিনি বহু জনসভায় ভাষণ দেন, অসংখ্য সুধী সমাবেশ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন। শুক্রবার যেখানেই প্রোগ্রাম হতো, সেখানে জুমআ'র নামাযে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি জুমআ'র খুতবা দিতেন এবং জামায়াতের ইমামতি করতেন।

ঐ সময়ে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন যে পর্যায়ই থাকুক, সব জায়গায় মাওলানার জন্য গঠিত সম্বর্ধনা কমিটিতে সব মহলের গণ্যমান্য লোক শরিক হয়েছেন। সর্বত্রই মাওলানাকে এক নজর দেখার জন্য জনতা অত্যন্ত উৎসুক ছিল। ট্রেনে সফরকালে যে স্টেশনেই গাড়ি

www.bjilibrary.com

থেমেছে, সেখানেই লোকেরা মাওলানাকে দেখার জন্য ভীড় জমাতো। মাওলানার চেহারা দেখে মানুষ মুগ্ধ ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তো।

জনসভাগুলোতে সাধারণত প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম সভাপতিত্ব করতেন ও প্রাদেশিক সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম মাওলানার বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করতেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাদরাসায় পড়ুয়া না হয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা মাওলানার বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের অনুবাদ শুনাতে অধ্যাপক সাহেবকে বেগ পেতে হয়নি। জামায়াতে ইসলামী ঐ সময়ে একটি দল হিসাবে জনগণের নিকট নতুন হলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রখ্যাত একজন আলেম এসেছেন, জেনে দূর দূরান্ত থেকেও বিপুল সংখ্যক মানুষ জনসভায় সমবেত হতো এবং সুযোগ পেলে মুসাফাহ করার জন্য মঞ্চের কাছে আসার চেষ্টা করতো।

সুধী সমাবেশগুলোতে আধুনিক শিক্ষিত সব পেশার লোক এবং ওলামা-মাশায়েখরা সমবেত হতেন। আমীরে জামায়াত তাঁর স্বভাব সুলভ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রচলিত মানব রচিত আইনের বদলে ইসলামী আইনের প্রাধাণ্য, কল্যাণকর দিক ও গুরুত্ব তুলে ধরতেন এবং এর জন্য প্রথমে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে জোর দিতেন। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের অসারতা তুলে ধরতেন। মাওলানার বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা প্রশ্ন করার আগ্রহ দেখাতেন। প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়ে সবাই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি বিশেষে মাওলানা সাক্ষাৎকারের সুযোগও দিতেন। ১৯৫৬ সালে ৪ঠা মার্চ ঢাকা জেলা বোর্ড হলে এক সুধী সমাবেশে প্রধানত: তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যা, সরকারি তথা কেন্দ্রীয় বেইনসাফী, অভাব-অভিযোগ ও তার সুষ্ঠু সমাধান সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী দীর্ঘ আলোচনা করেন। মুহাজির সমস্যা, ভাষা সমস্যা, সরকারি চাকরির বৈষম্য, প্রাদেশিক প্রতিরক্ষা ইত্যাদি গভীরভাবে উপলব্ধি পূর্বক সে সবের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেন। মাওলানার এ ঐতিহাসিক ভাষণটি 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও সমাধান' শিরোনামে বাংলা ও উর্দূতে পুস্তিকাকারে বিলি করা হয়।

সুধী সমাবেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ বাছাই করা সুধীমণ্ডলীদের কার্ড মারফত ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

সভা-সম্মেলনে মাওলানার আলোচনার বিষয়

জনসভায় মাওলানা বক্তৃতার প্রথম অর্ধেক সময়ে ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করতেন। রাসূল (সা.) এর ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনের উল্লেখ করে রাসূলেরই (সা.) অনুকরণে দ্বীন-ইসলামকে বাস্তবে কায়েম করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতেন। জামায়াতে ইসলামী যে ঐ মহান উদ্দেশ্যেই আন্দোলন করছে, তা উল্লেখ করে জামায়াতে যোগদানের দাওয়াত দিতেন।

তাঁর বক্তৃতার দ্বিতীয় অর্ধেক সময় পাকিস্তানের ঐ সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার গুরুত্ব তুলে ধরতেন। ঐ সময়ই শাসনতন্ত্র রচনার কাজ চলছিলো। করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক চলছিলো। আওয়ামী লীগের সদস্যগণ পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনকে উপলক্ষ্য করে শাসনতন্ত্রের ইসলামী ধারাগুলো সম্পর্কেও কৌশলে আপত্তি উত্থাপন করতেন। তাই মাওলানার বক্তৃতার রাজনৈতিক অংশে যা বলতেন তা পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের সমালোচনার পর্যায়েই পড়ে যেতো।

সুধী-সমাবেশগুলোতে মাওলানা তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত আইনের বদলে ইসলামী আইনের প্রাধান্য ও গুরুত্ব তুলে ধরতেন এবং এর জন্য প্রথমে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা ওপর জোর দিতেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের অসারতাও তুলে ধরতেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদের মন জয় করতেন তিনি।

মাওলানার সফরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

মাওলানা মওদূদীর সফরের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সুধী ও শিক্ষিত মহল মাওলানা সম্পর্কে জানতে পারে। মাওলানার একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর প্রিয় নেতার সফর সম্পর্কে রাজশাহী বারের তৎকালীন সভাপতির মন্তব্য এভাবে স্মৃতি কথায় তুলে ধরেছেন,

> *"বিরাট এক মাওলানা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসবেন শুনে কল্পনা করেছিলাম যে, বিশাল পাগড়ি মাথায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক সজ্জিত অবস্থায় দেখবো, এখন দেখলাম যে, রীতিমতো একজন প্রতিভাবান ভদ্রলোক।"*

www.bjilibrary.com

সফরে মাওলানা জামায়াতের দাওয়াতকে ব্যাপকতর করার মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করে তাঁর দাওয়াতি প্রভাবকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন।

১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মতান্তরে ২৩ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রস্তাব পেশ করে। মাওলানা মওদূদী প্রতিটি জনসভা ও সুধী সমাবেশে ইসলামী আন্দোলনের দাবি তথা মূল বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তখন আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামের 'গন্ধ' পেয়ে শাসনতন্ত্র বর্জন করার পাল্টা আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করায় মাওলানাকে 'মন্দের ভাল' হিসাবে উক্ত শাসনতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন।

মাওলানা মওদূদীর সফরের পর

১৯৫৬ সালের ৬ মার্চ মাওলানা মওদূদী তাঁর ৪০ দিনব্যাপী সফর সমাপ্ত করে লাহোর ফিরে যান। যাবার আগে তিনি ৪টি বিভাগভিত্তিক সংগঠন কায়েম করে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে দেন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর বিদায়ের পর পরই প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আবদুর রহীম ০৪ (চার) বিভাগীয় আমীরের এক বৈঠক ডাকেন। সে বৈঠকে জেলাভিত্তিক সংগঠন কায়েমের সিদ্ধান্ত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৭টি জেলা ও ৪টি বিভাগ ছিল, বিভাগগুলো হচ্ছে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা। জনাব আব্দুল খালেক চট্টগ্রাম ও জনাব আব্বাস আলী খানকে রাজশাহী বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। গোলাম আযম সাহেব প্রাদেশিক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ও অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। খুলনা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব পালন করার মতো কোন রুকন খুলনায় ছিলেন না। মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ ঐ সময় (১৯৫৩-৫৬) বরিশাল জেলাধীন মঠবাড়িয়া থানার উপকণ্ঠে অবস্থিত টিকিকাটা মাদরাসার শিক্ষকতা করছিলেন। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম কিছুদিন খুলনায় অবস্থান করে মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে খুলনায়

www.bjilibrary.com

এনে তাকে খুলনা বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব দিয়ে ঢাকার ফিরে আসেন। ঢাকা বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য কোন রুকন না পাবার দরুন লালবাগস্থ রহমাতুল্লাহ মডেল হাই স্কুলের হেড মাস্টার সাইয়েদ হাফিজুর রহমানের উপরে উক্ত দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তিনি বিভাগীয় আমীরগণকে ব্যাপক তৎপরতার নির্দেশ দেন। তখনো প্রাদেশিক মজলিসে শূরা গঠিত হয়নি বলে বিভাগীয় আমীরদের বৈঠকেই প্রয়োজনীয় সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐ বৈঠকে সবাই একমত হন যে, ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক দল হিসাবে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলো না। মাওলানা মওদূদীর সফরের পর পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করলো। এখন থেকে জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে রাজনৈতিক তৎপরতাও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদেরকে জামায়াত সম্পর্কে অবহিত করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আবদুর রহীম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সংগঠনভুক্ত সকলকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে জামায়াতের সাহিত্য উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি জরুরি।" এ বিষয়ে সবাই মাওলানার সাথে একমত পোষণ করেন। এরপর মাওলানা আব্দুর রহীম প্রাদেশিক আমীর ও সেক্রেটারির মধ্যে কর্ম বন্টনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। মাওলানা বলেন, আমাদের দু'জনের ওপরই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু অনুবাদের কাজটি যেহেতু আমাকেই করতে হবে সেহেতু ঐ দু'টো দায়িত্বের জন্য আমার সময় দেওয়া সম্ভব নয়। আমাকে পূর্ণ সময় অনুবাদে ব্যয় করতে না দিলে অনুবাদ বিলম্বিত হবে। তাই ঐ দু'টো দায়িত্বই সেক্রেটারিকে পালন করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর জনাব আবদুল খালেক বললেন, "আপনি রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেন; কিন্তু সাংগঠনিক

www.bjilibrary.com

দায়িত্বতো প্রধানত আমীরের। আপনি সংগঠনভুক্ত সবার আমীর, তারা মা'মূর। আপনার নির্দেশ ও হেদায়াত পাওয়া তাদের হক। সংগঠন পরিচালনাই আমীরের আসল দায়িত্ব।"

উপস্থিত সবাই আবদুল খালেক সাহেবের মতকে গুরুত্ব দিয়ে সমর্থন করলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম বললেন, "আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী চলাই আমার দায়িত্ব। তাই সংগঠনের মূল দায়িত্ব আমীরকেই পালন করতে হবে বলে আমার ধারণা।"

মাওলানা আবদুর রহীম তাঁর মতামতে অনড় থাকলেন। তিনি বললেন, "তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদসহ জামায়াতের বিপুল সাহিত্যের অনুবাদ দ্রুত করতে হলে আমাকে অন্য দায়িত্ব থেকে রেহাই দিতেই হবে।"

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে, সাংগঠনিক ব্যাপারেও সেক্রেটারিকেই পুরো দায়িত্ব পালন করতে হবে। যখন যে বিষয়ে আমীরের নির্দেশ প্রয়োজন সে বিষয়ে আমীরকে অবহিত করে নির্দেশ নিতে হবে।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসসহ হিন্দু দলগুলোর কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া, দলের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা সমর্থন করার পর আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস ও হিন্দু দলগুলোর আস্থা অর্জন করায় এ কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্ভব হয়। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সবাই আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী বা আধুনিক শিক্ষিত কোন ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন না। এ কমিশনই ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গত শতাব্দীর ৪০-এর দশকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা গান্ধী ও নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে সে সময়কার ১০ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ বলিষ্ঠ অবস্থান নেয়। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে বিজয়ী করে। ইসলামী আদর্শে মুসলিম জাতিকে গড়ে তোলার দোহাই দেবার ফলেই এ বিজয় সম্ভব হয়।

কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম এক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে মুসলিম জাতির এ বিজয়ের ফলেই ভারত বিভক্ত হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। সেই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাই ছিলো পূর্ব-পাকিস্তান। আর সেই পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনে স্বাভাবিক কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের আদর্শে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে যেভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন সে ধরনের সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করার জন্যই ঐ কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশনে কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্বকে শামিল করার দাবি সরকার অগ্রাহ্য করে।

www.bjilibrary.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) রাজনৈতিক চিত্র ১৯৫৫-৫৮

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট বিলুপ্ত হবার ফলে আইনসভায় 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' ৭২ জন অমুসলিম সদস্যের হাতে চলে গেলো। হিন্দু দলগুলো আওয়ামী মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেয় যে, দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে অসম্প্রদায়িক দল হলে তাদের সমর্থন পেতে পারে। আরো শর্তারোপ করে যে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সমর্থন করতে হবে। অথচ তাদের সৃষ্টি তথা শক্তির উৎস কিন্তু ইতিপূর্বে প্রচলিত পৃথক নির্বাচন। ক্ষমতার নেশায় বিভোর আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকায় সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে হিন্দুদের উক্ত দু'টি দাবি মেনে নেয়। ১৯৪৫, ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালে যুক্ত নির্বাচনের সুফল প্রাপ্ত দলীয় প্রধান শহীদ সোহরাওয়ার্দী কথিত অসাম্প্রদায়িকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এদেশে কোন কোন মহলে 'ইসলাম ও মুসলমানদের আপোষহীন খাদেম' বলে অভিহিত মওলানা ভাসানীর চাপে এ পরিবর্তনে সম্মত হন। ২২ অক্টোবর (১৯৫৫) ভোর রাত প্রায় ৪ টার দিকে দ্বিধাগ্রস্ত সোহরাওয়ার্দী তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করেন। আওয়ামী লীগে তৎক্ষণিকভাবে না গিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট আব্দুস সালাম খান আইনসভায় ২০ জন সদস্য নিয়ে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধীতা করে যুক্তফ্রন্টেই থেকে যান এবং পরবর্তীকালে রংপুরের কৃতিসন্তান আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী সভায় যোগ দেন।

এরপরেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বড় ধরনের মতবিরোধ চলছিলো। সরকার যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্ট বাস্তবায়ন করছেনা কিংবা মেনে চলছে না বলে ফ্রন্টের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা মওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী মাঝে মাঝে বিবৃতি দিতে থাকলেন। গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা করলেন। পার্লামেন্টে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের মাত্র ১২ জন সদস্য ছিল। ইস্কান্দার মির্জার তৈরি রিপাবলিকান পার্টি, কংগ্রেস ও

www.bjilibrary.com

তফসিলী হিন্দুদের এক কোয়ালিশন গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৫৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে আইন রচনা করার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতার মসনদে বসানো হয়।

১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়, তাতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ না হবার অজুহাতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগ সদস্যগণ প্রথম দিকে স্বাক্ষর দেননি। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী হবার প্রয়োজনে সোহরাওয়ার্দী দস্তখত করতে বাধ্য হন। শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রনেতা শের-ই-বাংলা এ, কে ফজলুল হক ঐ সময় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মওলানা ভাসানীর মতপার্থক্যের প্রধান বিষয়ই ছিল পররাষ্ট্রনীতি ও স্বায়ত্বশাসন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আমেরিকা ঘেঁষা ও রুশবিরোধী, ভাসানী ছিলেন আমেরিকা বিরোধী ও রুশপন্থী ঠিক বিপরীত।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি এই মতবিরোধ মীমাংসার জন্য টাঙ্গাইলের সন্তোষে মহারাজার নাট মন্দিরে কাগমারী সম্মেলন নামে কথিত কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী কৌশলে মওলানা ভাসানীকে পরাজিত করেন। স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক জনসভায় তৎকালীন পাক প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও চাতুর্যের সাথে ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।

১৯৫৫ সালের ১৭ই জুন, শুক্রবার অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে দলীয় জনসভায় আওয়ামী মুসলিমলীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণে পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাবধানবানী উচ্চারণ করে বলেন, শাসন-শোষণের মনোবৃত্তি ত্যাগ করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দিলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলে পৃথক হয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক আমীর হিসাবে মাওলানা আব্দুর রহীম

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর একটানা পূর্ব পাকিস্তানের আমীর ছিলেন। তিনি ইসলামী রিসার্চ একাডেমী পূর্ব পাকিস্তান শাখারও প্রধান ছিলেন। তিনি একটা বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন যে, তাফহিমুল কুরআনসহ জামায়াতের উর্দু সাহিত্য সমূহ অনুবাদ করা সংগঠনের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সংগঠন মজবুত করার জন্য অতীব জরুরি। আর অনুবাদ কাজটি যেহেতু তাকেই করতে হবে সেহেতু সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দু'টো প্রধান দায়িত্ব সেক্রেটারিকেই পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে তৎকালীন দক্ষ সংগঠক ও পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সেক্রেটারি আব্দুল খালেক সহ অনেকে রাজনীতির ব্যাপারে ছাড় দিলেও গঠনতন্ত্র মোতাবেক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন আমীরের অপরিহার্য দায়িত্ব বলে মাওলানাকে সম্মত করানোর বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযমকেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয় দায়িত্ব পালন করতে হতো।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আব্দুর রহীম প্রাদেশিক আমীর থাকার পাশাপাশি লেখালেখি এবং অনুবাদের কাজ অব্যাহত রাখেন।

১৯৭০ সালের মধ্যে আধুনিক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফহিমুল কুরআন শিরোনামে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর বিশাল তাফসীরসহ প্রায় দু'ডজন পুস্তকের বঙ্গানুবাদ এবং প্রায় সমসংখক মৌলিক গ্রন্থ এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রণয়ন করার সুযোগ পান। বস্তুত: মাওলানা আব্দুর রহীম বিপুল ইসলামী সাহিত্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসামান্য মনীষা ও পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা প্রজন্মের জন্য রীতিমত বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয়।

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযম

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম যে সময়টা (১৯৫৬-৬৯) পূর্ব পাকিস্তানের আমীর ছিলেন, যে সময় অধ্যাপক গোলাম আযম প্রাদেশিক সেক্রেটারি (কাইয়েম) হিসেবে সুনাম ও দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

বিভাগীয় আমীরদের থেকে মাসিক রিপোর্ট ও বাইতুলমাল সংগ্রহ করা, নিয়মিত রিপোর্ট পর্যালোচনা পূর্বক দিক নির্দেশনা দান করা বছরের শুরুতে জেলা আমীরদের কাছে বার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় প্রকাশনী পৌঁছানো, পরিকল্পিতভাবে জেলাগুলোতে সাংগঠনিক সফর করা, প্রাদেশিক বৈঠকের এজেন্ডা তৈরি করা কোথাও সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের চেষ্টা করা, বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে বক্তব্য-বিবৃতি প্রণয়ন করা, প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠানো, অফিস তদারকি ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সেক্রেটারি আঞ্জাম দিতেন। যে সব স্থানে আমীরের স্বাক্ষর ও তাঁর মতামত প্রয়োজন তা তাঁর কাছ থেকে নেয়া হতো। অবশ্য গঠনতন্ত্র মোতাবিক যখন যে বিষয়ে প্রাদেশিক আমীরের নির্দেশ প্রয়োজন হতো, সে বিষয়ে আমীরকে অবহিত করে তাঁর মন্তব্য তথা অনুমোদন নিয়ে কর্ম সম্পাদন করতেন।

উল্লেখিত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের পাশপাশি তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ইস্যু যেমন ১৯৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্র, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, মুসলিম পারিবারিক আইনে সরকারের শরীয়ত বিগর্হিত হস্তক্ষেপ ও অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করতেন। ঐ সময়ে আর্থিক সাশ্রয়দানের লক্ষ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব প্রায়ই বাইসাইকেল যোগে প্রাদেশিক কার্যালয়ে এমনকি ঢাকা শহর অফিসে যাতায়াত করতেন।

www.bjilibrary.com

মওলানা ভাসানীর নতুন দল ন্যাপ গঠন

পররাষ্ট্র ও স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে মতানৈক্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিখণ্ডিত করে কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে পরাজিত মওলানা ভাসানী নতুন রাজনৈতিক প্লাটফরম গঠনে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকার সদরঘাটস্থ 'রূপমহল' সিনেমা হলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লালকোর্তা নেতা ও সীমান্ত গান্ধী বলে পরিচিত খান আব্দুল গফফার খান, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতেখার উদ্দীন আহমদ, সিন্ধু জাতীয়তাবাদী ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান জি, এম সৈয়দ, বেলুচিস্তানের সংগ্রামী জননেতা খান আব্দুস সামাদ আচাক জাই, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী ও আরো অনেক বরেণ্য নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

এ সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল আওয়ামী লীগের একটি অংশ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) নামে নতুন একটি বামপন্থী পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এ সময় থেকেই মাওলানা ভাসানী বামপন্থী রাজনৈতিক মহলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

মাছিগেটে রুকন সম্মেলন ও মতপার্থক্য নিরসন

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাব প্রদেশের ভাওয়ালপুর বিভাগের রহিম ইয়ার খানে মাছিগেট নামক স্থানে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের চতুর্থ রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ৯৩৫ জন রুকনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অংশ নেন মাত্র ১৪ জন। সফর ব্যয়বহুল হবার দরুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এত কম সংখক রুকন হাজির হন। মাছিগেটে রুকন সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্দুল খালেক, আব্বাস আলী খান ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

www.bjilibrary.com

উক্ত রুকন সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতের অংশগ্রহণ প্রশ্নে রুকনদের মতপার্থক্য নিরসনকল্পে ৬ (ছয়) ঘন্টাব্যাপী যে ঐতিহাসিক ভাষণদান করেন উহাই বাংলায় "জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত কর্মসূচি" নামে পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছে। উক্ত ভাষণের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনায় দেখা গেল যে, বেশ কয়েকজন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। অধিকাংশ সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মতামত দিলেও মাওলানা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া নিরাপদ তথা সঠিক মনে করতেন না। ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে মাওলানা মওদূদীর পরোক্ষ ভূমিকায় পাকিস্তান গণপরিষদে 'আদর্শ প্রস্তাব' পাশ হবার পরে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শর্ত পূরণ করলে বহু ত্যাগ কুরবানির মাধ্যমে অর্জিত নতুন রাষ্ট্রটির জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবি জানানো ও ইসলামী সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো জামায়াতের কর্তব্য বলে ১৯৫১ সালের নভেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সম্মেলনেই জামায়াতে ইসলামীর স্থায়ী ৪ দফা কর্মসূচি পাস হয়। যার চতুর্থ দফা হলো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েম করা। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা কর্মসূচি নিম্নরূপ ছিলো :

১। দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে চিন্তার বিশুদ্ধিকরণের কাজ।
২। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।
৩। সমাজ সংস্কার ও জনসেবামূলক কাজ।
৪। ইসলাহে হুকুমত: সরকার সংশোধনের কাজ।

নির্বাচনী ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য ভিন্নমত পোষণ করাকে আমীরে জামায়াত বিরাট সমস্যা মনে করলেন। যেহেতু শূরা সদস্যগণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেহেতু বিষয়টি মীমাংসা জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ ফোরামে হওয়া জরুরি মনে

www.bjilibrary.com

করলেন। রুকন সম্মেলন হলো সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী সংস্থা। রুকন সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এর বিরুদ্ধে কোন ভিন্নমত কারো থাকলেও তা প্রচারের অনুমতি নেই।

জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুভব করেই মাওলানা এ সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে নির্বাচনী ময়দানে জামায়াতের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন বিতর্কের সুযোগ না থাকে। মজলিসে শূরা বাতিল ঘোষণা করেন। যাতে রুকন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পর নতুনভাবে মজলিসে শূরার নির্বাচন হতে পারে। তিনি করাচী শহর আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ করেন। কারণ যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য রাখা হবে তখন পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ রুকন হিসাবে বক্তব্য রাখতে চান। মাওলানা মওদূদীর অনুসৃত এই পদক্ষেপ থেকে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় আছে।

সম্মেলনের সভাপতির ঘোষণাক্রমে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে ডাঃ আসরার আহমদ নামক করাচীর একজন বিশিষ্ট রুকন ও সাবেক ছাত্র নেতা এবং নির্বাচনের স্বপক্ষে মাওলানা মওদূদী উভয়ে দু'দিনে ৬ (ছয়) ঘন্টা করে মোট ১২ ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় দিনে সভাপতি হাত তুলে মতামত জানতে চাইলে মাত্র ১৮ জন নির্বাচনের বিপক্ষে রায় দিলেন। উপস্থিত ৯৩৫ জন রুকনের মধ্যে ৯১৭ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে রায় দেয়ায় এটাই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হলো। সবাই রায় শুনে শুধু আলহামদুলিল্লাহ ছাড়া কোন শ্লোগান দেননি। কোন রাজনৈতিক দলে এধরনের নজির সত্যিই প্রশংসনীয়।

মাছিগেটে সম্মেলনের পরে বাংলাদেশে জামায়াতের তৎপরতা

মাছিগেটে রুকন সম্মেলনে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম ও বিভাগীয় আমীরগণ ব্যাপক সাংগঠনিক সফর শুরু করেন। জেলা ও মহকুমা শহরে কর্মসূচির মাধ্যমে জামায়াতের দাওয়াত জনগণের মধ্যে

www.bjilibrary.com

সম্প্রসারিত করা এবং সূধী সমাবেশ এর মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজকে সংগঠনভুক্ত করাই এইসব সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংগঠনের বিস্তার লাভ ও অগ্রগতিতে দায়িত্বশীলদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেলো এবং সফরসহ সার্বিক প্রস্তুতি অব্যাহতভাবে চালানো হলো।

কিন্তু অপ্রত্যাশীতভাবে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১২ টায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল সারাদেশে সামরিক আইন জারি করায় রাজনৈতিক দল ও সভা সমাবেশ বেআইনি তথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

৩ দফা কর্মসূচি যেভাবে চালু

সামরিক শাসন কায়েমের তিন মাস পরে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাদেশিক সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের চার বিভাগীয় আমীরকে নিয়ে ঢাকায় এক পরামর্শ বৈঠকে বসেন। পর্যালোচনায় তাঁরা একমত হন যে, সামরিক সরকার ক্ষমতার সাথে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেই অভিযান চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী সরাসরি সরকারি টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। জামায়াত রাজনৈতিক দল হিসাবে অন্যান্য দলের ন্যায় বে-আইনি বটে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড বহির্ভূত ইসলামী কাজ হিসাবে তাঁরা নিম্নোক্ত কর্মসূচিতে একমত হলেন :

১। মসজিদে জুমআ'র পূর্বে ইসলামকে পূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা। যারা যথাযথভাবে বক্তব্য রাখার যোগ্য তারা সবাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। দশ দিনের আলোচ্য বিষয় ঠিক করে এক মসজিদে আলোচনা শেষ হলে আরেক মসজিদে কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা চলবে।

২। যে সব স্থানে জামায়াত কর্মীদের নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক হতো, সেখানে দরসে কুরআন চালু করা হলো।

৩। কয়েক মাস পরে ঢাকায় জেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে সপ্তাহব্যাপী তরবিয়াতি প্রোগ্রাম করা (তখন জেলা ছিল ১৭টি, বিভাগ ছিল ৪টি)।

উক্ত তিনদফা কর্মসূচি চালু করার কিছুদিন পরে পরিস্থিতির অগ্রগতি বিবেচনায় কর্মসূচি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয় এবং এসব করার পূর্বে

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সম্যক অবগতি ও যথারীতি অনুমোদন নিয়ে নেয়া হয়।

সামরিক শাসনে রাজনৈতিক দল অবৈধ ঘোষণা করায় জামায়াতে ইসলামীর নামে কোন কাজই করার উপায় ছিল না। এ পরিস্থিতিতে তিন দফা কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বীনের যথাসাধ্য খেদমত করা এবং জামায়াতের জনশক্তিকে সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার কাজ ঢাকায় শুরু হয়ে গেল। এ নতুন ও পরিবর্তীত কর্মসূচির খবর সে সময়ে দেশের সর্বত্র পৌছানো সম্ভব ছিল না। গোটা কর্মসূচি কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক হওয়া স্বত্ত্বে লিখিত আকারে জানানো নিরাপদ মনে করা হয়নি। বিভাগীয় আমীরগণ নিজ নিজ বিভাগীয় শহরে কাজ শুরু করলেন এবং বিশ্বস্ত লোক মারফত জেলার দায়িত্বশীলদেরকে জানালেন। জেলা থেকে মহকুমা ও থানায় পৌছে দেয়া হলো। এভাবে সর্বত্র কর্মসূচি পৌছাতে প্রায় তিন মাস লেগে যায়।

ঢাকায় তিনদফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

ঢাকায় যারা জুমআ'র নামাযের পূর্বে মসজিদে ধারাবাহিক বক্তব্য রাখার যোগ্য, তাদেরকে নিজের পছন্দ মতো মসজিদ বাছাই করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ইমামের সম্মতি সব জায়গায় পাওয়া গেল না। মতিঝিল পীরজঙ্গী মসজিদে অনেক সরকারি কর্মচারী উপস্থিত হতেন। মুসল্লীদের অধিকাংশই শিক্ষিত। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব ঐ মসজিদে সাপ্তাহিক দরসে কুরআন পেশ করতেন সালাতুল মাগরিব ও এশার মাঝখানে। আজিমপুর কলোনীর ছাপড়া মসজিদেও তিনি প্রতি সপ্তাহে দরসে কুরআন পেশ করার ফলে এখানে অনেক সুধীসমর্থক বেড়ে যায়। এ সময়কার আলোচক ও দরস দাতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম। উল্লেখ্য, তখন কারো কারো বাড়িতেও জমায়েত করে দারসে কুরআন ও দারসে হাদীসের ব্যবস্থা করা হতো।

www.bjilibrary.com

১৯৬২ সালে যখন সামরিক শাসন তুলে নেয়া হলো, তখন দরসে শরীকদের অনেকেই জামায়াতের কর্মী হন। এদের মধ্যে কয়েকজন রুকনও হয়ে যান। এভাবেই ঢাকা শহরে যে সব মসজিদে বক্তব্য রাখা ও দরসে কুরআন চালু হয়, সেখানকার মুসল্লীদের মধ্য থেকেই জামায়াতের কর্মী সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। সামরিক শাসন আমলের এ কর্মসূচি ইসলামী আন্দোলনের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়। জামায়াতের দায়িত্বশীলদের অনেকেরই এভাবে ইকামতে দ্বীনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ হয়।

পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রিসভার বার বার নাটকীয় পরিবর্তন

১৯৫৮ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত আতাউর রহমান খান ও আবু হোসেন সরকারের মধ্যে কয়েকবার প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটির রদবদল হয়, যা ছিল রাজনৈতিক ময়দানে অত্যন্ত হাস্যকর।

৩০ মার্চ গভর্নর শেরে বাংলা এ যুক্তি দেখিয়ে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে পদচ্যুত করেন যে, আইনসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা নেই। গভর্নর তাঁর দলের নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান।

ঐ দিকে কেন্দ্রে বিরোধী দলীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন শেরে বাংলাকে পদচ্যুত করে চীফ সেক্রেটারিকে ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিয়োগ করেন। ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ১ এপ্রিল আবু হোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করেন।

০১ এপ্রিলই আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮ জুন ন্যাপ সদস্যগণ সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকারের পতন হয়। আবার আবু হোসেন সরকার প্রধানমন্ত্রী হন। ২২ জুন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে এ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ন্যাপ-এর ২৯ জন সদস্যের হাতে ব্যালেন্স অব পাওয়ার ছিলো এবং তাদের খামখেয়ালিতেই বারবার সরকারের পতন হয়। গভর্নর সুলতানুদ্দীন খান কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান যে, পূর্ব-পাকিস্তানে কোন স্থিতিশীল সরকার কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ২৫ জুন কেন্দ্রীয় শাসন চালু হয়।

www.bjilibrary.com

২২ জুলাই আবার আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হন। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূন ও বিরোধী দলীয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক চুক্তিতে ১৯৫৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনকালে এক প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসন থাকা উচিত নয় বলে আতাউর রহমান খানকে নির্বাচন পর্যন্ত সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যা

১৯৫৮ সালে প্রাদেশিক আইনসভায় স্পিকার ছিলেন আবদুল হাকীম। আওয়ামী লীগ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করলে স্পিকার তা নাকচ করে দেন। আওয়ামী লীগ সরকার স্পিকারের সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানালে গভর্নরের নির্দেশে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন।

২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন শুরু হয়। শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ তুলে আইনসভায় বিরোধী দল তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বিরোধী সদস্যগণ ২৩ সেপ্টেম্বর পেপার ওয়েট, মাইকের স্পিকার, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া ও হাতল শাহেদ আলীর উপর নিক্ষেপ করতে থাকে। স্পিকারের মঞ্চে আরোহনের পরেও আক্রমণ অব্যাহত থাকলো। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২৬ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানার দ্বিতীয় সফর ও পৃথক নির্বাচন আন্দোলন (১৯৫৮)

মাওলানা মওদূদী দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন ১৯৫৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মতান্তরে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। এবারের সফরে তিনি সারা প্রদেশে টানা ৪৫ দিন সফর করেন। এ সফরে জনসভা ও সুধী সমাবেশের মাধ্যমে তিনি পৃথক নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামী ধারা কিছুটা সংযোজিত হলেও পৃথক নির্বাচনের প্রথার মতো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়। দেশে যুক্ত নির্বাচন না পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হবে এ

www.bjilibrary.com

প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঢাকা হয়। ইসলামী শাসনতন্ত্রের কট্টর বিরোধী আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পৃথক নির্বাচনের দাবিতে সারা দেশে এই সময়ে আন্দোলন চলছিল। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এবং আওয়ামী মন্ত্রী সভার অধীনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দেয়। তাই এ বিষয়ে জাতীয় পরিষদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এহেন এক অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে প্রোগ্রাম অংশগ্রহণ করেন। পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেন। পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ও যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে সারাদেশে এক বলিষ্ঠ জনমত গড়ে ওঠে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা শেষ রাতের এক তন্দ্রাচ্ছন্ন পরিবেশে জাতীয় সংসদে যুক্ত নির্বাচন পাশ করে নেয়।

মার্চ মাসের শেষার্ধে (১৯৫৮) মাওলানা মওদূদীর উপস্থিতিতে ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলন ও গণশিক্ষা শিবির হয়। সম্মেলনের শেষ দিনে জামায়াত কর্মী ও সমর্থকদের প্রায় এক মাইল ব্যাপী এক মিছিল বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে পল্টন ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে শেষ হয়।

জামায়াতে ইসলামী কখনো প্রচলিত অর্থে নিছক রাজনৈতিক দল ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েমের আন্দোলনই জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। ফলে দেশের রাজনৈতিক উত্থানপতন, রাজনীতির সুনীতি দুর্নীতি তথা নীতি নৈতিকতা থেকে আলাদা হয়ে থাকা জামায়াতের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, সমীচীনও হত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যখন এদেশে জামায়াতে ইসলামী প্রসার লাভ শুরু করে, তখন থেকেই এমনসব রাজনৈতিক ইস্যু দেশকে দোলা দিতে থাকে, যে জামায়াত তার বুনিয়াদী ইসলামী দাওয়াত ও স্থায়ী কর্মসূচিকে জনগণের সামনে পেশ করার জন্য কোন শান্ত সুস্থ পরিবেশই পায়নি। রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের বক্তব্যকে খুব বড় করে দেখা হয়েছে এবং

www.bjilibrary.com

জামায়াতের মূল দাওয়াতকে নিরপেক্ষ ও উদারমনে বিবেচনার সুযোগ খুব কমই হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী যতবারই এদেশে সফর করেছেন, ততবারই কোন না কোন রাজনৈতিক ইস্যু গোটা পরিবেশকে অশান্ত করায় এবং চলমান জাতীয় বিষয় খোলাখুলিভাবে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করায় একটা বিশেষ মহলের কাছে তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছেন। অথচ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক হিসেবে তিনি ছিলেন সকল দেশে অনেক শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্র।

ক্ষমতার পালাবদল ও মার্শাল 'ল (১৯৫৮)

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে গভর্নর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বরখাস্ত করার ভয় দেখালে তিনি ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনকে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পল্টনের জনসভায় তা প্রকাশ্যে সমর্থন দান করেন। সেই গোলাম মোহাম্মাদের উত্তরাধিকারী ইসকান্দার মীর্জার নিকট অনুরূপ আচরণই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে পেতে হলো। এটাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু দুঃখজনক যে ইতিহাস থেকে অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে না।

সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পরে মুসলিমলীগ নেতা আই আই চুন্দ্রিগড় প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ১৯৫৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর যুক্ত নির্বাচন আইন বাতিলপূর্বক পৃথক নির্বাচন আইন চালুর চেষ্টা করেন। কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করেন। অতঃপর রিপাবলিক্যান পার্টির নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন পাকিস্তানের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হন।

যাদের ষড়যন্ত্রের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পাকিস্তানে গড়ে উঠতে পারেনি, তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন ছিলেন সেনা প্রধান জেনারেল আইউব খান, অপর দু'জন হলেন মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা ও গোলাম মুহাম্মদ। ১৯৫৫ সালে গোলাম মুহাম্মদের আকস্মিক মৃত্যু হলে সেনা প্রধানের আর্শীবাদে ইসকান্দার মীর্জা গভর্নর জেনারেল হন।

www.bjilibrary.com

১৯৫৮ সালের ০৭ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা করাচীতে তাঁর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভাকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। এরপর এক ঘোষণায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল, রাজনৈতিক দল বিলুপ্তি, বহু কাষ্টার্জিত সংবিধান বাতিল কিংবা রহিতপূর্বক গণতন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারার ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় এক যুগ পরে গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের মুখ দেখার প্রত্যাশা থেকে দেশবাসী বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে মার্কিন ভক্ত সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ভেঙ্গে যায়।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ : ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার শাহেদ আলীকে হত্যা, তৎপূর্বে ৯ই সেপ্টেম্বর আততায়ীর গুলিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা খান সাহেবের মৃত্যুবরণ, প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে মন্ত্রিত্ব লাভের সীমাহীন নির্লজ্জতা, মন্ত্রী মন্ডলী, পরিষদ সদস্য ও দলীয় কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতি, মুসলিমলীগ কর্তৃক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গোটা দেশে অরাজকতা কায়েম করলে গভর্নর জেনারেল ৭ অক্টোবর জননিরাপত্তার স্বার্থে ও আইন শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে সামরিক আইন জারি করেন। ২৭ অক্টোবর (১৯৫৮) প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে সপ্তাহের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনী গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার তুলে নেয়। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার অল্পদিন পরই কালাবাগের নওয়াব আমীর মোহাম্মদ খান পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর এবং গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ইনসপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ জাকির হোসেন গর্ভনরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

www.bjilibrary.com

সপ্তম অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সিরাত সম্মেলন

১৯৫৯ সালের নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ক্যাম্পাসে তিনদিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য সিরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাজী বশির উদ্দীন আহমদ নামক একজন ব্যবসায়ী এ সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

তিনদিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) সম্মেলনের প্রথমদিন সভাপতিত্ব করেন মুসলিম বাংলা সাংবাদিকতার জনক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, দ্বিতীয় দিন জ্ঞান তাপস অভিধায় পরিচিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেষ দিন ঢাকার জনপ্রিয় মোফাচ্ছের-ই-কুরআন মাওলানা দীন মুহাম্মদ খান। বাইরের অতিথি বক্তা ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের সাবেক মেয়র, ভারতীয় মজলুম মুসলমানদের আপোষহীন জননেতা 'কর্ডোবার বুলবুল খ্যাত' প্রখ্যাত বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা, লাহোরের প্রখ্যাত সিরাত লেখক বিশিষ্ট উর্দূকবি নঈম সিদ্দিকী ও করাচীর জনপ্রিয় ওয়ায়েজ মাওলানা মতিন হাশেমী।

পূর্ব পাকিস্তানী বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক গোলাম আযম, ব্যারিস্টার মোস্তফা কামাল, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন আহমদ, প্রফেসর হাসানুজ্জামান, মাওলানা সাইয়্যেদ মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা মহিউদ্দীন খান প্রমুখ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জননন্দিত গভর্নর লে. জেনারেল আজম খান অতিথি হিসাবে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত না হয়েও হঠাৎ করে হাজির হয়ে সবাইকে হতবাক করে দেন। আরো বিস্ময়কর যে তাঁকে মঞ্চে আসন গ্রহণের অনুরোধ করা হলেও তিনি সাধারণ শ্রোতাদের সাথেই বসে রইলেন।

এ সিরাত সম্মেলন ঐ সময়ে ঢাকা শহরে বেশ সাঁড়া জাগাতে সক্ষম হয়। সম্মেলনের পোস্টার সারা শহরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ সময়ে

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় সভা সমিতি ছিল না বললেই চলে। সম্মেলনে চেয়ার খালি না থাকায় আগ্রহী শ্রোতাদেরকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে দেখা গেছে। কবি তালীম হোসেন কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াতের পরে সিরাতুন্নবী (সা.) সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে। বক্তাদের উচ্চমানের বক্তব্য সবাইকে রাসূলের (সা.) আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে।

এ সম্মেলনের সফলতায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব ঢাকার বাইরে তৎকালীন বৃহৎ জেলা শহরগুলোতে মোট ১৭ দিনব্যাপী সেমিনারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে হিসাবে ঢাকা শহরের পরে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, গাইবান্ধা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, মাদারীপুর এবং আরো কতক জেলা ও মহকুমা শহরে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সিরাত সেমিনার কিংবা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মতিঝিলে দশদিনব্যাপী তারবিয়তী ক্যাম্প

১৯৬০ সালের প্রথমদিকে রমাদান মাসে ঢাকায় ১০ দিনব্যাপী এক তারবিয়তী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। মতিঝিলে এখন যেখানে বিরাট ওয়াপদা ভবন রয়েছে, তখন এখানে খালী ময়দান ছিলো। ময়দানের পূর্ব দিকে টিনের ছাউনীর মসজিদ ছিল, যার ইমাম ছিলেন একজন যুবক এবং জামায়াত সমর্থক। তাই সেখানে ক্যাম্প করার সুযোগ হয়েছিলো।
তারবিয়াতী ক্যাম্পের কর্মসূচিঃ

১। সকাল ০৯টা থেকে ১২:৩০ ঘঃ পর্যন্ত দারসে কুরআন, নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা, গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা ও ডেলিগেটদের অনুসীলনী দারস।
২। বিকেল ০২টা থেকে সালাতুল আসর পর্যন্ত সুধী সমাবেশ।
৩। তারাবিহ নামাযান্তে আধা ঘন্টা দরসে হাদীস।
৪। সেহরির পরে ফজর পর্যন্ত আসহাবে রাসূলের জীবন থেকে শিক্ষামূলক কাহিনী ও ঘটনা আলোচনা।
৫। সাধারণ প্রশ্নোত্তর ও দুআ' ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

তারবিয়তী শিবিরের আলোচক ও আলোচ্য বিষয়

মতিঝিলের তারবিয়তী শিবিরে ফরিদপুরের জেলা আমীর ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল আলী'ই প্রধানত দারসে কুরআন পেশ করতেন। সবাই তৃপ্তির সাথে তাঁর দারস শুনতেন। মাওলানা আব্দুর রহীম ও মাওলানা আবুল কাসেম সিফাতুল্লাহ একদিন করে দারসে কুরআন দিয়েছেন। দারসে হাদীস পেশ করেছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা একিউএম সিফাতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল আলী, মাওলানা নূরুল ইসলাম ও মাওলানা ইখলাসুল মুমিনীন সিলেটী।

মাওলানা আবদুর রহীম ও জনাব আব্দুল খালেক দু'দিন দুটো বিষয়ে আলোচনা করেন। কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব ও পদ্ধতি, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হতো। সুধী সমাবেশে ১০ দিনের মধ্যে ০৫ দিন অধ্যাপক গোলাম আযম ও অবশিষ্ট দিনে অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ আলোচনা করেন।

জেলা ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

জনাব আব্বাস আলী খান ও মাষ্টার মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যারা তারবিয়তী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন তাদের জেলাওয়ারি তালিকা নিম্নরূপ-

১) মাওলানা আবদুস সুবহান (পাবনা),
২) মাওলানা মুহাম্মদ তমিজ উদ্দীন (দিনাজপুর)
৩) মাওলানা আবদুল আলী (ফরিদপুর)
৪) ডাঃ শামসুল আলম (কুমিল্লা)
৫) মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির (বগুড়া)
৬) মাওলানা আব্দুল গফুর (গাইবান্ধা)
৭) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (সুনামগঞ্জ)
৮) হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান (সিলেট)
৯) জনাব মুহাম্মদ শাসুল হক (সিলেট)
১০) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার (ফেনী)
১১) মাওলানা মীম ফজলুর রহমান (রাজশাহী)

www.bjilibrary.com

১২) মাওলানা মুফতী আব্দুস সাত্তার (খুলনা)
১৩) অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন (বরিশাল)
১৪) মাওলানা সাইয়্যেদ হাফিজুর রহমান (ঢাকা)
১৫) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম (তৎকালীন ছাত্র নেতা)
১৬) মোঃ আব্দুর রশীদ। জানা যায় প্রায় ৭০ থেকে ৭২ জন উক্ত শিক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতের তারবিয়াতী কার্যক্রম

জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচির দ্বিতীয় দফা হলো তানযীম ও তারবিয়ত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)। জামায়াত দ্বীন কায়েমের সংগঠন, তার জনশক্তিকে সুসংগঠিত করে সুপরিকল্পিতভাবে উপযুক্ত তারবিয়ত (Training) দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য করে গড়ে তুলছে। সহিহ করে কুরআন তেলাওয়াত থেকে শুরু করে সামষ্টিক পাঠ, পাঠচক্র, শিক্ষা বৈঠক, শিক্ষা শিবির ইত্যাদি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি প্রায় সারা বছরই চালু থাকে।

ছাত্র জীবনে যারা ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছেন, তারা এখান থেকেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে উপকৃত হয়ে থাকেন। জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এসব কর্মসূচিতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পর্যালোচনা থেকে জ্ঞানার্জন ব্যতীত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের সংকল্প দৃঢ় হয়। একত্রে ২৪ ঘণ্টা থেকে শুরু করে ৭২ ঘণ্টা যত বেশি সময় থাকা হয় সাধারণত ততবেশি পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়। ইকামতে দ্বীনের জন্য জানমাল আল্লাহর পথে কুরবানি করার মানসিকতা তৈরি হয়।

www.bjilibrary.com

সামরিক শাসনের মাঝে সিরাত মাহফিল ও সেমিনার

১৯৬০ সালের প্রথমদিকে চার বিভাগীয় আমীর ও ঢাকা শহরের দায়িত্বশীলদের এক বিশেষ বৈঠক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দেশে সামরিক শাসন সত্ত্বেও ইসলামকে পূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে সুধী মহলে ও জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। ইতিপূর্বে সাতক্ষিরা এলাকায় সুধী সমাবেশ ও কার্জন হল ক্যাম্পাসে সিরাতুন্নবী (সা.) সম্মেলন জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পরিবেশ অনুকূল বলেই ধারণা হয়।

উক্ত পরামর্শ বৈঠকে সকলে একমত হন যে, সরাসরি, রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ না থাকলেও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সুধী সমাবেশ সিরাত মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাধারা চর্চা করায় কোন বাঁধার আশঙ্কা নেই। তাই দেশব্যাপী এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জামায়াতে ইসলামী দ্বীন ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে যেভাবে পরিবেশন করে এসেছে, জামায়াতের 'সাইনবোর্ড বিহীন' দ্বীনের ঐ ব্যাপক ধারণা সর্বত্র পরিবেশন করার দায়িত্ব পালনই এ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। জামায়াতের মহান প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর ভাষায় "বহমান স্রোতকে বাধা দিয়ে আটকানো যায় না, সে সব বাধা এড়িয়ে এদিক সেদিক পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে। ইসলামী আন্দোলনকেও অবস্থা এবং পরিবেশ বুঝে চলার পথ নির্মাণ করতে হয়।"

www.bjilibrary.com

ঢাকায় মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত প্রতিষ্ঠা

১৯৬০-৬১ সাল থেকেই ইসলামের উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান ছাড়াও ঢাকা শহরে কিছু স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমকে সভাপতি ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে সেক্রেটারি হিসাবে উক্ত সংস্থার একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি করা হয়। উল্লেখ্য, এই সংস্থার উদ্যোগে ১৯৬২ সালে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

তা'মীরে মিল্লাতের উদ্যোগে ইসলামী সেমিনার

মজলিসে তা'মীরে মিল্লাতের উদ্যোগে ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ও কলেজ ময়দানে ১০ (দশ) দিনব্যাপী এক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের শীতকালে রামাদান মাসের প্রথমার্ধে অত্যন্ত শানশওকতের সাথে এর আঞ্জাম দেয়া হয়। ঢাকা শহরের সর্বত্র বিরাট পোস্টারের মাধ্যমে এর প্রচারনার ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম প্রিয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সেমিনারকে কেন্দ্র করে বেশ সাড়া পড়ে। প্রত্যহই শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামরিক শাসনের গুরু গম্ভীর পরিবেশে এতবড় অনুষ্ঠান সবার মধ্যেই প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান সেখানে পরিবেশন করা হয়েছে যা, শ্রোতাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দান করেছে।

সেমিনারের কর্মসূচি ও সভাপতিদের তালিকা : ১০ দিনব্যাপী সেমিনার প্রতিদিন জোহরের নামাযের পরে শুরু হয়ে মাগরিবের পূর্বে শেষ হতো। দারসে কুরআন কিংবা তরজমাসহ তেলাওয়াতের পরে নির্দিষ্ট আলোচক প্রবন্ধ বা বক্তৃতা আকারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনা শেষ করতেন। সবশেষে অধিবেশনের সভাপতি তাঁর সুচিন্তিত ভাষণ দিতেন। সভাপতিদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

১) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২) মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, অধ্যক্ষ, লালবাগ জামিয়া

www.bjilibrary.com

৩) ড. মুহাম্মদ ইসহাক, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪) এডভোকেট মৌলভী ফরিদ আহম্মদ, নেজামে ইসলাম নেতা
৫) নূর মোহাম্মদ আকন, সিএসপি, সরকারি আমলা (অব.)
৬) মাওলানা আব্দুর রহীম, সভাপতি মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত
৭) অধ্যাপক গোলাম আযম, সেক্রেটারি, মজলিসে তা'মীরে মিল্লাত
৮) মুহাম্মদ আমীরুল হক, অধ্যক্ষ, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল কলেজ
৯) এ আর ফাতেমী, অধ্যক্ষ, কায়েদে আযম কলেজ (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ)
১০) সাইয়্যেদ হাফিজুর রহমান, হেড মাস্টার, রহমাতুল্লাহ মডেল হাইস্কুল, লালবাগ, ঢাকা।

সেমিনারে পেশকৃত দারস, বক্তৃতা ও বক্তা

সেমিনার উত্তরকালে মাওলানা আব্দুর রহীম কর্তৃক চিন্তাধারা শিরোনামে প্রকাশিত সংকলনটিতে লিখিত আকারে ১৩টি ভাষণ, ৪টি দারসে কুরআন ও একটি দারসে হাদীস রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, সেমিনারের ১০ দিনের ১৯টি অধিবেশনে ১৯টি ভাষণ, ৬টি দারসে কুরআন ও ৪টি হাদীস পেশ করা হয়েছিল। দারস সহ বক্তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা আব্দুল আলী, মাওলানা হেলাল উদ্দীন, ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়াজ্জম, মাওলানা একিউএম সিফাতুল্লাহ, আব্বাস আলী খান, আব্দুল খালেক, শাহ আব্দুল হান্নান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী আন্দোলনে সেমিনার অনুষ্ঠানের অবদান

ঢাকায় বিরাট আকারে সেমিনারের সাফল্য প্রাদেশিক জামায়াত নেতৃবর্গকে জেলা ও মহকুমা শহরে ০৩ (তিন) দিনব্যাপী সেমিনার অভিযানে উদ্বুদ্ধ করলো। এর ফলে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে কোন কোন জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে অন্যান্য ইসলামী দল বিশেষতঃ নেজামে ইসলামীর দায়িত্বশীল পর্যায়ের নেতারা জামায়াতে ইসলামীতে শামীল হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সেমিনার অভিযানের মাধ্যমে নেজামে ইসলামী পার্টির কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি মাওলানা মিসবাহুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর প্রতি

www.bjilibrary.com

আকৃষ্ট হন এবং দীর্ঘদিন কুষ্টিয়া জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। বরিশাল কেন্দ্রীয় জামে কশাই মসজিদের স্বনামধন্য খতিব মাওলানা বশিরুল্লাহ আতহারী নেজামে ইসলামীর বৃহত্তর বরিশালে অবিসংবাদিত নেতা হয়েও জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অনেক বড় মাপের সহায়ক শক্তি ছিলেন। খুলনা ও সিলেট শহরে ৫ দিনব্যাপী এবং বরিশালসহ অন্যান্য শহরে ৩ দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরে জামায়াতে ইসলামী ১৯৬২ সালের শেষার্ধে নতুন করে যখন সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে তখন ঐ সব সেমিনারের সুফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। আগে যারা জামায়াতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন তাদেরকেও যথেষ্ট নমনীয় দেখা গেল। সেমিনার আয়োজনে বিভিন্নভাবে যারা শরীক ছিলেন, তারা জামায়াত নেতা কর্মীদের সততা ও ব্যবহারে আকৃষ্ট হন, অনেকের ভুল ধারণা দূরীভূত হয় এবং সংগঠনভুক্ত হয়ে যান।

সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা ইত্যাদি জেলা শহরগুলোতে সেমিনার অনুষ্ঠানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেমিনার সমূহ একদিকে জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারায় অনেক শিক্ষিত লোক প্রভাবিত হয়, অপরদিকে জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ ব্যাপকতর হয়।

www.bjilibrary.com

অষ্টম অধ্যায়

সামরিক শাসন শেষে নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন পার্লামেন্ট

ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান ক্ষমতাকে স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে জনসমর্থন হাসিলের ফন্দিতে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানের জনগণ সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচিত করার যোগ্য নয়। তাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য (বিডি মেম্বার) প্রায় ৭ কোটি লোকের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়, তাদেরকে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

এ অভিনব গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করার জন্য তিনি ১৯৬০ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি উক্ত ৮০ হাজার সদস্যদের ভোটে প্রার্থী বিহীন নির্বাচনের প্রহসন করেন। বিপুল সংখ্যক 'হ্যাঁ বোধক' ভোট তিনি তার পক্ষে আনেন। এরপর তিনি একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে ১৯৬২ সালের পয়লা জানুয়ারি তা জারি করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর দীর্ঘ নয় বছরের সাধনায় প্রণীত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বহাল না করে নিজের ইচ্ছেমতো শাসনতন্ত্র তৈরি করে তা চালু করেন।

নতুন শাসনতন্ত্রে বুনিয়াদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়েছিল। সে মোতাবেক ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের ১৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। অতঃপর ৬ মে ১৯৬২ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুবী শাসনতন্ত্র প্রত্যাখান পূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে নয়জন বাংলাদেশী নেতা বিবৃতি দেন যে জনগণের ভোটে নতুন গণপরিষদ গঠন পূর্বক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। অথচ ১৯৫৬ সালের প্রণীত শাসনতন্ত্র পুনর্বহালের দাবি তোলাই ছিল অধিকতর যুক্তি সংগত। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানী নয় নেতা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর লাহোরস্থ বাড়িতে সাক্ষাৎকার দেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ পরামর্শে একাত্মতা ঘোষণা পূর্বক তাঁরা ১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্রের সংশোধনী তৎকালীন আইয়ুব সরকারের কাছে দাবি করেন।

www.bjilibrary.com

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত

১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত যেহেতু রাজনৈতিক দলসমূহ বে-আইনি ঘোষিত ছিল তাই দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে কিংবা মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। তবে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীলদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেখানে-যেখানে সম্ভব জামায়াতের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আল্লাহর মেহেরবানিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ০৩ (তিন) জন রুকন এবং ০১ (এক) জন অগ্রসর কর্মী নিজ নিজ এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। জয়পুরহাট থেকে জনাব আব্বাস আলী খান, খুলনা থেকে জনাব শামসুর রহমান, বরিশাল-বাগেরহাট থেকে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং বরিশাল-ঝালকাটি থেকে ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীন আহমদ।

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তৎকালীন পাবনা জেলা আমীর মাওলানা আব্দুস সুবহান এবং ফরিদপুর থেকে জেলা আমীর মাওলানা আব্দুল আলী নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে মাওলানা আব্দুস সুবহান দ্বিতীয়বার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বিরোধী দলের সিনিয়র ডেপুটি লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে জামায়াতের নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই তথা মনোনয়ন দানের ব্যাপারটি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো নয়।

জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন

১৯৬২ সালের ১ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং ৮ জুন রাওয়াল পিন্ডিতে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ফরিদপুরের মৌলভী তমিজ উদ্দনী খান 'স্পিকার' এবং খুলনার খান এ সবুর 'লিডার অব দি হাউস' নির্বাচিত হন। অধিবেশন শুরুর আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এম. এন. এ. গণ বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ৭ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হন। চতুর আইউব তাঁর ক্ষমতাকে সংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশীদের এ ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন।

www.bjilibrary.com

খান এ সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আব্দুল মোনায়েম খান, ওয়াহিদুজ্জামান, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ আইউব ক্যাবিনেটে সদস্যের টোপ গেলেন। এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানী এমএনএ,দের ঐক্যভঙ্গপূর্বক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সমালোচনা করে জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বলতেন "পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এমএনএ,দের ঐক্য বহাল থাকলে এ অঞ্চলের ৭ দফা দাবি আদায় করা নিশ্চিত ছিল। সবুর খানসাহেবগণ যদি অন্তত: আর একটা সপ্তাহ সবর করে থাকতেন তাহলে আইউব খান সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন।"

জাতীয় পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর ৫ জন, নেজামে ইসলামীর ৪ জন এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের (মুফতি মাহমুদ) ২ জন মিলে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী পার্লামেন্টারি কমিটি গঠিত হয়। পরে পাকিস্তানের নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মিয়া আব্দুল বারী এর লিডার নির্বাচিত হন এবং জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। উত্তমরূপে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে জামায়াতের এম.এন.এ ও এম.পিদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু আব্বাস আলী খান সাহেবের প্রাণঘাতি একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হলো।

আইয়ুবের কুখ্যাত পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে জামায়াত

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'মুসলিম পারিবারিক আইন' নামাংকিত এক উদ্ভট, ইসলাম ও মানবতা বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন। জাতীয় পরিষদে ইসলামী পার্লামেন্টারি গ্রুপের সেক্রেটারি হিসেবে আব্বাস আলী খান ঈমানী দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে উক্ত কুখ্যাত আইন বাতিলের দাবিতে ১৯৬২ সালে ৪ঠা জুলাই পরিষদে এক বিল পেশ করেন। আগেরদিন বিকাল বেলা আইউব খান জনৈকা মহিলা সদস্যসহ কয়েকজন এম এন এ'র সামনে খান সাহেবকে প্রেসিডেন্ট ভবনে ডেকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে দিলেন যেন পরের দিন পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত বিলটা পেশ না করেন। আমন্ত্রিত আধুনিকা মহিলা সদস্যকেও বেশ উসকিয়ে দেয়া হলো যেন

www.bjilibrary.com

তিনি তাঁর মহিলা বাহিনী প্রস্তুত রাখেন খান সাহেবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্য।

জামায়াত নেতা মর্দে মুজাহিদ আব্বাস আলী খান অকুতোভয়ে শত বাঁধা ও হুমকি উপেক্ষা করে উক্ত বিল পার্লামেন্টে পেশ করলেন। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাস আলী খানকে হত্যার জন্য সরকারের গুণ্ডবাহিনী নানারূপ ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠলো। ৭ জুলাই (১৯৬২) রাত ১১ টায় রাওয়ালপিন্ডির এক সড়কের পাশ দিয়ে হাঁটার সময়ে তাঁকে গাড়ি চাঁপা দেয়া হলো। মৃত্যুর ফয়সালা তো মহান রাব্বুল আলামিনের হাতে, তাই ট্যাক্সি মাড়িয়ে যাবার পরেও তিনি অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে রইলেন। কিন্তু হাত ভেঙ্গে গেলো এবং ডান সাইড থেতলে গেলো। 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' গ্রন্থে এ ঘটনা তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন-

"ডি এ ভি কলেজ রোড আর লিয়াকত রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষায় রয়েছি আমরা চারজন। পাকিস্তান হাউস যাব বলে। অন্যান্য সাথিরা সব নিজ নিজ ডেরায় পৌঁছে গেছেন।

একখানা ট্যাক্সি সাঁ সাঁ করে আসছে দেখলুম। রাত সাড়ে এগারোটা পার হয়েছে। রাস্তা যানবাহনহীন হয়ে পড়েছে। তাই ট্যাক্সি চালক বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছে খুশিমতো। তার বেসামাল চলা দেখে ফুট পাথের উপর উঠে দাঁড়িয়েছি। দাঁড় করাবার জন্যে হাতও উঠানো হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য। গাড়িখানা আমার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাকে তলায় মাড়িয়ে আমার উপর দিয়ে দ্রুত বেগে পার হয়ে গেল। বড়ো বড়ো ঢিল মাড়ায়ে তার উপর যেমন ধারা পার হয়ে যায় চাষির মই।

আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন। লবেজান। অস্ফুট শব্দে দোয়া ইউনুস পড়ছি। আর ভাবছি এই বুঝি দমটা বেরিয়ে গেল। জানটা ধড়ফড় করছে বেরিয়ে যাবার জন্যে। খাঁচার পাখি যেমন ধারা পাখা ঝটপট করে খাঁচার বাইরে উড়ে পালাতে চায় নিঃসীম নীল আকাশে।

সাথিরা দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। আকস্মাৎ দুর্ঘটনায় তাদের বাকশক্তি রহিত হয়েছে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী সায়েব সুধালেন "কেমন লাগছে ভাই ?"

বল্লুম, অতিকষ্টে বেঁচে ত রয়েছি। তবে মনে হয় আর বেশীক্ষণ না। তার পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্লুম।

www.bjilibrary.com

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলুম সেন্ট্রাল হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ড। ডাক্তার মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমার সম্পূর্ণ ডান দিকটার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত। ডান উরুর ডান পাশটা একেবারে ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। চামড়া গোশত ছেঁড়াছেঁড়া হয়তো বা কিয়দংশ ঘটনাস্থলের মাটির উপর এখনো তড়পাচ্ছে। আর রক্তের আলপনা এঁকে দিচ্ছে। জামা কাপড় জীর্ণ রক্তাক্ত। চশমা, কারাকুলি টুটি, নাশপাতির ঝুরি লাপাত্তা। হয়তো গাড়ির তলায় নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত।

পরদিন সকালে নিজকে জীবিত দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলুম। ট্যাক্সি মাড়িয়ে যাওয়ার পর বেঁচে থাকাটা যেমন তেমন কথা নয়।

রাখে আল্লাহ মারে কে-মারে আল্লাহ রাখে কে?- এ মোক্ষম সত্যটির এর চেয়ে বাস্তব রূপ আর কি হতে পারে ?"

এ ঘটনাটি সারা পাকিস্তানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। অনেকেই এ ঘটনাকে সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র বললেন। পরের দিন সংবাদিকরা পত্রিকায় যে হেডিং দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করলেন, তা হলো "এ ঘটনাটির পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে", "পারিবারিক আইন সমর্থক কিছু চরমপন্থী কর্তৃক মওলানাকে হত্যার প্রচেষ্টা" ইত্যাদি। দেশের ইসলাম প্রিয় মানুষেরা জনাব আব্বাস আলী খানের জন্য প্রাণভরে দোয়া করতে থাকলেন।

www.bjilibrary.com

নবম অধ্যায়

১৯৬২ সালের জুন মাসে জামায়াতে ইসলামীর পুনরায় কাজ শুরু

সেনা প্রধান ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সকল রাজনৈতিক দলকেই বেআইনি ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালের ১ জুন সামরিক শাসন প্রত্যাহার পূর্বক তিনিই বেসামরিক শাসন চালু করেন। বেসামরিক সরকার কায়েমের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী রাজনৈতিক দল পুনর্বহালের লক্ষ্যে এক সপ্তাহ আগেই প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেন যে, ১ জুন থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন জেলা থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর হিসেবে মাওলানা মওদূদী ১৯৬২ সালের ১ জুন এক ঐতিহাসিক বিবৃতির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনকে পুনর্বহাল করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন- সামরিক সরকার রাজনৈতিক দল বেআইনি করায় আমরা সংগঠনকে ভেঙ্গে দেইনি। আজ থেকে পুনঃসংগঠন যথা নিয়মে চালু হলো। সংগঠনকে চলন্ত রেলগাড়ির সাথে তুলনা করে মাওলানা বলেন : 'ইসলামী আন্দোলনের গাড়ি ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর চলন্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে থেমে গেলো। গাড়ি লাইনচ্যুত হয়নি। গাড়ির ড্রাইভার ও গার্ড গাড়ি ছেড়ে চলে যায় নি। তাই গাড়ির চলার পথ উন্মুক্ত হবার সাথে সাথেই গার্ড সিগন্যাল দিলে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে দিলেন। এটাই জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট'।

এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো বিগত পৌনে চারবছর (১৯৫৮-৬২) একই অবস্থায় ছিল। জামায়াতের অফিস ছিল না, সাইনবোর্ড তো ছিলই না, কিন্তু সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ নিয়মিতই রাখতেন। ব্যক্তি পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের কারণে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক সংখ্যা বেড়েছে। জামায়াত পুনর্বহাল হবার পর তারা সংগঠনের কর্মী হিসেবে সক্রিয় হয়েছে। ঐ সময়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের দাওয়াত দেয়া মুলতবি ছিল বটে, কিন্তু দ্বীনের দাওয়াত যথারীতি চালু ছিল।

www.bjilibrary.com

ঢাকার নবাবপুরস্থ কার্যালয় যেভাবে হাতছাড়া হলো

ষাটের দশকের শুরুতে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতা পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হবার কিছুদিন পরেই ৩০৫, নবাবপুর রোডে প্রাদেশিক অফিস ভাড়া নেয়া হয়। অবশ্য একটি দ্বিতল ভবনে প্রাদেশিক ও শহর জামায়াতের অফিসে লাইব্রেরি, প্রকাশনার মালামাল মেহমান খানা সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যারা জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হন অধিকাংশ সদস্য (রুকন), কর্মী এমনকি সমর্থকদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় যে তারা নবাবপুরস্থ অফিসের সাথে যোগাযোগ করেই এতটা অগ্রসর হয়েছেন।

১৯৫৮ সালের শেষদিকে সামরিক শাসন জারি হলে উক্ত অফিস সরকার সীল করে দেয়। বছর দু'য়েক পরে গৃহকর্তা তদবির করে তার ঘরের মালিকানা বহাল করতে সক্ষম হন। মালিককে ঘর হস্তান্তর করার সময় জামায়াতের কয়েক হাজার বই, বহু সংখক ফাইল-পত্র ও অনেক আসবাবপত্র সরকার অজ্ঞাতস্থানে সরিয়ে নেয়। প্রায় সপ্তাহব্যাপী জনৈক পুলিশ ইনসপেক্টরের তত্ত্বাবধানে যখন সব মালামালের তালিকা প্রস্তুত হলো, ধারণা করা গিয়েছিল যে, সামরিক আইনের অবসান হলে কুরআন হাদীসসহ জামায়াতের প্রকাশনী ও অন্যান্য মালামাল ফেরত পাওয়া যাবে। কিন্তু তা আর জামায়াতকে দেয়া হয়নি। সামরিক আইন শেষে জামায়াতকে প্রাদেশিক অফিস থেকে শুরু করে যাবতীয় আসবাবপত্র নতুন করে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

নাখাল পাড়ায় নিজস্ব অফিস স্থাপন

১৯৬২ সালের জুনে যখন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়, তখন জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ১৯৬০ সালে নাখালপাড়ায় একটি সেমিপাকা বাড়ি কিনে বসবাস করছিলেন। ঢাকা শহর জামায়াতের রুকন জনাব মাহবুবুর রহমান গুরহা ইতিপূর্বেই সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই মাওলানাকে বাড়ি কেনায় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। তাদের দু'জনের উদ্যোগে ও চেষ্টায় নাখাল পাড়ায় একখণ্ড জমি কিনে

www.bjilibrary.com

সেমিপাকা ঘর তুলে প্রাদেশিক অফিস স্থাপন করা হয়।[৯] নিকটে কোন মসজিদ না থাকায় অফিসের একটি কামরায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। অফিস সেক্রেটারি ছিলেন হোমিও ডাঃ জনাব মাহবুবুর রহমান। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত অফিস জামায়াতের দখলে ছিল।

ঢাকা শহর অফিস

ঢাকার সিদ্দিক বাজারে 'কাওসার হাউস' ছিল ঢাকা শহর জামায়াতের একটি সুসজ্জিত অফিস। ১৯৬৭ সালে এ কাওসার হাউস প্রাঙ্গণে রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। এ সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানে কাজের যতটুকুই অগ্রগতি হয়েছিল তা দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেছিলেন, 'যদি কোন কৃষক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কোন ফসল ফলায়, সে সোনার ফসল দেখে ঐ কৃষক যে তৃপ্তি ও আনন্দ পায় তা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়। আজ পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের সোনালী ফসল দেখে আমি সে আনন্দ উপভোগ করছি।'

জামায়াতের কর্মপরিষদে নিখিল পাকিস্তান লাহোর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

১৯৬২ সালের সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র জামায়াতে ইসলামীর বহু প্রতীক্ষিত সাংগঠনিক তৎপরতা এক যোগে শুরু হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের জুন থেকেই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত ও সংগঠন বিস্তার লাভ করতে থাকে। কেন্দ্রীয় জামায়াত ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়।

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতের আপোষহীন বলিষ্ঠ বক্তব্য, ১৯৬১ সালে জারি করা "ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সের" বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা এবং ১৯৬২ সালে জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান

---

[৯] *অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম।*

www.bjilibrary.com

কর্তৃক পার্লামেন্টে বিল উত্থাপনে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ভীষণ ক্ষেপে যান। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর নওয়াব আমীর মুহাম্মদ খানের হিংস্র ও উসকানীমূলক বিবৃতি এবং জঘন্য পদক্ষেপ জামায়াতের সাংগঠনিক সম্মেলনকে অনিশ্চিত করে তুলে। ঐ সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান থেকে ১০৩ জন যোগ দেন। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম শত হুমকি ষড়যন্ত্র মুকাবিলা করে সম্মেলনকে সফল করে তুলতে যাবতীয় পরামর্শের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক আযমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত বর্ণনা থেকে সম্মেলনের কিছু তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখিত হলো :

"সম্মেলন সফল করার উদ্দেশে আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবার সময় মাওলানার বিস্ময়কর সাহস ও দৃঢ়তা দেখে বাংলাদেশী শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে আল্লাহ তায়ালা এ অনন্য সাধারণ মানুষটিকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার যাবতীয় যোগ্যতাই দান করেছেন। কর্মপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ও নীতিমালার কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় :

১। *সম্মেলনে হামলা হলে হামলাকারীদেরকে নিজেরা মারবেনা পুলিশে সোর্পদ করা হবে। তাদেরকে মারলে সেই অজুহাতে পুলিশ হামলাকারীদের পক্ষ নিবে ও সম্মেলন পন্ড হবে।*

২। *সম্মেলনের শৃঙ্খলার স্বার্থে ডেলিগেটগণ কেউ নিজের সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যাবে না; নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবে।*

৩। *স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ দায়িত্বশীলের নির্দেশ ব্যতীত কিছু করবেন না। কোন ডেলিগেট স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবেন না।"*

নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন

প্রায় দশ বছর পর সারা পাকিস্তান ভিত্তিক এ সম্মেলনটি হতে চলছে। সরকার এ সম্মেলনটি বানচাল করার কোন অপকৌশলই বাকি রাখেননি। এ জন্যে যে প্রশস্ত ময়দানের দরকার ছিল তা না দিয়ে সরকার এক সংকীর্ণ স্থানে অনুমতি দেয়। দূরদূরান্ত থেকে যোগদানেচ্ছু কর্মীদের রিজার্ভ করা রেলওয়ে বগিগুলো রওয়ানা হওয়ার অতি অল্প সময় পূর্বে বাতিল করে দেয়া হয়। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয়। হাজার

www.bjilibrary.com

হাজার লোকের সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষা করা মাইক ছাড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সভা-সমাবেশ করা, মাইক ব্যবহার করা গণতান্ত্রিক অধিকার। অতএব এ ব্যাপারে হাইকোর্টে এক রিট দায়ের করা হলো।

হাইকোর্টের রায় জামায়াতের অনুকূল আসবে মনে করে সরকার সে রায় প্রকাশিত হওয়ার আগেই এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সারা পশ্চিম পাকিস্তানে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় জেলা কর্তৃপক্ষকে মাইক ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়। এ সুযোগে লাহোরের জেলা কর্তৃপক্ষের নিকটে মাইক ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করা হলো। জেলা কর্তৃপক্ষ এই বলে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলো যে, শহরের যে মহল্লায় জামায়াতের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে মহল্লাবাসী এ ধরনের সম্মেলন পছন্দ করেন না। তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যেন মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া না হয়। নতুবা শান্তি ভঙ্গ হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এ কথা মহল্লাবাসীদের বলা হলে তাঁরা হতবাক হন এবং এটা মিথ্যা অভিযোগ বলে মন্তব্য করেন। উপরন্তু মহল্লাবাসী তীব্র প্রতিবাদ করে জানালেন যে, তাদের পক্ষ থেকে মাইক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি জানানো হয়নি। এই প্রতিবাদ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী মহল্লাবাসীদের মধ্যে ইউনিয়ন কমিটির একজন চেয়ারম্যান, দশজন ইউনিয়ন কমিটির সদস্য, একজন এ্যাডভোকেট ও একজন অধ্যাপক ছিলেন। এ সবের পরেও মাইকের অনুমতি পাওয়া গেল না।

২৫ শে অক্টোবর থেকে সম্মেলনের কাজ শুরু হওয়ার কথা। ছয়শত শামিয়ানার বিভিন্ন প্যান্ডেল, একশত গোসলখানা, তিনশত শৌচাগার, টেলিফোন, লাইটিং সিস্টেম প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দু'দিন আগে থেকে লোকজনের আসা শুরু হয়েছে।

২৪ শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক জরুরি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো যে, বিনা মাইকেই সম্মেলনের কাজ চলবে। সম্মেলনের স্থানটি যা কয়েক দিন আগে দুর্গন্ধময় আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিলো তা সুন্দর ও পরিপাটি করা হলো।

www.bjilibrary.com

২৫ অক্টোবর বেলা ৯টায় সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিবেন মাওলানা মওদূদী। পনেরো-বিশ হাজার লোকের সমাবেশ। মাওলানা তাঁর বক্তৃতা ছাপিয়ে এনেছিলেন। তাঁর নির্দেশ হলো, তিনি যখন মঞ্চ থেকে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করবেন, ঠিক সে সময়ে কিছু কর্মী শ্রোতাদের মধ্যে পনেরো-বিশ হাত পর পর একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছাপানো বক্তৃতা উচ্চস্বরে পড়তে থাকবেন। তাহলে বিনা মাইকে একই সময়ে সকলকে বক্তৃতা শুনানো সম্ভব হবে। সময় মত সেভাবেই কাজ শুরু হলো।

কাজ শুরু হওয়ার দশ মিনিট পর সম্মেলনে হঠাৎ কিছু গুণ্ডার অনুপ্রবেশ দেখা গেল। মদের নেশায় তারা ছিল উন্মত্তপ্রায়। তারা সভার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা শুরু করলো। শামিয়ানায় আগুন লাগিয়ে দিল, সম্মেলনের বাইরে কিছু হৈ-হল্লা ও পিস্তলের গুলির শব্দ শুনা গেল। মাওলানাকে লক্ষ্য করেও কয়েকবার গুলি বর্ষিত হলো। কিন্তু প্রত্যেকটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এ সময়ে চারিদিক থেকে এ কথা বলতে শুনা যায় "মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।"

কিন্তু মাওলানা দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে বলেন, "আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে ?"

কি চমৎকার জবাব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালারের। তাই বিপদের এ মুহূর্তে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সুযোগ্য নেতার ভূমিকাই পালন করলেন, নির্ভীকচিত্তে অটল অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে জীবন বিসর্জন করার কি মহান প্রস্তুতি!

এ সময় পুলিশ সদস্যরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। জামায়াত কর্মীগণ অসীম ধৈর্য ও হিকমতের সঙ্গে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে গোটা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনতে ও পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। মাওলানা পুনরায় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শুরু করলেন এবং শেষ করলেন।

পনেরো বিশ মিনিট ধরে সম্মেলন স্থলের বাহিরে যে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীর দৃঢ়তায় ভিতরে থেকে তা বুঝা যায়নি। গুণ্ডাবাহিনী সম্মেলন উপলক্ষে স্থাপিত বহু দোকান পাট, খাবারের দোকান ও চায়ের স্টল, প্রহরায় নিযুক্ত লাহোর জামায়াত কর্মীদের ক্যাম্প প্রভৃতি

www.bjilibrary.com

একেবারে তছনছ, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তাদের গুলীতে আল্লাহ বখ্‌শ্‌ নামে একজন জামায়াত কর্মী শহীদ হন। শহীদের স্ত্রী ও কন্যাগণ মহিলা ক্যাম্পে ছিলেন। মহিলাক্যাম্পে গুণ্ডাদের আক্রমণ হয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়কর হলো এত কাণ্ড ঘটার পরও কোন হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি, কান্নার রোল অথবা কোন উদ্বেগ-উত্তেজনা ছিল না। এমন ধৈর্যস্নাত অনুপম পরিবেশ কোনদিন কল্পনা করা যায় না। যেখানে খুন আছে- আর্তনাদ নেই, অগ্নিকাণ্ড আছে- হাহাকার ও কলরোল নেই, লুটতরাজ আছে- সংঘর্ষ নেই, বৈধব্য বিরহ আছে- বিলাপ নেই।

তাৎক্ষনিকভাবে আমীরে জামায়াতের নির্দেশে শহীদ পরিবারের জন্য ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে এক লাখ রুপিয়ার একটি তহবিল হয়ে গেল। বিনা মাইকে সম্মেলন বেশিক্ষণ না চালিয়ে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী অভিযানে নেমে সম্মেলনের দু'দিনে লাহোর শহরে মোট দেড় লাখ লোক জামায়াতের সহযোগী সদস্য হন। এ দাওয়াতী কর্মসূচি সম্মেলনের আসল সাফল্য বলে পরিগণিত ও প্রমাণিত হলো। এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে মাওলানার উদ্বোধনী বক্তৃতাটি নিম্নে প্রদান করা হলো।

লাহোর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ[১০]

বন্ধুগণ! উনিশ শ' সাতান্ন সালের পর আজ প্রথমবার একটি নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনে একত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আজ থেকে বাইশ বছর আগে মাত্র ৭৫ জন সদস্য নিয়ে এই শহরের বুকে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। আজ আর একবার আমরা এ শহরের বুকে সমবেত হচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানি যে, আমাদের সমস্ত ভুলত্রুটি সত্ত্বেও যে আন্তরিকতার সাথে আমরা দ্বীনের এ নগণ্য খেদমতের সূচনা করেছিলাম তাকে তিনি কবুল করে নিয়েছেন। এ কাজে তিনি এমন বরকত দান করেছেন যার ফলে আজ পাকিস্তানের প্রতি এলাকায় জামায়াতের হাজার হাজার সদস্য, সমর্থক, জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং জামায়াত প্রভাবিত ব্যক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশেও এর প্রভাব পড়েছে। নিজেদের

---

[১০] *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।*

www.bjilibrary.com

প্রচেষ্টায় এ ফল লাভ করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এ সবকিছুই মহান আল্লাহর দান এবং তাঁর পাক সত্তার পক্ষ থেকে সাহায্য-সহায়তার বিস্ময়কর ফল। এজন্যে আমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

বন্ধুগণ! পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে এমন একটি দিনও পাওয়া যাবে না, যে দিনটি এ দেশের শাসকদের কোপানলে পতিত হয়নি এবং তাদের চোখে কাঁটার মতো বিঁধেনি। গত ষোল বছর এখানে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারাই এ জামায়াতের অস্তিত্বকে বিরক্তিকর ও অসহনীয় মনে করেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন অপবাদ রটানো হয়েছে। আমাদের পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমাদের কাজে নানান বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। অতঃপর সামরিক শাসনামলে আমাদের সংগঠন খতম করে দিয়ে আমাদের সে সব গঠনমূলক কাজ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, যা বছরের পর বছর মেহনত করে আমাদের কর্মী ও সমর্থকদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম। অথচ আমরা কোনদিনই ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না। আমরা কখনও অন্যের পরিবর্তে নিজেদের হাতে ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করিনি।

আমাদের দাবি সব সময় এই ছিল এবং আজও আছে যে, এ দেশ যেহেতু ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে, সেহেতু এখানে পুরোপুরি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই জারি হওয়া উচিত। আমরা বারবার পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ কথাই বলেছি যে, সততার সাথে যেই এ কাজ সম্পন্ন করবে আমরা মনে প্রাণে তাকে সমর্থন করব এবং তার সঙ্গে ক্ষমতায় শরীক হওয়া দূরের কথা, তার কাছ থেকে কোনরকম প্রতিদানও চাইব না। কিন্তু এখানে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারাই একদিকে ইসলামের শ্লোগান দিয়ে এ দেশকে ইসলাম থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদিকে আমাদেরকে তাদের কর্তৃত্বের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে দাবিয়ে

www.bjilibrary.com

দেয়ার এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যাবতীয় নিকৃষ্টতম অস্ত্রও প্রয়োগ করেছেন।

কোন অভিযোগ হিসাবে আমি এ ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করছি না। আমাদের উপর ক্ষমতাসীনদের যে সুনজর পড়েছে এটা কোন নতুন মেহেরবানি নয়। শুধু এ অনুভূতিটুকু আপনাদের মধ্যে জাগিয়ে দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ষোল বছর থেকে অনুরূপ এবং এর চাইতেও কঠিন মেহেরবানির শিকার আমরা হয়েছি এবং এ সবের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেও আল্লাহর মেরেবানিতে আমাদের আন্দোলন এতটা অগ্রসর হয়েছে। কাজেই মাইক থেকে বঞ্চিত করে আমাদের এ সম্মেলন বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে- শুধু এতটুকু কথায় আপনারা মনমরা হবেন না। ইতঃপূর্বে এর চাইতেও কঠিন পদক্ষেপ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরঞ্চ আমাদের জন্যে লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এ সামান্য হীন প্রচেষ্টাটি আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে ? ক্ষতি হলে আমাদের অজ্ঞতার দরুন হবে, অন্যের কোন আক্রমণ থেকে নয়। অবশ্য আল্লাহ যদি চান তা পৃথক কথা।

বন্ধুগণ! আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্যে যাকে কাজ করতে হয়, তার মধ্যে অবশ্য অবশ্যই দু'টো গুণ থাকতে হবে। একটি সবর ও দ্বিতীয়টি হিকমত বা সুস্থ বিচার-বুদ্ধি। সবরের দাবি হলো আপনার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে তাতে উত্তেজিত হয়ে আপনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন না এবং হিম্মতহারা হয়ে নিজের উদ্দেশের পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন না। বরঞ্চ প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মুখে আপনার সংকল্প অটুট রাখতে হবে এবং উত্তেজনার উত্তাপ থেকে নিজের মন-মস্তিষ্ককে রক্ষা করে সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্মত পথ গ্রহণ করতে হবে।

সুস্থ বিচার-বুদ্ধি হলো আপনি চোখ বুঁজে শুধু একটি নির্দিষ্ট পথে চলতে অভ্যস্ত হবেন না। বরঞ্চ একটি পথ বন্ধ হতেই অন্য দশটি পথ বের করার যোগ্যতা আপনার থাকতে হবে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ হিকমত নেই, সে একটি পথ বন্ধ দেখেই বসে পড়ে এবং এর সঙ্গে যদি সে বেসবরও হয়, তাহলে ঐ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে সংঘর্ষে নিজের মাথা ফাটিয়ে দেয় অথবা সে পথ ত্যাগ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে হিকমত ও সবর দু'টোই দান

www.bjilibrary.com

করেছেন, তিনি হন গতিশীল স্রোতস্বিনীর মতো। তার গন্তব্যকে কোন জিনিসই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। বিপুলায়তন প্রস্তরখণ্ড হতবাক হয়ে যায় এবং নদী অন্যদিক দিয়ে তার গন্তব্যের পথে ধাবিত হয়।

সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা করে হাজার হাজার লোককে শুনানোই আমাদের পয়গাম পৌঁছানোর ও দাওয়াত সম্প্রসারণের একমাত্র পথ নয়। নিঃসন্দেহে এটিও এ কাজের একটি পদ্ধতি। কিন্তু যদি এটি আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কোন পরোয়া নেই। আপনারা তিন-তিন বা চার-চার জনের দল গঠন করে সারা লাহোর শহর ছড়িয়ে পড়ুন। ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, মসজিদে মসজিদে যান। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করুন। প্রত্যেককে জানিয়ে দিন, জামায়াতে ইসলামী কি, তার ব্যবস্থা ও সংগঠন কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার কর্মপদ্ধতি কি, সে কোন জিনিসগুলোর সংশোধন চায়, আর কোন সুকৃতিগুলো কায়েম করতে চায়। যারা আরও কিছু বুঝতে চায় তাদেরকে জামায়াতের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। তাহলে পড়াশুনা করে তারা নিজেদের রায় কায়েম করতে পারবে। যারা আগ্রহশীল নয়, তাদের পেছনে সময় নষ্ট করবেন না। বরঞ্চ আগ্রহশীলদের পেছনেই সময় ব্যয় করুন।

আর যারা বিতর্কে নামতে চায়, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাঁধিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আপনাদের পদ্ধতি-
হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমরা প্রভুর পথে আহ্বান জানাও। (সূরা আন-নহল ১২৫ আয়াত)

আপনার দাওয়াত এই খোদায়ী নির্দেশ অনুযায়ীই হওয়া উচিত। আপনার ভাষা হবে মিষ্টি। চরিত্র হবে নিষ্কলুষ। ব্যবহার হবে ভদ্রোচিত। মন্দের জবাব দেবেন ভালোর মাধ্যমে। সত্যি সত্যিই যে আপনি মন্দের স্থলে ভালো প্রতিষ্ঠিত করতে চান, একথা শুধু মুখে নয়, নিজের কাজ ও প্রকাশভঙ্গির দ্বারা তা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। এরপর বিশ্বাস করুন আল্লাহ তায়ালার রহমত আপনার সহযোগী হবে এবং যতটা কাজ আপনি করবেন, তার চাইতে অনেক বেশি কাজ আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতাগণ আপনার সহযোগী হয়ে সম্পন্ন করবেন।

www.bjilibrary.com

সম্মেলনের এ দিনগুলোতে অনেক চক্ষু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের নিরীক্ষণ করবে। আপনারা নিজেদের জামায়াতের নির্যাস এনে কেন এখানে প্রদর্শনীতে রেখে দিয়েছেন। অসংখ্য কষ্টি পাথরে আপনাদের যাচাই করা হবে। কোন বিশেষ সময়ে নয়, প্রতিটি দিক থেকেই যাচাই করা হবে। এখন আপনারা যদি নিজেদেরকে খাঁটি অথবা ভেজাল প্রমাণ করতে চান, তাহলে তা নির্ভর করবে আপনাদের কার্যকলাপের উপর। যামানা বড় নির্দয় যাচাইকারী। আপনারা কোন কৃত্রিম কৌশলে এবং কোন বাহ্যিক আড়ম্বরের মাধ্যমে তার কষ্টিপাথরে নির্ভেজাল প্রমাণিত হতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি নির্ভেজাল হয়ে থাকেন, তাহলেও অনেক বিবেচনা ও ইতস্তত করার পরই সে আপনাদের খাঁটি বলে স্বীকার করবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদি নিজেদের কাজের দ্বারা আপনারা নির্ভেজাল প্রমাণিত হন, তাহলে বিরোধী শক্তি আপনাদের ভেজাল প্রমাণ করার জন্যে যতই বিরাট এবং ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাক না কেন, ইন-শা আল্লাহ তারা পরাজিত হবে এবং আপনাদের পরিবর্তে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। মিথ্যার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে আপনারা একটুও ঘাবড়াবেন না। তার আগমন তুফানের মতো, কিন্তু মিলিয়ে যায় বুদবুদের মতো নিমেষে। আর একবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর তার ভেতরের প্রচ্ছন্ন আবর্জনা এমনভাবে মানুষের দৃষ্টিসমক্ষে ভেসে উঠে যে, সমগ্র দুনিয়া তারই উপর ছি-ছি করে উঠে। কাজেই মিথ্যার মুকাবিলা করার চিন্তা আপনাদের করা উচিত নয়। আপনাদের চিন্তা করা উচিত নিজেদের সত্যতার। আপনারা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তাহলে মিথ্যা মুকাবিলা আপনাদেরকে করতে হবে না। আল্লাহ তায়ালা তার মুকাবিলা করবেন এবং আজকের মিথ্যা তিনি ঠিক তেমন শিক্ষণীয় করে রাখবেন যেমন এর আগে এর প্রতি যুগের মিথ্যাকে শিক্ষণীয় করে রেখেছেন।

শেষ কথা এই বলতে চাই যে, এ জামায়াত এবং এ আন্দোলনকে যে ব্যক্তিই নিজের জন্যে ভয়াবহ বিপদ মনে করে, সেই তার সমগ্র শক্তি আমার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে। আমাকে যাঁরা ভালবাসেন, এ জিনিসটা স্বভাবতই তাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকে। আপনারা বারবার এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। আমার ভয় হচ্ছে আপনারা নিজেদের দাওয়াত সম্প্রসারণের পরিবর্তে আমার প্রতিরক্ষায় নিজেদের সময় ও শক্তি ব্যয় না

www.bjilibrary.com

করে ফেলেন। আমার সকল অন্তরঙ্গ ভাইকে আমি নিশ্চিত হতে বলছি যে, মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে আমার কোন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নেই। আমি কোন মহাশূন্য থেকে হঠাৎ এখানে আসিনি। এ দেশের মাটিতেই কাজ করে আসছি বছরের পর বছর ধরে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে আমার কাজ সম্পর্কে অবগত। আমার লেখা শুধু এ দেশেই নয়, দুনিয়ার বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে আছে এবং আমার উপর আমার প্রতিপালকের মেহেরবানি এই যে, তিনি আমাকে কলুষমুক্ত রেখেছেন। আমার মুখ কালো করে দেয়া সহজ কাজ নয়। যে কেউ উঠে দশ-বিশটা মিথ্যা দোষারোপ করে আমার মুখে এক পোঁচা কালি লেপে দেবে, এতটা সহজ নয়। বিশেষ করে ঐসব লোক, যাদের না কোন অতীত আছে, না ভবিষ্যত, ঘটনার পরম্পরা যাদেরকে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে উপরে এনেছে। এ খেলা খেলে ইন-শা আল্লাহ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই আমি নিজে নিশ্চিন্ত আছি এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার প্রতিরক্ষায় ব্যাপৃত না হয়ে আল্লাহ তায়ালার পথের দিকে আল্লাহ তায়ালার বান্দাদেরকে আহ্বান করতে থাকুন। আমি আমার প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখি। যদি আমি স্বচ্ছ নিয়তে তাঁর দ্বীনের খেদমত করে থাকি, তাহলে তিনি নিজেই আমার প্রতিরক্ষা করবেন।"

লাহোর সম্মেলন পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠক

আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা ও অপার মহিমায় সর্বপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন করেও সম্মেলন বানচাল করা গেল না। উপরন্তু সারা দেশের লোকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করলো জামায়াতে ইসলামী।

সম্মেলন শেষে মাওলানার বাসভবনে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণ সম্মেলন পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ বৈঠক সম্পর্কে যেভাবে লিখে গেছেন:

"প্রথমদিনের এতো লঙ্কাকান্ডের পর অবশিষ্ট দু'দিন ভালোভাবে কেটে গেল। আমরা সবাই সম্মেলনের প্যান্ডেল পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর ৫-এ বায়লদার পার্কে অবস্থিত মাওলানার বাসভবনে আমরা কেন্দ্রীয় শূরা সদস্যগণ একত্র হয়ে সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা শুরু করি। আলোচনার এক পর্যায়ে আমরা সকলে প্রস্তাব করি যে, যেহেতু আইয়ুব সরকার মাওলানার জীবন নাশ

www.bjilibrary.com

ও জামায়াতের মূলোৎপাটনের জন্যে বদ্ধপরিকর, সেহেতু নিরাপত্তার জন্যে মাওলানার বাসস্থানে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হোক।

মৃদু হাস্য করে মাওলানা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'দেখুন, আমি একটি ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছি, যে আন্দোলনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি অনিবার্য। একদিকে আমি আপনাদের জীবনের ঝুঁকি নেয়ার পরামর্শ দেব, অপরদিকে নিজের নিরাপত্তার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করব, এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে? এ আমার মর্যাদারও খেলাফ।'

একটু নীরব থাকার পর পুনরায় বলেন, কারো মৃত্যু যদি আল্লাহর মনঃপূত না হয়, তাহলে সারা দুনিয়া চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারবে না। আর তাঁর ইচ্ছা হলে পুত্রের গুলিতেও পিতা প্রাণত্যাগ করতে পারে।

মাওলানা আপন মনে কয়েকটি কথা বলে ফেললেন। সম্মেলনে গুলি চলাকালীন মাওলানাকে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানালে বলেছিলেন, "বিপদ দেখে আমি যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?" মাওলানার সে নির্ভীক উক্তি কর্মীদেরকে শতগুণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। আদর্শ নেতার উক্তিই বটে। এবারের উক্তি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর এ উক্তি কোন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন ক্ষমতা ও অধিকার মানুষের নেই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধারা ও গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কেই ছিল মাওলানার এ উক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিন-চার মাসের মধ্যেই তার এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়। আইয়ুব খানের নির্দেশে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কালাবাগ থেকে ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এনে জামায়াত সম্মেলনকে একটি রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তার তিন-চার মাস পর তিনি আপন গৃহে স্বীয় পুত্রের পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন।"[১১]

নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন (১৯৪৯-৬৩)

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন হয়েছে মাত্র পাঁচটি :

১। ১৯৪৯ সালের মে মাসে লাহোরে।
২। ১৯৫১ সালের নভেম্বরে করাচীতে।
৩। ১৯৫৫ সালের নভেম্বরে করাচীতে।
৪। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাছিগেট রহীম ইয়ার খানে।
৫। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে লাহোরে।

---

[১১] *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।*

www.bjilibrary.com

সরকারের রোষানলে জামায়াত

পাকিস্তানের জন্মের পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কোন সরকারই জামায়াতে ইসলামীকে বরদাশত করতে পারে নি। আর এ আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেব ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী কাদিয়ানী ও সমাজতন্ত্রীসহ সকল ইসলাম বিরোধী শক্তির টার্গেট ছিলেন। বারবার এ আপোষহীন সংগ্রামী মর্দে মুমিনকে কারা প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদন্ড দিয়ে রাতারাতি তাঁর জীবন লীলা শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিফল মনোরথ হয়ে তাঁকে জেলের বাইরেও মুক্ত আবহাওয়ায় ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে তাঁকে লক্ষ্য করে ছুড়া গুলিতে জনৈক জামায়াত কর্মী শহীদ হয়ে যান। ক্ষমতাশীন কায়েমী স্বার্থবাদীদের বহু অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার জামায়াতে ইসলামীকে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আমীরে জামায়াত ও বাংলাদেশের ১৩ জনসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ৬০ (ষাট) জন নেতাকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে কারা প্রাচীরে আটকে রাখা হয়। জামায়াতের প্রতি এই জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হাইকোর্ট গুলোতে মামলা দায়ের করা হলো, পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়। তখন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের সুযোগ্য ভাগনে সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ। অতঃপর ২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস জামায়াতকে নিষিদ্ধকরণ, নেতাদেরকে হয়রানি ও গ্রেফতারিকে অন্যায়, বেআইনি এবং বাড়াবাড়ি বলে ঐতিহাসিক রায় দেন। রায়ের ফলে মাওলানা মওদূদীসহ সকল নেতা কারা মুক্ত হন এবং জামায়াতে ইসলামী সারাদেশে আবার কর্ম তৎপরতা শুরু করে।

www.bjilibrary.com

দশম অধ্যায়

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর জাতীয় পরিষদ ও এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৫ দলীয় সম্মিলিত বিরোধী দল এবং নেযামে ইসলাম পার্টির নেতৃবর্গসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একক মনোনীত প্রার্থী ছিলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। কিন্তু বিরোধী মহলতো বটে সরকারের সুবিধাভোগী ওলামাদের তীব্র সমালোচনায় পড়তে হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী এবং তার শীর্ষ নেতৃবর্গকে।

১৯৬৪ সালের নভেম্বরেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান শুরু হয়। তার পূর্বে ১৯৬৪ সালের ২০ জুলাই ঢাকায় খাজা নাজিম উদ্দিনের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং তখনো পর্যন্ত নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদের বৈঠকে ৫ দলের সমন্বয়ে 'কপ' (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) নামে একটি ঐকমঞ্চ গঠন করা হয় এবং নয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সকল দলের কাছে প্রেসিডেন্ট পদে গ্রহণযোগ্য কোন স্থানীয় নেতৃত্ব না পাওয়ায় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে জাতির স্থপতির সহোদরা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সম্মিলিত বিরোধী দলের ডেলিগেশনকে ফাতেমা জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন- 'আমি স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য মাত্র এক বছর দায়িত্ব পালনে রাজি আছি।' জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদী তখনো জেলে ছিলেন। যাহোক জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার যেসব সদস্য জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁরা ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর বৈঠকে বসেন। বৈঠকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়-

> *"স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা সমীচীন নয়। কিন্তু এখন দেশে চলছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা। স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে মিস ফাতিমা জিন্নাহর কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থার নিরিখে জামায়াতে ইসলামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহকেই সমর্থন করেন।"*[১২]

জেলখানা থেকে মাওলানা মওদূদীও ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থনের পক্ষে মতামত জানালেন ।

---

[১২] *প্রফেসর মাসুদুল হাসান, মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, দ্বিতীয় খণ্ড।*

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফীর সাথে জামায়াত নেতা চৌধূরী গোলাম মুহাম্মদের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আযম সহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক ডেলিগেশন সাক্ষাৎ করলে তিনি রায় দিলেন যে, যেহেতু মুহাতারেমা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পূর্ণ মেয়াদে ৫ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চান না, তিনি তো আদৌ প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শুধু স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি মধ্যবর্তী সরকার প্রধানের ভূমিকা পালন করতে শর্ত সাপেক্ষে সম্মত হয়েছেন, তাই আর কোন বিকল্প নেই বিধায় তাঁকে এটুকু দায়িত্ব দিলে দেশে নারী নেতৃত্ব কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না। আপনারা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার অভিযানকালে মাওলানা মওদূদীর একটি মন্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। "পুরুষ হওয়া ছাড়া আইউব খানের আর কোন গুণ নেই, আর মহিলা হওয়া ব্যতীত ফাতেমা জিন্নাহের আর কোন দোষ নেই।"

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হলো। নির্বাচিত বি ডি মেম্বাররা ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দিবে বলে তাদের নির্বাচক মণ্ডলী নিশ্চিত হলো। বয়োবৃদ্ধ ও অবাঙ্গালি মহিলা হয়েও তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল সহ পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য পথসভা ও বেশ কয়েকটি বিশাল জনসভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন। হঠাৎ খাজা নাজিম উদ্দীন ১৯৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর হৃদরোগে ইন্তিকাল করায় নির্বাচনী সফর সংক্ষিপ্ত করেই তিনি করাচী ফিরে যান।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার যে মহান উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সে জাতির স্থপতির সহোদরা দেশব্যাপী নির্বাচনী ঝামেলা পোহাতে সম্মত হলেন, স্বার্থপর ভোটারদের কাছে এর কোন মূল্য থাকল না। এ সত্ত্বেও ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ১৮২৪ ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ১০২৪৪ ভোট পান। আর ক্ষমতার শীর্ষে আসীন আইউব খান পূর্ব পাকিস্তানে ২১০১২ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮৯২১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এম এন এ ও এম পি গণ অধিকাংশই সরকারি মুসলিম লীগ (কনভেনশন) থেকে নির্বাচিত হন।

www.bjilibrary.com

মোনায়েম খানের শাসন ও ইসলামী আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তানের তেইশ বছরের (১৯৪৭-৭১) আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রায় ডজন দেড়েক গভর্নর এই প্রদেশ শাসন করেন। এদের মধ্যে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রথম বাঙালি গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) আর সর্বশেষ ছিলেন ডাঃ আব্দুল মোতালেব মালেক। অবাঙালি উর্দুভাষীদের মধ্যে একমাত্র লেঃ জেঃ আজম খানের (১৯৬০-৬২) আন্তরিকতা বাঙালি হৃদয়কে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। গভর্নরদের মধ্যে জনাব আব্দুল মোনায়েম খান সবচেয়ে বেশি সময় প্রায় ৭ বছর (১৯৬২-৬৯) দাপটের সাথে এ প্রদেশটি শাসন করেন।

আব্দুল মোনায়েম খান পেশায় একজন উকিল এবং মুসলিম লীগের ময়মনসিংহ জেলার একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী গভর্নরদের মতো সরকারি গতানুগতিক দায়িত্ব পালন করাই যথেষ্ট মনে করতেন না। ইতিপূর্বে সামরিক শাসনে জেঁকে বসা প্রেসিডেন্ট আইউব প্রেমে অন্ধ আবদুল মোনায়েম খান মনে করতে পারেননি যে, বাংলাদেশের রাজনীতি ও অধিকার সচেতন ছাত্রজনতা আইউব খানকে গণতন্ত্রের দুশমন মনে করে। জনগণের ভোটাধিকার সহ কতিপয় মৌলিক অধিকার হরণপূর্বক তিনি অন্যায়ভাবে স্বৈরশাসন চালু রেখেছেন। এই স্বৈরশাসনকে এদেশে জনপ্রিয় করার অপপ্রয়াস চালিয়ে তিনি গণতন্ত্রমনা সবাইকে বিক্ষুব্ধ করে তোলেন। গভর্নর সারাদেশে সরকারি উদ্যোগে বিশাল জনসভা এবং ধর্মীয় সমাবেশে তোষণমূলক ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইউব খানকে এবং ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

জনাব আবদুল মোনায়েম খানের আমলে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন দারুনভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়। একেতো ১৯৬৪ সালে সারা দেশব্যাপী একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় যা শুধু তৎকালীন প্রাদেশিক সর্বোচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) থেকে নয়, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে অমুসলিম প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এ আর কর্নেলিয়াস কর্তৃক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করা হয়। এই সময় ছারছিনা শরিফের পীর সাহেবের সাথে সরকারি মুসলিম লীগের ছিল দারুন দহরম মহরম। সারা দেশে ওলামা

www.bjilibrary.com

মাশায়েখ থেকে শুরু করে সাধারণ দ্বীনি মহলেও ছিল তাদের প্রচণ্ড প্রভাব। তখন ছারছিনা দরবার থেকে "মওদূদী জামায়াতের স্বরূপ" নামে একখানা মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ পুস্তক সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে নানামুখী অপপ্রচার ও বিরোধিতার বিনিময়ে বৃহত্তর বরিশালের তৎকালীন কাদিয়ানি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যাবতীয় প্রশাসনিক সুবিধাদি প্রদান ছাড়াও "আইউব হল" ও "মোনায়েম হল" নামে দু'টো ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। আবদুল মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিপালিত এন এস এফ নামক ছাত্র সংগঠনটির সীমাহীন অত্যাচারে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন বিশেষভাবে ইসলামী ছাত্র সংঘ অযথা হয়রানি ও জুলুমের শিকার হয়েছে।[১৩]

পাক-ভারত যুদ্ধ ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ভারত অতর্কিতভাবে স্থল ও আকাশ পথে পাকিস্তান আক্রমণ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর দখল পূর্বক শালিমারবাগে বিজয়োৎসবের ঘোষণা দেয়। ভারতের বিশাল ট্যাংক বাহিনীকে স্থলপথে মোকাবিলার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও আত্মত্যাগী ৫০ জন সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক কোমরে ডিনামাইট বেঁধে এগিয়ে যায়। প্রতিপক্ষ এ ধরনের আক্রমনের কল্পনাও করেনি। সামনের ৫০টি ট্যাংক বিধ্বস্ত হলে দ্রুত ধাবমান পেছনের ট্যাংকগুলো একটার পরে একটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ভারতের লাহোর জয়ের স্বপ্ন ধূলিসাত হয়ে গেলো।

১৭ (সতের) দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতের ১১০টি জঙ্গীবিমান ভূ-পাতিত করে। ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের মাত্র ১৬টি জঙ্গীবিমান ভূ-পাতিত করে। পাকিস্তানী নৌ-বাহিনী ভারতের দ্বারকা নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে। ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌ-ঘাঁটির কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।

জাতীয় এ দুর্যোগ মুহূর্তে জামায়াতের প্রতি সর্বদা বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন প্রেসিডেন্ট আইউব খান আমীরে জামায়াতের কাছে পাক-ভারত যুদ্ধে

---

[১৩] *আবু জাফর- 'রাজভবন থেকে বঙ্গভবন'।*

www.bjilibrary.com

সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। পাকিস্তান সরকারের ইনফরমেশন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সাইয়্যেদ মুনির হোসাইন মাওলানার বাসভবনে জানিয়ে দেন যে তিনি লাহোর পৌঁছার সংবাদ তাঁকে জানালে পিন্ডি যাবার জন্য সরকারি যানবাহন পাঠিয়ে দিবেন। মাওলানা প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক তাঁকে জানান যে এ ধরনের চরম জাতীয় সংকট মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর জামায়াত যে কোন খেদমত ও ত্যাগের জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আছেন।

মাওলানা মওদূদী জিহাদ ও দেশপ্রেমের উপরে ক্রমাগত দু'দিন রেডিও পাকিস্তান থেকে উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করেন। দেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনীসহ সকল দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করার পাশাপাশি তিনি জামায়াত কর্মীকে দেশরক্ষায় এবং মেডিকেল টীমসহ যুদ্ধে আহতদের সেবা ও চিকিৎসায় মাঠে ময়দানে পাঠিয়ে দেন। জামায়াতে ইসলামীর এ সময়ের নিঃস্বার্থ জাতীয় খেদমত সেনাবাহিনী জনগণের মন জয় করে। ভারত কর্তৃক ইতিপুর্বে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর জুলুম নিপীড়ন চরমে পৌঁছলে আগস্ট মাসের শেষ ভাগে তারা জেহাদ ঘোষণা করেন। মাওলানা মওদূদী ইতিমধ্যে কাশ্মীরী মজলুম মুসলমানদের ও মুজাহিদদের সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য পাকিস্তানের জনগণের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি মুসলিম বিশ্বের শতাধিক আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ নেতৃবর্গ ও সাংবাদিকদের কাছে সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা চেয়ে পত্র লেখেন। সে সময় কেবলমাত্র জামায়াত কর্মীদের সংগৃহীত ও নিজেদের দানকৃত সাহায্য সম্ভারের পরিমাণ ছিল অন্যূন ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা।

আইউব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতের ভূমিকা

১৯৬৬ সালে ৬-১০ জানুয়ারি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যালেক্সী কোসেগিনের মধ্যস্থতায় উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বিবাদমান ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় উহাই তাসখন্দ ঘোষণা নামে প্রচারিত হয়। এই তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দলই অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করার কারণে যেটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেন,

www.bjilibrary.com

উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে কুটনৈতিক পরাজয় বরণ করায় তা দারুণভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তখন থেকেই আইয়ুব খানের পতনের সূচনা হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশের উন্মেষ ঘটে।

এই সময়ে জামায়াত প্রধান মাওলানা মওদূদীর এক বিবৃতি রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত প্রসংশিত হয়। তাসখন্দ চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "ডিকটেটররা নিজের দেশে যতই বাহাদুরি দেখাক, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁরা দুর্বল ভূমিকা পালন করেন। জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রধান দেশে জনসমর্থনের কাঙ্গাল বলে দাপট দেখায় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ময়দানে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।"

তাসখন্দ ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দলসমূহ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করতে অগ্রসর হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ জানুয়ারি লাহোরে 'কপ' চেয়ারম্যান পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে বিরোধী দলের সভায় তাসখন্দ ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল সাবেক প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ঢাকাস্থ বাসভবনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ পাঁচ দলের বৈঠকে স্বৈরাচার বিরোধী রাজনৈতিক জোট PDM (Pakistan Democratic Movement) প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিবের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি : ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দু'টো বিষয়ে, দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে।

www.bjilibrary.com

৩। মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : দু'টি দেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে।

৪। রাজস্ব ও কর সম্বন্ধীয় ক্ষমতা : কর ধার্যের কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না। এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ লাভ করবে।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা : পাকিস্তান ফেডারেশন ভুক্ত দু'টি অঙ্গরাজ্যের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দু'টো পৃথক খাত হিসেবে রাখা হবে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্বপাকিস্তানের আয় অত্র প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬। আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : আঞ্চলিক সংহতিবিধান ও সংবিধান রক্ষার জন্য সংবিধানে (Constitution) অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি এক সরকারি প্রেসনোটে ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে তাঁকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থাকাকালে ডাকসুর ভি. পি ও ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমদ ও জি.এস নাযিম কামরান চৌধূরী বামপন্থী সকল ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবিনামা প্রণয়ন করেন।

প্রসংগত: উল্লেখ্য যে, মজলুম জননেতা হিসেবে অভিহিত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ইতিপূর্বে শেখ মুজিবের ৬ দফার সমালোচনা করলেও ইহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে শুধু মৌখিক সমর্থনই জানালেন না, ইহার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি ছাত্র ও শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক শেখ মুজিবের অবর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করে তোলেন।

www.bjilibrary.com

পি.ডি.এম এর ৮ দফা ও জামায়াতে ইসলামী

আওয়ামী লীগের একাংশ সহ পি. ডি. এম ভুক্ত দল সমূহ ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রীয় সংহতি পরিপন্থী মনে করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার পরিকল্পনায়ই ৬ দফা প্রণীত হয় বলে ধারণা করা হয়। প্রায় চারদিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে ভারতের আধিপত্যের শিকার হবার প্রবল আশংকা আছে। তাই এর বিকল্প হিসাবে পি.ডি.এম নিম্নোক্ত ৮ দফা দাবি পেশ করে, যাতে প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে পারে। দাবিনামাসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১। শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের ব্যবস্থা থাকবে :
   ক) পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার
   খ) প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে আইন পরিষদের নির্বাচন (১৯৫৬)
   গ) সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরন ইত্যাদি।

২। ফেডারেল সরকার নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে : ক) প্রতিরক্ষা খ) বৈদেশিক বিষয় গ) মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা।

৩। পূর্ণ আঞ্চলিক শাসন কায়েম করা হবে।

৪। উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দশ বছরের মধ্যে নিরসন কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।

৫। মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাকিং আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত এক বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

৬। সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে।

www.bjilibrary.com

৭। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এতদ উদ্দেশে :

ক) পূর্বপাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র কারখানা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করতে হবে।

খ) দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্বপাকিস্তান থেকে সমসংখ্যক জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

গ) নৌবাহিনীর সদরদপ্তর পূর্বপাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

উপরিউক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সম্বলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৮। এই ঘোষণা শাসনতন্ত্র শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায় যা, অবিলম্বে জারি হবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করার ছ' মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত হবে।

উপরোক্ত ৮ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল রাজনৈতিক দল এবং প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ করা।

উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' প্রশ্নে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত অংশটি 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে' যোগ দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাজশাহীর কামারুজ্জামান পরিচালিত অংশটি "ছয় দফা" ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

স্বৈরশাসনের অবসানকল্পে জামায়াতে ইসলামী একনিষ্ঠভাবে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগের এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং সেক্রেটারি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.bjilibrary.com

ঢাকায় DAC (Democratic Action Committee) গঠন ও পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আইউব খানের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ঐ বছরেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যুগপৎ ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন মাঠে, ময়দানে ও মঞ্চে সবচেয়ে সরগরম ভূমিকা পালন করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছাত্র গণআন্দোলনে নতুন মাত্রার সংযোগ করে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরো জোরদার হলে পি.ডি.এম ভুক্ত ৫টি দলের সাথে আওয়ামী লীগসহ আরো ৩টি দল মিলে আট দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় এবং পি. ডি এম এর স্থলে ডি. এ. সি (ডাক) গঠিত হয়। ডি. এ. সি এর আট দলের সর্বসম্মত ৮ দফা দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরো ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যের ডাক দেয়।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'র ৮ দফা দাবি

১। ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার প্রবর্তন।
২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩। অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪। নাগরিক অধিকার বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল।
৫। শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তিদান ও মামলা বাতিলকরণ।
৬। ১৪৪ ধারার আওতায় সকল প্রকার আদেশ প্রত্যাহার।
৭। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহালকরণ।
৮। সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহালকরণ।

ডি. এ. সি এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়কের দায়িত্ব পি. ডি. এম এর সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও পূর্ব পাকিস্তানের আহ্বায়কের দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের উপর দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী এই জোটেও পূর্বের মতোই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

www.bjilibrary.com

প্রসংগত উল্লেখ্য পি. ডি. এম আঞ্চলিক অফিসের ভাড়া ও অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচ পার্টির ওপরেই সমান অংকের চাঁদা ধার্য ছিল। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করত। নেযামে ইসলাম পার্টিও নিয়মিত আদায়ের চেষ্টা করত বলা যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের বিষয়টি প্রথম থেকেই অনিয়মিত। এ প্রসংগে সমকালীন স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন মুসলিম লীগের চৌকষ নেতা তোয়াহা-বিন-হাবীর বলতেন 'জামায়াতে ইসলামী গরিব লোকের ধনী পার্টি, আর অন্যগুলো ধনী লোকের গরিব পার্টি।

১৯৬৯ সালে ডি. এ. সি এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন গোটা পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে আইউব খান গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ডি. এ. সি এর ৮ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হন। গোলটেবিল বৈঠকে ডি. এ. সি এর প্রতিনিধি হিসেবে যারা যোগদান করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয় তারা হলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এবং পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। কিন্তু আওয়ামী লীগ গ্রুপিং এর দরুন নসরুল্লাহ খানের সাথে এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং সদ্য কারা মুক্ত শেখ মুজিবের সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট গেস্ট হাউসে গোলটেবিল বৈঠকে বসেন।

গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব ও মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার

গোলটেবিল বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে বসার পূর্বে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধিবর্গের এক সভায় মাওলানা মওদূদী অনেক পরামর্শ প্রদান করেন। এক পর্যায়ে মাওলানা বলেন, "আমরা যদি গোলটেবিল বৈঠককে সফল করতে চাই, তাহলে ৮ দফার বাইরে কোন বিষয় বৈঠকে উত্থাপন করতে দিতে পারি না। যদি কেউ নতুন দাবি তোলেন তাহলে আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট আইউবও কোন নতুন দাবি মেনে নেবেন না এ অবস্থায়

www.bjilibrary.com

সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে গণতন্ত্র বহাল করতে ব্যর্থ হবো এবং আমরা নতুন করে সামরিক শাসনের খপ্পরে পড়বো।"

মাত্র একদিন স্থায়ী হবার পরে ঈদুল আজহার জন্য বৈঠক মুলতুবি হয়ে যায়। ঈদের পরে রাওয়ালপিন্ডিতে পৌঁছার পূর্বে লাহোরে নেযামে ইসলামী প্রধান চৌধুরী মুহাম্মদ আলী'র বাসভবনে ডি. এ. সি এর বৈঠক বসে। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বসম্মত ৮ দফা দাবির বদলে ৬ দফা পেশ করার অনুরোধ জানান। এতে করে গোলটেবিল বৈঠক বানচাল হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। ৮ বছরব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কায় DAC-এর ৭টি দলের নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর সভাপতি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈঠক মুলতুবি করা হলো। চরম হতাশা নিয়ে সবাই ধীরে ধীরে উঠে বের হয়ে গেলেন। উদ্ভূত সমস্যা কাটাতে প্রয়োজনীয় লবিং এর জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রস্তাবক্রমে শেখ মুজিব তখন তাজ উদ্দিন সহ মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর পরবর্তী বর্ণনা অধ্যাপক গোলাম আযম যেভাবে দিয়েছেন-

> *আলোচনা সূচনার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "মাওলানা, আপনার সাথে যোগাযোগ না করেই আমি শেখ সাহেবকে নিয়ে এলাম। তিনি কি চান তা তাঁর কাছ থেকে শুনবার উদ্দেশ্যেই আমি নিয়ে এসেছি। এখন শেখ সাহেব বলুন।*
>
> *শেখ মুজিব উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১০/১২ মিনিট তার বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "মাওলানা সাহেব, আমি ৬ দফার আন্দোলন শুরু করার পরই আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমি জেলে থাকা অবস্থায়ই আমার ৬ দফার সাথে আরও ৫ দফা যোগ করে ছাত্ররা ১১ দফার আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়। আযম সাহেব ৬ দফা সম্পর্কে শুরু থেকে এ পর্যন্ত একই ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী আজব চিজ। তিনি প্রথমে ৬ দফা ডিসমিস বলে ঘোষণা করলেন। অথচ আমার অনুপস্থিতিতে ১১ দফা নিয়ে মাতামাতি করছেন। ছাত্র ও শ্রমিক মহলে ১১ দফার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই ভালো নয়। তিনি জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন চালাচ্ছেন। আমি যদি ৬ দফার বদলে DAC- এর ৮ দফা মেনে নেই, তাহলে আমার*

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে মওলানা ছাত্র ও শ্রমিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন। জনগণের মধ্যে ৬ দফাসহ ১১ দফা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এর ফলে আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি। মওলানা ভাসানী বিরাট এক ফেতনা। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন।

একটানা এ কথাগুলো বলার পর একটু থেমে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, "মাওলানা সাহেব, মেহেরবানি করে ৬ দফাকে সমর্থন করে আমাকে সাহায্য করুন। দেখবেন, আমি মওলানা ভাসানীকে দেশ থেকে তাড়াবো।"

মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আপনি যদি আপনার দলীয় দাবিতে অনড় থাকেন তা হলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবে এবং মওলানা ভাসানী আরও মযবুতভাবে কায়েম হবে। মওলানা চান যে, গোলটেবিল বৈঠক বানচাল হয়ে যাক। আপনার এ পদক্ষেপ মওলানার উদ্দেশ্যই পূরণ করবে। মনে রাখবেন, ৭/৮ বছরের আন্দোলনের ফলে গণতন্ত্র এখন আমাদের দুয়ারে হাজির। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আবার সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে। গোলটেবিল বৈঠককে সফল করুন এবং গণতন্ত্র বহাল হতে দিন। আগামী নির্বাচনে আশা করি আপনি ভালো করবেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাসখন্দ ইস্যুকে ভিত্তি করে সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ৬ দফার কারণেই আপনার দল শরিক হতে পারেনি। এবারতো আপনার দল ডিএসিতে শরিক হয়ে ৮ দফা প্রণয়নে একমত হয়েছে। আপনার দলীয় দাবি অপর ৭ দলকে মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব ৮ দফা মেনে নিতে সম্মত হয়েই গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। আপনি কেমন করে আশা করতে পারেন যে, ডি.এ.সি-এর অন্যান্য দল আপনার দাবি মেনে নেবে ? গোলটেবিল বৈঠককে সফল করে গণতন্ত্রকে এক্ষুণি বহাল করার মহাসুযোগ নষ্ট করবেন না। দেশে অবিলম্বে নির্বাচন হতে দিন। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দলীয় মেনিফেস্টো অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন। আমি বিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

ইতোমধ্যে চা-নাস্তা এলো। শেখ সাহেব আর কিছুই বললেন না। একটু চা খেয়ে বিদায় নিলেন।[১৪]

---

[১৪] অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, ৩য় খন্ড।

www.bjilibrary.com

গোলটেবিলের শেষ বৈঠক

গোলটেবিলের ফলাফল শূন্য হবে এই কথাটা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন। শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৩ মার্চ ১৯৬৯ সনে। এ বসাটা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। বৈঠকে এক পর্যায়ে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, সকল রাজনৈতিক দলগুলো যে দু'টো বিষয়ে একমত বলে প্রমাণিত হয়েছে তা হলো-

১। প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে জনগণের সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হবে;

২। ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি দু'টো মেনে নেয়া হলো। আর কোন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারায় তা বিবেচনা করা সম্ভব হলো না। আমি গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্তি ঘোষণার পর DAC-এর আহ্বায়ক বললেন DAC-এর প্রধান দু'টো দাবি সরকার মেনে নেওয়ায় ৮ দলীয় জোটের (DAC) আর প্রয়োজন থাকছে না। অতএব DAC বিলুপ্ত ঘোষিত হলো।

স্বৈরাচারী আইউবের আত্মসমর্পন ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ

বহু কাঙ্ক্ষিত গোলটেবিল বৈঠকের নিশ্চিত সফলতার দ্বারপ্রান্ত থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরার দরুন ডি.এ.সি নেতৃবর্গ দারুনভাবে মর্মাহত হলেন। অপরদিকে ১৯৬৯ সালের ১৪ মার্চ শেখ মুজিব ঢাকা বিমান বন্দরে বীরোচিত সম্বর্ধনা পেলেন। বিমান বন্দরে তিনি জনগণকে বললেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে পূর্বপাকিস্তানী নেতারা ৬ দফা সমর্থন করলে আইউব খান তা মেনে নিতেন।

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানকে এক দীর্ঘ চিঠিতে দেশের বিপর্যস্ত আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেন। দেশের নাজুক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এক কালের 'ক্ষমতাদর্পী এই লৌহ মানব' স্বেচ্ছায় সকল ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। উক্ত চিঠি মোতাবেক পরের দিন ২৫ মার্চ ১৯৬৯ প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান গোটা দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করেন। ১৯৬২

www.bjilibrary.com

সালে প্রণীত সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহ বিলুপ্তির ঘোষণা দেন। গভর্নর ও মন্ত্রীদেরকে বরখাস্ত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দু'টো সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত এবং দু'অঞ্চলে দু'জন সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।

শেখ মুজিবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' জারির সপ্তাহখানেক পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী রহমত ইলাহী টেলিগ্রামে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতের করণীয় সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের হেদায়াত পৌঁছাবার জন্য আমি ঢাকা আসতে চাই। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও দেখা করা জরুরি বলে জানান। এজন্য তিনি (অধ্যাপক গোলাম আযম) যেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন।

টেলিগ্রাম পেয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম ফোনে শেখ সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বলে সাক্ষাতের সময় নেন। নির্ধারিত দিনে অধ্যাপক গোলাম আযম চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে যথাসময় শেখ সাহেবের ধানমণ্ডিস্থ ৩২নং বাড়িতে পৌঁছেন। তাদের সাথে জামায়াতের প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ নুরুযযামানও ছিলেন। পরবর্তী ঘটনা অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন-

> *"শেখ মুজিব চৌধুরী সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি করলেন এবং আমাদের দু'জনের সাথে হাত মিলিয়ে ভেতরে খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় তাঁর দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের কাউকে ভেতরে নিলেন না। তিনি আমাদেরকে বসাবার পর চৌধুরী সাহেবের সাথে কথা বলবার আগে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আযম সাহেব! আমি যদি জানতাম যে, আবার মার্শাল ল' হবে তাহলে গোলটেবিলে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো।" আমি সঙ্গে সঙ্গে এ কথার জওয়াবে কিছুই না বলে চৌধুরী রহমত ইলাহীর সাথে শেখ সাহেবকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। তিনি সময় নিয়ে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে আমার সাথে কথা শুরু করা সঠিক মনে হয়নি। তাছাড়া তিনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছিলেন, যা চৌধুরী সাহেবের বুঝবার কথা নয়।*

www.bjilibrary.com

চৌধুরী সাহেব পয়লা সৌজন্যমূলক কথা বললেন। শেখ সাহেব কেমন আছেন, বাড়িতে সবাই ভালো আছেন কিনা, এ জাতীয় কিছু বলার পর চৌধুরী সাহেব জানতে চাইলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে এর পরিণাম কি হবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন। শেখ মুজিব কিছুটা বিব্রত ও উষ্মার ভাব প্রকাশ করে বললেন, "আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সামরিক আইন জারি হবে না। উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন, যাতে ৬ দফাকে বিবেচনায় এনে কোন ফর্মুলা বের করা যায়। প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে ধারণা ছিলো না। সেনাপ্রধান সামরিক শাসন চান না বলেই আমার ধারণা ছিলো। আপনারা জানেন যে, জেনারেলরাই দেশটাকে বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।"

চৌধুরী সাহেব বললেন, "আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, গোটা পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলার যে চরম অবনতি হয়েছে তাতে আইয়ুব খান কিছুতেই পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। এর পরিণতি যা হয়েছে আমরা এরই আশঙ্কা করেছিলাম।"

আমি এ সুযোগে বললাম, "শেখ সাহেব! আপনার মনে থাকার কথা যে, মাওলানা মওদূদী আপনাকে বলেছিলেন, "গোলটেবিল বৈঠক সফল না হলে আবার সামরিক শাসনই অনিবার্য হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।"

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "আইয়ুব খান সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে না দিলে ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করার সুযোগই পেত না।"

চৌধুরী সাহেব বললেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেলো। আপনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় অন্যতম যুবনেতা ছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই চান না যে, পাকিস্তান ভেঙে যাক। সব রাজনৈতিক দলের সাথে দেশ গড়ার ব্যাপারে আপনার চিন্তার সমন্বয় কিভাবে হতে পারে সে ফর্মুলা আপনাকেই বের করতে হবে। অন্য সবাই একদিকে, আর আপনি অন্যদিকে থাকলে সঙ্কটের সমাধান কেমন করে হবে?"

শেখ সাহেব আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য অনেক অনেক শুকরিয়া জানালেন। শেখ মুজিব মৃদু হেসে একথা বলে আমাদেরকে বিদায় করলেন, "আমি মনে করি যে, ৬ দফা সবাই মেনে নিলে পাকিস্তানের ঐক্য আরও মযবুত হবে।"[১৫]

---

[১৫] অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, ৩য় খন্ড।

www.bjilibrary.com

একটি ঐতিহাসিক শাহাদাত

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ছাত্র সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৯ এর আইউব-মোনায়েম বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র ইসলামী আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত কমবেশি বিস্তৃতি লাভ করে।

টি.এস.সি. মিলনায়তনে ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর কয়েকদিন আগে এয়ার মার্শাল নূর খানের আহ্বানে 'পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিৎ' এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ছাত্র ও জনমত গঠনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। 'নিপার' পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পান তৎকালীন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের সেরা কৃতিছাত্র বগুড়া নিবাসী আবদুল মালেক (১৯৪৬-৬৯)।

টি.এস.সি. তে আয়োজিত এ শিক্ষা সেমিনারে ইসলামী ছাত্র সংঘ, ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য ছাত্র সংসগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে কলামিষ্ট ও লেখক হিসেবে খ্যাত শহীদ আবদুল মালেক তাঁর বক্তব্যে এদেশে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় উপস্থান করেন। ইতিপূর্বে নিপার মিলনায়তনেও তিনি অনুরূপ দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পেশ করেছেন।

শিক্ষানীতির উপর বলতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের এই তুখোড় ছাত্র নেতা মনীষী কার্লাইল, মিল্টনসহ বিশ্বের অনেক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তার ফলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা তাদের বক্তব্য যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে এই প্রতিশ্রুতিশীল তরুন ছাত্র নেতার উপর চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যার উদ্যোগ নেয়।

সেমিনার শেষে ছাত্রছাত্রীরা যে যার পথে চলে যান। মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক একজন মাত্র কর্মীসহ তাঁর ছাত্রাবাস ফজলুল হক মুসলিম হলের দিকে যাবার পথে আদর্শ বিরোধী ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত

www.bjilibrary.com

হন। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ছাত্র নেতা আবদুল মালেককে হকিস্টিক ও রড দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে মগজের ভিতরে রড ঢুকিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে চলে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩ দিন অজ্ঞান থাকার পরে ১৫ আগস্ট '৬৯ তারিখে প্রতিভাবান ছাত্র আব্দুল মালেক শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। করাচীর বিখ্যাত মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ড. জুম্মার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ১৬ আগস্ট ১৯৬৯ একাধিক জাতীয় দৈনিকে হত্যাকারীদের ছবি ছাপা হলেও ইয়াহিয়া সরকার তাদের কোন বিচার করেনি। সারা পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিকবৃন্দ এই প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রনেতার হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

একাদশ অধ্যায়

জামায়াত কর্মীদের রক্তে রঞ্জিত পল্টনের জনসভা

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক অনেকগুলো রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ঘোষণার মধ্যে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা ও ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের কর্মসূচির ঘোষণা দেন। একটি আদর্শবাদী ইসলামী গণতান্ত্রিক দল হিসাবে ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বার্থে জামায়াত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৮ জানুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জনসভার ঘোষণা দেয়। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ ১১ জানুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জনসভা ঘোষণা দিয়েছিল। ১৮ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর জনসভাটিকে আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে।

১৮ জানুয়ারি জনসভার প্রস্তুতি হিসাবে সারা ঢাকা শহরে পোস্টার সাঁটা হলো। বিরোধীরা তা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। আবার পোস্টার ছেপে রাতে লাগাতে হলো, লাগাতেও বাধার সম্মুখীন হতে হলো। মাইকে রোড পাবলিসিটিতেও বাধা দেয়া হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সার্বক্ষণিক পাহারায় ও ঢাকা শহর আমীর ইঞ্জিনিয়ার খুররম যাহ মুরাদের তদারকিতে ১৬ জানুয়ারি থেকে পল্টন ময়দানে বিরাট সভামঞ্চ তৈরি হচ্ছিল। বর্তমান শাপলা চত্বরের নিকটে অবস্থিত হোটেল ইডেনে জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ক্যাম্প করা হয়। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে প্রধান কয়েকটি পত্রিকা জনসভার বিজ্ঞাপন ছাপাতেও সাহস করেনি। অন্যদের পত্রিকার সহযোগিতার আশা না থাকায় খুররম যাহ মুরাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় জনসভার পূর্বদিন ১৭ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে "দৈনিক সংগ্রাম" পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। ১৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বিকেল ৩টায় পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হয়। বায়তুল

www.bjilibrary.com

মুকাররমে আযান হলে উপস্থিত নেতা কর্মীরা মাঠে আসরের নামায আদায় করে। মঞ্চের ঠিক পিছনে অবস্থিত মুঘল আমলের ছোট এক ঐতিহাসিক মসজিদে কিছু লোক জামায়াতে শরিক হন। বাদ আসর মুসল্লীরা ময়দানে ঢুকলে মূলতুবি জনসভা আবার শুরু হয়। আধা ঘন্টা পরে জনসভার প্রধান অতিথি-বক্তা আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর সভাস্থলে পৌঁছার কথা। তিনি আওরঙ্গজেব রোডস্থ জনৈক ফজলুদ্দীন শামসী নামক এক ব্যবসায়ী জামায়াত রুকনের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

প্রসংগত: উল্লেখ্য, মাওলানা মওদূদী ১৭ তারিখেই ঢাকায় এসে পৌঁছেন। বিমান বন্দর থেকে বিশাল মিছিল মাওলানাকে সংবর্ধনা জানিয়ে শহরে নিয়ে এলো। এ খবর ১৮ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে মিছিলসহ সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হলে জামায়াতের কর্মী, সমর্থক ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল।

কিন্তু কিছু চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী রাজনীতিবিদদের লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটে গুণ্ডা ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের চতুর্মুখী হামলার দরুন শান্তিপূর্ণ জনসভাও পণ্ড হয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে মাওলানা মওদূদীকে পল্টনে না আসার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটাই ছিল অত্র ভূখণ্ডে মাওলানা মওদূদীর শেষ সফর (জানুয়ারি, ১৯৭০)।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের তৎকালীন নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুর রহীম জনসভায় প্রথম ভাষণ দেন। আসরের নামাজান্তে গোলযোগ পূর্ণ অবস্থায় জনসভার সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আযম বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ অগণতান্ত্রিক ফ্যাঁসিবাদী হামলার জন্য গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসানকে দায়ী করেন। পল্টন ময়দানের চারদিকে দেয়াল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে দু'টো গেট ছিল। বাহির থেকে ইট পাথর মেরে জনসভা পণ্ড করতে না পেরে হামলাকারীরা পশ্চিমের প্রধান গেট দিয়ে আক্রমণ করতে চেষ্টা করল। জনসভার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ময়দানে প্রথমদিকে প্রবেশ করতে তারা ব্যর্থ হল। বিস্ময় ও বেদনার বিষয় যে ঘন্টা দুয়েক পরে একদল পুলিশ দেখে স্বেচ্ছাসেবকদের সরিয়ে নেয়া হলে পুলিশের সামনে দিয়ে লাটিসোটাধারী সন্ত্রাসীরা গেট দিয়ে বিনা বাধায় মারমুখী

www.bjilibrary.com

অবস্থায় ময়দানে ঢুকে গেল। পরে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক (ডি. সি) মুহাম্মদ আলী একজন কট্টর কাদিয়ানী বিধায় নিজে উপস্থিত থেকেই পুলিশ ও সন্ত্রাসীদেরকে দিয়ে এ জঘন্য হামলার নেতৃত্ব দিলেন। সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতন ও অতর্কিত আক্রমণে আবদুল মজিদ ও আবদুল আউয়াল নামের ঢাকা আলীয়া মাদরাসার দু'জন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক ও ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্মী ময়দানেই শহীদ হন এবং প্রায় শতাধিক কর্মী আহত অবস্থায় ঢাকা মেজিকেল কলেজ হাসপাতালে ও অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। মেডিকেলেও সন্ত্রাসীরা আহতদের চিকিৎসাকাজে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু ইন্টার্নী ডাক্তারদের দায়িত্ববোধ ও দৃঢ়তার সামনে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ঢাকা শহর আমীর, ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ মুরাদ এবং অধ্যাপক গোলাম আযম রাতভর আহতদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকেন যিনি নিজেও আহত ছিলেন। শীতের দীর্ঘ কালো রাতটা সাথী কর্মীদের উদ্ধার কাজে বিশ্রামহীন ছুটাছুটির দরুন অধ্যাপক সাহেব ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার মোহাম্মদ আলীর পক্ষে ভোর রাত ৪ টার পূর্বে কোন খাদ্য গ্রহণও সম্ভবপর হয়নি। রাত প্রায় ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে জামায়াতের দু'জন বিশিষ্ট সুধীকে আহত অবস্থায় দেখে অধ্যাপক সাহেব খুবই মর্মপীড়া অনুভাব করেন। তন্মধ্যে একজন তৎকালীন কায়েদে আযম (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী) কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এম আর ফাতেমী এবং অপর জন সাপ্তাহিক ইয়ং পাকিস্তান পত্রিকার সম্পাদক জনাব আযীয আহম্মদ বিন ইয়ামানী। বেধরক লাঠির আঘাতে এ দু'জন প্রবীন শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকের মাথা ফেঁটে যায়।

পরের দিন ১৯ জানুয়ারি সকালে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় আহতদের মধ্যে আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ছবি দেখা গেল তিনি হচ্ছেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের কনিষ্ঠ জামাতা তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগীয় সহকারী পরিচালক (এডিপিআই) জনাব খলিলুর রহমান। উল্লেখ্য, শের-ই-বাংলার কনিষ্ঠ কন্যা রঈসী বেগম জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণের জন্য মাঝে মধ্যে পৈতৃকভূমি চাখারে (বরিশাল) গিয়ে ছাত্রী ও মহিলা সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতেন।

www.bjilibrary.com

একটি নিয়মতান্ত্রিক দলের শান্তিপূর্ণ জনসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নারকীয় হতাহত ঘটনার নায়ক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক সরকার কোন পদক্ষেপ নিলেন না। বরং বিপরীত পক্ষে, জামায়াত ও ছাত্র কর্মী সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, রুহুল কুদ্দুস ও আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে গ্রেফতার পূর্বক বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।

পল্টনের জনসভা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী

১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভা ব্যর্থ করার জন্য আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও প্রশাসনের ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় জামায়াতের তৎকালীন প্রাদেশিক দায়িত্বশীলগণ মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনায় বসেন। জামায়াত প্রধান মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক অংগনে শেখ মুজিব ও ভূট্টোকে যথেচ্ছাচারের সুযোগ দেবে বলে আশংকা হচ্ছে। নির্বাচনী অভিযানসহ রাজনৈতিক অংগনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এ সরকার পালন করবে না এর নিশ্চিত প্রমাণ গতকালের পল্টনের জনসভা।

মাওলানা পরামর্শ দেন যে, এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনী তফশীল ঘোষণার পূর্বে বড় কোন জনসভা করার প্রয়োজন নেই। বাছাই করা আসন সমূহে ব্যাপক গণসংযোগ করুন। গণভিত্তিহীন নেতা সর্বস্ব কোন দলের সাথে নির্বাচনী ঐক্য জোট কোন সুফল আনবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার শেষকথা ও সারকথা ছিল এ পরিস্থিতিতে পিছিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ন হৃদয়গ্রাহী হেদায়াতী ভাষণে কর্মীরা সব দুঃখ ভুলে যান এবং নবচেতনায় উদ্দীপ্ত হন।

www.bjilibrary.com

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণ

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক মজলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জামায়াত আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। জামায়াতের এরূপ ইতিবাচক সিদ্ধান্তের দৃষ্টিভংগী ছিল নিম্নরূপ-

জামায়াত দেশে নেতৃত্বের পরিবর্তন চায়। জনগণের সামনে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তুলে না ধরলে এ পরিবর্তনের সূচনাই হতে পারে না। এ নির্বাচনেই নেতৃত্বের পরিবর্তন আশা করা না গেলেও দেশবাসীর নিকট জামায়াতের স্থায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করার জন্য নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।

যে কয়টা আসনে জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ঐ এলাকার জনগণের নিকট স্বাভাবিক ভাবেই জামায়াতের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌঁছাবে। নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে অনেক নতুন নির্বাচনী কর্মী পাওয়া যাবে। নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক, নির্বাচনের পর সংগঠনের বিস্তার সহজ হবে। নির্বাচনী কর্মীদের অধিকাংশই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীতে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য, নির্বাচনের সময় জনগণ যতটা আগ্রহ নিয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনে ও বিবেচনা করে অন্য সময় এমন পরিবেশ থাকে না।

১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রায় সারা বছরই নির্বাচনী ঝামেলা পোহাতে হয়। আগস্ট মাসে এ দেশে ভয়াবহ বন্যা হওয়ায় নির্বাচন দু'মাস পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নোয়াখালীসহ দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে প্রবল জলোচ্ছাসসহ ঘুর্ণিঝড়ের কারণে মহল বিশেষ থেকে পুন:নির্বাচন পিছানোর দাবি না মানা স্বত্ত্বেও এগার মাস ব্যাপী চলে নির্বাচনী অভিযান।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি

নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো নয়। নির্বাচনে প্রার্থী হবার উদ্দেশ্যে দলের মনোনয়নের জন্য কোন দরখাস্ত পেশ করার অবকাশ নেই। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দলের নিকট প্রার্থী হবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন। কোন রুকন (সদস্য) প্রার্থী হবার দাবি করলে তিনি সদস্যপদই হারাবেন। অপর দিকে সংগঠন যাকে যে পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করে, শরয়ি ওজর ব্যতীত, সে পদ নিতে অস্বীকার করাও দূষণীয়। সবাইকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্যের নিয়াতে সব কিছু করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধা ও মর্যাদা কামনা করা সুন্নাতের খেলাফ ও ইসলামের পরিপন্থী।

নির্বাচনে দাঁড় করার জন্য জামায়াত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। উক্ত পদ্ধতির রূপরেখা (out line) সংক্ষেপে নিম্নরূপ -

১। জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রতিষ্টা করে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জেলা আমীরদের নিকট নির্বাচনে প্রার্থী করবার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে। সংশ্লিষ্ট জেলা আমীর জেলার মজলিসে শূরা অথবা রুকনদের মতামত নিয়ে উপযুক্ত লোকদের তালিকা এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক মানসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য লিখে পাঠান।

২। পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এক এক আসনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বাছাই করেন।

৩। বোর্ড বাছাইকৃত ব্যক্তিদেরকে ডেকে বিস্তারিতভাবে সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের যোগ্যতার মান যাচাই করেন।

৪। পার্লামেন্টারি বোর্ড ২/৩ জনের টিম তৈরি করে প্রত্যেক আসনে গিয়ে সরেজমিনে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিতে পাঠান। টিম সংশ্লিষ্ট এলাকার রুকন, কর্মী ও বিশিষ্ট সমর্থকদের মতামত সংগ্রহ করে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে জানতে চান যে, ঐ

www.bjilibrary.com

আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কাকে অধিকতর বা সবচেয়ে যোগ্য ও উপযোগী মনে করেন।

৫। সবশেষে পার্লামেন্টারি বোর্ড যাবতীয় তথ্য যাচাই বাছাই পূর্বক যাকে সকল দিক থেকে যোগ্যতম বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি বাছাই করার বেলায় যে সব গুণাবলি অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়, তা হলো উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র, ইসলামী আন্দোলনে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম জনগণের নিকট সৎলোক হিসেবে পরিচিতি এবং সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশায় অভ্যস্ত। জামায়াতে ইসলামীর যে কোন পদে নেতৃত্ব বাছাই কালে বিশেষতঃ আভ্যন্তরীন নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় গঠনতন্ত্রের ৭২নং ধারাটি ভোটারদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াত বনাম আওয়ামী লীগ

নির্বাচনী জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যের মধ্যে যেসব পয়েন্ট জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করা হয় তা নিম্নরূপ :

১। আল্লাহর আইন ছাড়া মানুষের জীবনে শান্তি আসতে পারে না। মানুষের তৈরি মনগড়া বিধান দ্বারা দেশের সমস্যার সমাধান হবে না।

২। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। ঐ জাতীয়তা অস্বীকার করলে পাকিস্তান টিকতে পারে না। আওয়ামী লীগ ঐ জাতীয়তা অস্বীকার করে বলে তাদের হাতে পাকিস্তান নিরাপদ নয়।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অযোগ্য প্রতিনিধিগণই আসল দায়ী। সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে। জামায়াত সৎ নেতৃত্ব কায়েম করেই এ অবিচারের প্রতিকার করতে চায়।

www.bjilibrary.com

৪। আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই আছে। তাই তাদেরকে ভোট দিলে তারা পাকিস্তান শাসন করতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা নির্বাচনই করছে না। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই করবে।

৫। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে সারা পাকিস্তানে রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাঙালি জাতীয়তার শ্লোগান নিয়ে সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও পাঠানদের এলাকায় কেমন করে রাজনীতি করবে? তাই তারা একটি প্রাদেশিক দল মাত্র।

৬। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। ১৮ জানুয়ারি সন্ত্রাস করে পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভাকে পণ্ড করে একথাই প্রমাণ করেছে যে, তারা ক্ষমতায় গেলে যুলুম-নির্যাতনের সীমা থাকবে না।

শেখ সাহেব এসব কথার জওয়াবে জনসভায় বলতেন :

১। জামায়াতে ইসলামী ও গোলাম আযম আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, আমি নাকি ইসলাম বিরোধী এবং আমি নাকি এ দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চাই। আপনারা এসব মিথ্যা প্রচারে কান দেবেন না।

২। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে আছে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কোন আইন পাশ করা হবে না।

৩। ৬-দফা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য মযবুত করবে। আমরা পাকিস্তান ভাংতে চাই না বরং এর সংহতি চাই।

জনগণ এসব কথা বিশ্বাস করে অধিংকাশ লোকই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে এ আশায় যে, তাদের অধিকার বহাল হবে। তাদের সমস্যার সমাধান হবে এবং পাকিস্তানের নেতৃত্ব বাংগালিদের হাতে আসবে।

www.bjilibrary.com

ইয়াহইয়া খানের সরকার নির্বাচন এতটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যে বহু ভোট কেন্দ্রে চরম সন্ত্রাসী তৎপরতা চলেছে, বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্র থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য ঐ পরিবেশে সন্ত্রাস ছাড়াও হয়তো আওয়ামী লীগ বিরাট সংখ্যক আসনে বিজয়ী হতো। কিন্তু সন্ত্রাসের কারণে প্রায় সকল আসনই দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং বিরাট ব্যবধানে প্রতিটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জনগণ আওয়ামী লীগকে গোটা পাকিস্তানের ক্ষমতার আসনে দেখতে চেয়েছে। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কোন ইখতিয়ার জনগণ দেয়নি। জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্যই দায়িত্ব দিয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, নির্বাচনী প্রচারভিযানে আওয়ামী লীগ কোথাও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এ দেশের আদর্শ বলে ঘোষণা করেনি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি।

জাতীয় সংসদ (পাক কেন্দ্রীয় গণপরিষদ) নির্বাচন ১৯৭০

প্রেসিডেন্টে ইয়াহিয়া খান পূর্বপাকিস্তানের জনসংখ্যার আধিক্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অর্থাৎ জনসংখ্যা হিসেবে ভোটার সংখ্যা নির্ধারণ ও জাতীয় সংসদের আসন বন্টন করেন। ফলে জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ ১৬২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮ টা আসন বরাদ্দ হয়। সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৫ লাখ। ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার। প্রথম দফায় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় দুর্গত এলাকার দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালেই ২৩ বছরের পাকিস্তানে প্রথম যুক্ত ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাপ (ভাসানি) দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে নির্বাচনে অংশ নিয়ে কোন আসন পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে তাহরীক-ই-ইশতেকলাল, সিন্ধু যুক্ত ফ্রন্ট ইত্যাদি দল ও আসন শূন্য থাকে। জাতীয় সংসদে

www.bjilibrary.com

প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোর প্রার্থী সংখ্যা ও নির্বাচিত প্রার্থী সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী (বাংলাদেশ-পাকিস্তান) পূর্ব পাকিস্তান-পশ্চিম পাকিস্তান	মোট প্রার্থী সংখ্যা	নির্বাচিত
আওয়ামী লীগ	১৬২+০৮	১৭০	১৬০
পাক পিপলস পার্টি (পি.পি.পি.)	০+১১৯	১১৯	৮৮
জামায়াতে ইসলামী	৭০+৮০	১৫০	০৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৯৩+৩২	১২৫	০২
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৬৫+৩৬	১০১	০৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০+৬৯	১১৯	০৭
ন্যাপ (ওয়ালী খান)	১৭+৭	২৪	০৫
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি	৪৯+৬	৫৫	০৪
জামায়াতে হাজারভী		৫৫	০৬
মারকাজি জামায়াত			০৪
স্বতন্ত্র			১১
		সর্বমোট	৩০০
	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন		১৩

জাতীয় সংসদের একটি আসনে মোমেনশাহী জেলার নান্দাইল থেকে জনাব নূরুল আমীন এবং অপর দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে রাজা ত্রিদিব রায় বিজয়ী হন।

www.bjilibrary.com

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০

১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ঐদিন ২৭৯টি আসনে মোট ১৭৩৭ জন প্রার্থীর নির্বাচন হয়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস উপদ্রুপ এলাকায় ২০টি আসন ও জনৈক মৃত প্রার্থীর আসন মিলে ২১টি আসনে নির্বাচন হয় দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি। উক্ত ২১টি আসন এবং মহিলা সদস্যের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনে আওয়ামী লীগের দখলে চলে যায়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দল সমূহের নাম, প্রার্থী সংখ্যা ও নির্বাচিতদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক্র.	দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	নির্বাচিতদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	আওয়ামী লীগ	৩০০	২৮৮	
২	জামায়াতে ইসলামী	১৬১	১	
৩	মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১৯৮	০	
৪	মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১২০	০	
৫	মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১০৫	০	
৬	ন্যাপ (ওয়ালী খান)	১০৩	১	
৭	পাক ডেমোক্রেটি পার্টি	১৪১	০২	
৮	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টি	৫১	০১	
৯	স্বতন্ত্র	৪৪৭	৭	
	সর্বমোট	**১৬৩৮**	**৩০০**	

জামায়াতের একমাত্র বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন মাওলানা আবদুর রহমান ফকির (বগুড়া)। উল্লেখ করা যেতে পারে, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ, এস, এম, সোলায়মানের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও ভাসানী ন্যাপের একাংশ ১২ নভেম্বর সংঘটিত দূর্যোগের দোহাই দিয়ে নির্বাচন বর্জন করে।

কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতের কোনরূপ নির্বাচনী ঐক্য বা সমঝোতা ছিল না। শুধু নেযামে ইসলাম পার্টির সাথে জামায়াতের এ বিষয় মতৈক্য হয় যে, এ দু'টো ইসলামী দলের প্রার্থী এক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বতা করবে না।

www.bjilibrary.com

নির্বাচনে জামায়াতের প্রাপ্ত ভোটের পর্যালোচনা

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে, পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নেতা শেখ মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসন ব্যতীত) আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভূট্টোর পি.পি.পি. ১৩৮টির মধ্যে ৮৮টি দখল করেছে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতেই আওয়ামী লীগ বিজয়ী। জামায়াতের ইসলামীর পক্ষে একটি মাত্র আসনে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন বগুড়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা মাওলানা আবদুর রহমান ফকির। জামায়াত জাতীয় সংসদে কোন আসনে বিজয়ী না হলেও প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। ইসলামও পাকিস্তানের সংহতি প্রশ্নে দৃঢ়চেতা হাজারো জুলুম, নির্যাতন সহ্যকারী, লোভলালসা মুক্ত ১৪ লক্ষ নারী পুরুষের ভোট পায় জামায়াত এ ভূখন্ডে। সেকালে এদেশবাসীর পলিটিক্যাল সেন্টিম্যান্ট, নির্বাচনী একমুখি দৃষ্টি ভঙ্গি ও নিয়ন্ত্রণহীন রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা আছে তারা এই ভোট সংখ্যা অবশ্যই অপর্যাপ্ত মনে করবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে জামায়াতের মুবারকবাদ

গণতন্ত্রের ঐতিহ্য হলো বিজয়ী দলকে বিজিত দলগুলো মুবারকবাদ জানিয়ে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও তাই করা হয়েছিলো। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন জামায়াতের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে তাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

নির্বাচনোত্তর সমস্যা

পাকিস্তান কায়েম হবার প্রায় ২৪ বছর পর গোটা দেশে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোন একটি রাজনৈতিক দলই সমগ্র পাকিস্তানে জনগণের সমর্থন লাভ করবে না। আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়, পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র রাওয়ালপিণ্ডিছাড়া আর কোথাও আওয়ামী লীগ কোন প্রার্থীই দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। যে একটি মাত্র আসনে প্রার্থী দাঁড় করাল সেখানেও কোন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থী যোগাড় করতে পারেনি।

পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে আইয়ুব খানের প্রাক্তন দলীয় সেক্রেটারি জেনারেল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর পিপলস পার্টি প্রায় একচেটিয়া বিজয় লাভ করে। আর সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে ওয়ালী খানের ন্যাপ ও মুফতী মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়।

নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতেই আসার কথা আর পিপলস্ পার্টির প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করার কথা। গোটা পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র গণ্য করা হলে ৩০০ আসন বিশিষ্ট গণপরিষদে ১৬০টি আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগই মেজরিটি পার্টি। তাই সংগতভাবেই ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন। 'ভবিষ্যত' শব্দটি বলা এজন্য দরকার ছিল যে, সরকার গঠনের পূর্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমে গণপরিষদ হিসাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর ঐ নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ীই সরকার গঠিত হবার কথা। তখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কোন লোক গণপরিষদে না থাকায় ৫টি প্রদেশের মধ্যে শুধু একটি প্রদেশের লোক দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করা চলে না। প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, পিপলস্ পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের আর সব দলের যারা নির্বাচিত

www.bjilibrary.com

হয়েছেন তাদের মধ্যে কোন কোন দলের সাথে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন হতে পারে ?

পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর দল ছাড়া আর যে করটি দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলো তারাই শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ নিল। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মিঞাঁ মোমতায মুহাম্মাদ খান দোলতানা, ন্যাপের খান ওয়ালী খান, জমিয়তে ওলামার মুফতী মাহমুদ ও জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের শাহ আহমদ নূরানী ঢাকায় এসে শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান যাবার দাওয়াত দিলেন। তারা শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার সাথে সরকারে যোগদান করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করলেন। তারা এ নিশ্চয়তাও দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য যেসব দল নির্বাচনে আসন লাভ করেছে তারা সবাই ভূট্টোর বিরোধী।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে মাওলানা নূরানী আমার বাড়ীতে এসে দেখা করলে আমি জানতে চাইলাম যে, শেখ মুজিব যদি করাচি, পিণ্ডি ও লাহোরে যান তাহলে জনসমর্থন পাবেন কিনা ? জনগণ ভূট্টোর চেয়ে শেখ মুজীবকে পাকিস্তানের নেতা হিসাবে বেশি পছন্দ করবে কিনা ? তিনি জোর দিয়ে বললেন, "নির্বাচনে কম আসন পেলেও জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী দল, এমনকি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠনগুলোর সমর্থন যে বিরাট সংখ্যক ইসলামপন্থী জনতা রয়েছে তারা সবাই ভূট্টোকে ইসলাম বিরোধী মনে করে। ভূট্টোর নেতৃত্ব থেকে বাঁচার জন্য সবাই শেখ মুজিবকে চায়। আমরা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।" একথা শুনে আমিও তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিলাম।

কিন্তু বামপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে দিল না। তারা ভয় দেখাল যে, সেখানে গেলে শেখ মুজিবকে হত্যা করে ফেলবে অথবা চাপ দিয়ে এমন সব দাবি আদায় করে নেবে যার ফলে ৬-দফা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে সামরিক শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সবকিছুই করবে।

শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূট্টো বিরোধী নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় ভূট্টো ধারণা করলেন যে, শেখ মুজিব

www.bjilibrary.com

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কারণে জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাতে গ্রহণ না করে সে উদ্দেশে ভূট্টো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। শেখ মুজিবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভূট্টোই সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্নতার উদ্যোগ নেন। তিনি শেখ মুজিবের উদ্দেশে বলেন, "এধার হাম, ওধার তুম"।

মিঃ ভূট্টো এক রাষ্ট্রে দু'টো মেজরিটি পার্টির অদ্ভুত তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি দাবি করেন যে, শেখ মুজিব পূর্বে এবং তিনি পশ্চিমে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। এ দাবি দ্বারা তিনি সুস্পষ্টভাবেই পাকিস্তানকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নিলেন। ভূট্টোর এ দাবি সমস্যা আরও জটিল করে তুললো।

এ সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আমি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বারবার ভূট্টোর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকলাম এবং শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বেই শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার দাবি জানাতে লাগলাম। আমার এ বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষমতা হাতে পেলে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের জনসমর্থন পাবেন এবং ভূট্টোর বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র থেকে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।

ইয়াহইয়া খান ১৯৭১ এর ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করলেন। ভূট্টো বিরোধী দলের ভূমিকার বদলে ক্ষমতায় অংশীদার হবার হীন উদ্দেশে হুমকী দিলেন যে, তার সাথে শেখ মুজিবের বুঝাপড়ার আগে গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি যোগদান করবেন না। এমনকি সন্ত্রাসী ভাষায় তিনি ঘোষণা দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সদস্য ঢাকা রওনা হতে চেষ্টা করলে করাচি বিমান বন্দরে তার পা ভেংগে দেয়া হবে।

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন এবং শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে গিয়ে করাচি থেকেই লারকানায় যেয়ে ভূট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে ১লা মার্চ ঘোষণা করলেন যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের অধিবেশন মুলতবি করা হলো। এখান থেকেই সংকট চরম রূপ লাভ করল।

www.bjilibrary.com

ইয়াহিয়া খানের গড়িমসি

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর কোন দল যদি পার্লামেন্টের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান অবিলম্বে ঐ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ৩০০ আসনের পার্লামেন্টে ১৬০টি আসনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়নি।

এর কারণ যদি এটা হয়ে থাকে যে, '৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণে ইয়াহিয়া খান যে কার্যধারা ঘোষণা করেছেন, সে অনুযায়ী প্রথমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা গণপরিষদ হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালনের পরই সরকার গঠনের সুযোগ আসবে। তাহলেও তো শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশে গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে বিলম্ব করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু নির্বাচন শেষ হলো ৭ ডিসেম্বর, আর ইয়াহিয়াহ খান গড়িমসি করে গণপরিষদের অধিবেশন ডাকলেন ৩ মার্চ। তাও আবার ভুট্টোর দাবির প্রেক্ষিতে ১ মার্চ এ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করে ইয়াহিয়াহ খান তাঁর গড়িমসির মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জামায়াতে ইসলামী। নির্বাচনের পর জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানকে বিজয় অভিনন্দন জানান। এছাড়া তিনি দলীয় প্রতিশ্রুতি মুতাবিক দেশের শাসনতন্ত্র রচনা ও সম্ভাব্য আওয়ামী লীগ সরকার যাতে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে সে ব্যাপারে বিরোধী দল হিসেবে জামায়াতের পূর্ণসহযোগিতা দানের কথা ব্যক্ত করেন।

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জারিকৃত লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কস এর আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিব ঘোষণা

www.bjilibrary.com

করলেন, এ নির্বাচন তাঁর ৬ দফার রেফারেন্ডাম। ফলে ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত নিজ নিজ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে লালিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও ভূট্টোর মধ্যে পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে প্রকাশ্যে সদালাপ, সংলাপ চললেও ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্র এবং স্নায়ু যুদ্ধ চলতে থাকে।

নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে একরাখা কিংবা দুই অঞ্চলকে পৃথক পূর্বক দু'টো রাষ্ট্রে পরিণত করা শেখ মুজিবের ভূমিকার উপর প্রধানত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

নির্বাচনের পূর্বে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট আইউব ও ইয়াহিয়া খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনের পরে তিনি ৬ দফা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। নির্বাচনের পরে উভয়ে ক্ষমতার মসনদের নেশায় মুজিব-ভূট্টো এক হয়ে যান এবং নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যান। কেননা, দুই দেশ না হলে দুই নেতার নেতৃত্ব টিকে না। নিজ নিজ দলীয় প্রভাব অঞ্চল বিশেষে সীমিত হবার দরুন একই পাকিস্তানের উভয়নেতা সরকার প্রধান হতে পারে না। তার সাথে অপর এক আগ্রাসী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মহাপরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর নয়। ১৯৬৫ সালে মাত্র দু'সপ্তাহে ভারত বুঝতে পেরেছিল, প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সকল দিক দিয়ে কয়েকগুণ শক্তিশালী হলেও সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না, তখন থেকে তারা রাজনৈতিক ফন্দি আঁটতে থাকে।

প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসাত্মক পদক্ষেপ

১৯৭০ এর নির্বাচনের সময় থেকে আওয়ামী লীগ তার প্রতিপক্ষ প্রধানত জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রসংঘ ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এবং মুসলিমলীগ, পি.ডি.পি. ও নেজামে ইসলামী পার্টিকে দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য নৃশংস ও নির্মম অভিযান শুরু করে। নির্বাচনের চরম বিপর্যয়ের পরে অন্যান্য পরাজিত দলগুলোর সংগঠন অনেকটা নিস্তেজ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও দলগতভাবে জামায়াত আদর্শিক ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে এ আপোষহীন দলটিকে ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তি প্রধান টার্গেট বানায়।

www.bjilibrary.com

নির্বাচনের পরে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে গেল। প্রথমদিকে সামরিক শাসনের সাথে অসহযোগিতায় কোন কোন স্থানে আওয়ামী লীগের সাথে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীও সম্মিলিতভাবে মিটিং ও মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। বাগেরহাটের সাবেক এম.পি. মুফতি মাওলানা আবদুস সাত্তার, বরিশাল জেলা জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা মীম ফজলুর রহমানসহ আরো অনেকেই এর সাক্ষী।

দিনের বেলা সম্মিলিতভাবে মিছিল মিটিং চলতো, কিন্তু রাতের বেলা কোন অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা (কোথাও বা নকশাল নামে) জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের নির্মমভাবে হত্যা করত। খুলনার কাজদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক কাজী শহীদুল ইসলাম ও খুলনার মহেশ্বরপাশা প্রাইমারী স্কুলের নিবেদিত প্রাণ জামায়াত কর্মী এখতিয়ার হোসাইনকে তার নিজ গৃহে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন প্রাইমারী স্কুলের একজন জনপ্রিয় আদর্শ শিক্ষক ও খুলনা প্রাইমারী শিক্ষক সমিতির একজন কর্মকর্তা। খুলনা দৌলতপুর থানার প্রভাবশালী ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে হত্যা করে লাশ মাথা কাটা অবস্থায় রাজপথে রেখে যায়। খুলনা খালিশপুরের উর্দুভাষীদেরকে হত্যা করে গাড়ি ভর্তি লাশ রূপসা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী থেকে এদেশীয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে অবাঙগালী উর্দুভাষীদের নির্মম নির্যাতন শুরু হয়। চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে উর্দুভাষী সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার খুরশিদ আহমদকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

নির্বাচন পরবর্তী পৌনে তিন মাস

ইয়াহিয়া খানের পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম দায়িত্ব ছিলো ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্যগণ প্রথমে গণপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পর গণপরিষদের সদস্যগণ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বহাল

www.bjilibrary.com

থাকার কথা। শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়ে গেলেই নির্বাচিতদের হাতে সরকারি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে বলে সবারই জানা ছিলো।

এ সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচনের পরপরই গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা ইয়াহিয়াহ খানের প্রথম কর্তব্য ছিলো। অধিবেশন বসলে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চলতো। কিন্তু এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বদলে ইয়াহিয়াহ খান কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়।

৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, আর ১১ জানুয়ারি (নির্বাচনের ৩৩ দিন পর) ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে ঢাকায় আসেন। গণপরিষদ বসার আগে প্রাথমিকভাবে মতবিনিময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকলে এতো বিলম্বে কেন এলেন? ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগকালে তিনি শেখ মুজিবকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে তাকে আশ্বস্ত করে গেলেন, যাতে তিনি আর বেশি হৈ-চৈ না করেন। কিন্তু দেশবাসী জানতে পারলো না যে, মুজিব-ইয়াহিয়া কি বিষয়ে ২/৩ দিন আলোচনা করলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার জন্য ঢাকা আসার কোন প্রয়োজন ছিলো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নেতা হিসেবে এ কথা রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই দিতে পারতেন। শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে এ ঘোষণার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

যে নেতারা শাসনতন্ত্র রচনায় নেতৃত্ব দেবেন তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের প্রয়োজন থাকতে পারে। এ বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের আসার প্রয়োজন কী? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দরকষাকষির কোন কারবার ছিলো।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পঞ্চাশ দিন পর ভুট্টো ২৭ জানুয়ারী ঢাকায় এলেন। এখানেও প্রশ্ন উঠে, এতো বিলম্বে কেন? তাদের তিন দিনব্যাপী আলোচনার বিষয় ও ফলাফল দেশবাসী জানতে পারলো না। সফল যে হয়নি তা বুঝা গেলো।

শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব গণপরিষদের, ইয়াহিয়া খানের নয়। তাঁর দায়িত্ব গণপরিষদে অধিবেশন আহ্বান করা। নেতাদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করাও তাঁর জন্য দূষণীয় হতো না, যদি নির্বাচনের পরপরই তিনি তা করতেন। কিন্তু তিনি বার বার ভুট্টোর সাথে এতো সাক্ষাৎ কেন করলেন? ১৪ জানুয়ারী ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে তিনি ১৭ জানুয়ারি লারকানায় যেয়ে

www.bjilibrary.com

ভুট্টোর মফস্বলের বাড়িতে সাক্ষাৎ করলেন। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর করাচীতে এবং পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্যার কোন সমাধান বের করলেন, না সমস্যা বাড়ালেন?

ইয়াহিয়া খানের ভূমিকা আগাগোড়াই ভয়ানক আপত্তিকর। নির্বাচনের পূর্বে শেখ মুজিবের ৬ দফা LFO- এর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ৬ দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট নেবার সুযোগ দিলেন কেন? সুযোগ দিয়ে ম্যান্ডেট নেবার ব্যবস্থা করার পর তা মেনে নিলেন না কেন? নির্বাচনের পর গণপরিষদ আহ্বানে বিলম্ব করলেন কেন ? শেখ মুজিবের সাথে ও ভুট্টোর সাথে আলাদা আলাদা বৈঠকের উদ্দেশ্য কি তাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোন নেক নিয়ত ছিলো ? নির্বাচনের পৌনে তিন মাস পরও গণপরিষদ না ডেকে শেখ মুজিবের সাথে ২৬ ফেব্রুয়ারি আবার কেন সাক্ষাৎ করলেন?

ভুট্টোর ভূমিকা সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ছিলো। গণতন্ত্রের সর্বনিম্ন মানও তিনি রক্ষা করেননি। বিশেষভাবে '৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি করাচীতে এক কর্মী সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে ক্ষমতার তিনটি খুঁটি রয়েছে- আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনী। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকেও এভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে না। গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত সরকারের অধীনে সেনাবাহিনী সরকারি কর্মচারী মাত্র। এ দ্বারা তাঁর মনের এ গোপন কথাও বের হয়ে গেলো যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি ও সেনাপ্রধান ঐক্যবদ্ধ আছেন।

www.bjilibrary.com

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনোত্তর প্রথম বৈঠক

১৯৭১-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিয়মিত বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর এটাই ছিল শূরার প্রথম বৈঠক। সারা পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে এটাই প্রথম নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার ২৪ বছর পর সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে প্রাদেশিক পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে জামায়াত পশ্চিম-পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে করেনি।

কেন্দ্রীয় মজিলসে শূরার বৈঠকে প্রথমেই নির্বাচনের পর্যালোচনামূলক আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন:

"নির্বাচনী ফলাফল থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। মুসলিম জাতীয়তার যে ভিত্তিতে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন দু'টো ভূখন্ড মিলে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিলো, পাকিস্তানী শাসকরা ঐ ভিত্তিটিই ধ্বংস করে দিয়েছে। পূর্বপাকিস্তানে এখন বাঙালি জাতীয়তা ঐ শূন্যস্থান দখল করেছে। আমি নিশ্চিত যে, নির্বাচনের ফলে উভয় অঞ্চলে নতুন যে নেতৃত্ব জেগে উঠেছে তারা দু'অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেবে না অথবা রাখতে পারবে না।

আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই মাওলানা মওদূদী সভাপতির আসন থেকে মন্তব্য করেন, "পশ্চিমপাকিস্তানও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্ত হয়ে গেলো। পাঞ্জাব ও সিন্ধু একদিকে, আর সীমান্ত ও বেলুচিস্তান আর একদিকে।" এ কথা বলে মাওলানা থামলে আমি বললাম, "পশ্চিমপাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে একসাথে থাকায় তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া মোটেই সহজ নয়। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে রোধ করা অসম্ভব মনে হচ্ছে।"

মাওলানা প্রশ্ন করলেন, "এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর করণীয় কিছু আছে কিনা?"

জওয়াবে আমি বললাম, "যদি জাতীয় সংসদে জামায়াতের অন্তত ১০ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি পার্টি গঠন করা সম্ভব হতো তাহলে বিচ্ছিন্নতা রোধ করার

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্যে কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ পাওয়া যেতো। এ পরিস্থিতিতে মজলিসে শূরার নিকট আমার পরামর্শ এই যে, যদি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্বপাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবার কার্যক্রম শুরু করে তাহলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধীতা করার প্রয়োজন নেই। জামায়াতের আসল যে উদ্দেশ্য, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সে উদ্দেশ্যে যা করণীয় তা করতে পারবে।"

আমি আরও অগ্রসর হয়ে বললাম, "পূর্বপাকিস্তান পশ্চিমের সাথে যুক্ত থাকবে না পৃথক হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হলে এর পূর্ণ এখতিয়ার জামায়াতের পূর্বপাকিস্তান শাখাকে দেওয়া হোক। এ বিষয়ে পূর্বপাকিস্তান শাখা সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তা কেন্দ্রীয় জামায়াত যেন অনুমোদন করে। ওখানকার সার্বিক পরিস্থিতি বাইরে থেকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।"

আমার এ গুরুতর প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মাওলানার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে এ প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করে খুবই ধীরস্থিরভাবে আলোচনা হল। আমার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে কিছুটা আবেগ প্রকাশ পেলেও তাঁরা কেউ আবেগতাড়িত হননি। তাঁরা আমার আন্তরিকতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সর্বশেষে মাওলানা বললেন, "শেখ মুজিব তো এখনো স্বাধীনতা দাবি করেননি, পূর্ণআঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়েই তিনি ৬ দফা পেশ করেছেন। জামায়াতের পূর্বপাকিস্তান শাখার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়েছে। মজলিসে শূরার সদস্যগণ একমত হলে আমরা ঐ বিষয়ে শুধু স্বায়ত্তশাসন নয়; পূর্ণস্বাধীনতাই দিতে পারি।" মাওলানার এ কথার পর এক বাক্যে সবাই সমর্থন জানালেন।"[১৬]

[১৬] অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, ৩য় খন্ড।

www.bjilibrary.com

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে যেভাবে সামনে এগুবার কথা ছিল তা হয়নি। পাকিস্তানী শাসক মহল অবিবেচক ও স্বৈরচারী কায়দায় পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে তাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার চেষ্টা চালায়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন সব মানুষ। ১৯৪৭ সালে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো বরকত, সালাম জব্বার প্রমুখ অমর সন্তানদের শাহাদাতের মাধ্যমে। ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য রক্তদান করতে হলো।

পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসকবর্গের রাজনৈতিক চরিত্রে যেমন গণতন্ত্র ছিল না, তেমনি দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে কোন সুবিচার ছিল না। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পর যুগ-যুগান্তর ধরে শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত বাংলাদেশ অঞ্চলের জনগণের প্রতি যে বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিল ঐ শাসকরা তা দেয়নি।

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এমন কোন বিধান সন্নিবিষ্ট করা হয়নি যার ফলে দুই বিচ্ছিন্ন অংশের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে উন্নতি করা সম্ভবপর হয়। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে যদিও বলা হয় দেশের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় অংশের সমান অধিকার দেয়া হবে, কিন্তু কীভাবে সে ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন নির্দেশনা ছিল না। এছাড়া এ বিধান অনুযায়ী কাজ চলছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে দুই প্রদেশের ভিতর শাসনতান্ত্রিক সুবিধাদী সমীকরণের যে সদিচ্ছা তা প্রায় কাগজে কলমেই রয়ে গেল। যার ফলে দুই প্রদেশের মধ্যে পাহাড়সম বৈষম্য গড়ে উঠল।

আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তান বঞ্চনার শিকার হয়। পূর্বপাকিস্তান শিল্প-কারখানার দিক দিয়ে অনুন্নত থাকায় এবং পশ্চিম পাকিস্তান এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ায় পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের

www.bjilibrary.com

মধ্যে লেন-দেনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া পূর্বপাকিস্তানের সম্পদ উন্নয়নেও নজর দেয়া হয়নি। অথচ পূর্বপাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো।

পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দুর্দশা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের মানুষদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল। যা দুই অংশের ঐক্যের বুনিয়াদকে দ্রুত দুর্বল করে তুলছিল, অবশেষে তা ধ্বসে পড়ে ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান ভেংগে, পূর্বপাকিস্তান রূপান্তরিত হলো স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে।

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তান ভেংগে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর লিখিত "পলাশী থেকে বাংলাদেশ" বইতে যে সমস্ত কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন তা নিম্নরূপ-[১৭]

সরকারের ভ্রান্তনীতি

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনী সরকারি ও বিরোধী দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার যদি ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন, মুসলিম জাতীয়তাকে শুধু শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার না করতেন, গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলতেন এবং অর্থনৈতিক ময়দানে ইনসাফের পরিচয় দিতেন, তাহলে জাতিকে যে ধরনের সংকটের মুকাবিলা করতে হয়েছে তা সৃষ্টি হত না। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সকল ক্ষেত্রেই ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করে দেশকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেন।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করতে অস্বীকার করা এবং বাংলাভাষীদের উপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার ভ্রান্তনীতিই সর্বপ্রথম বিভেদের বীজ বপন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীরা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলেনি। তারা উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছিল।

এ দাবি জানাবার আগেই জনসংখ্যার বিচারে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা সরকারের কর্তব্য ছিল। অথচ দাবি জানাবার পর এটাকে 'প্রাদেশিকতা' বলে গালি দিয়ে সরকার সংগত কারণেই বাংলাভাষীদের আস্থা হারালেন। ভাষার দাবিটিকে সরকার এমন রাষ্ট্রবিরোধী মনে করলেন যে, গুলি করে ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে চাইলেন। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার জন্ম দেয়।

---

[১৭] *অধ্যাপক গোলাম আযম, পলাশী থেকে বাংলাদেশ।*

www.bjilibrary.com

গণতন্ত্রের প্রশ্নে

গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে টিকে থাকার ষড়যন্ত্র করলেন। শাসনতন্ত্র রচনায় গড়িমসি করে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকলেন। ১৯৫৪ সালে পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারি মুসলিম লীগ দলের ভরাডুবির পর কেন্দ্রে ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়। পরিণামে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হয়।

আইয়ুব খান গণতন্ত্র হত্যা করার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জনগণকে সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় এবং আসল ক্ষমতা আইয়ুব খানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে, আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় এবং এর পরিণামে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব দ্রুত বেড়ে যায়।

অর্থনৈতিক ময়দানে

শাসন ক্ষমতায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং ক্ষমতাসীনদের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার দরুন শিল্প ও বাণিজ্য নীতি প্রণয়নে পূর্বপাকিস্তানের প্রতি সুবিচার হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। মন্ত্রিসভায় পূর্বপাকিস্তান থেকে গণপ্রতিনিধি গ্রহণ করার পরিবর্তে সুবিধাবাদীদেরকেই গ্রহণ করা হতো। এর ফলে অর্থনৈতিক ময়দানে পূর্বপাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অক্ষম হতেন। এভাবে গণতান্ত্রিক সরকারের অভাবেই পূর্বপাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও আস্থা হারাতে থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমান ও আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড এর মধ্যকার আলোচনা

১৯৭০ এর নির্বাচনের পর দেশে এক রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছিল। সময়টা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বিজয়ী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কিংবা গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এমনি এক সময়ে ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে আসেন আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড। তাদের মধ্যে প্রায় ঘন্টাব্যাপী আলোচনা হয়। আলোচনাটি ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ। পুরো

www.bjilibrary.com

আলোচনা তারবার্তার মাধ্যমে ফারল্যান্ড সেদিনই ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেন। পাঠকবর্গের জন্য এখানে তা তুলে ধরা হলো :

১। *ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখ সকাল নয়টায় আমি (জোসেফ ফারল্যা) শেখ মুজিবরের সঙ্গে তাঁর ঢাকার বাসভবনে দেখা করতে যাই। তিনি গাড়িতেই আমাকে রিসিভ করেন এবং তাঁর বাসা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যান। এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, তিনি আমাকে দেখে খুশি হয়েছেন এবং আমাকে দারুণ আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। সামাজিক কুশলাদি বিনিময়ের পরে মূল আলোচনা শুরু হলো। সামাজিক কুশলাদির পর তাঁর এই বক্তব্যও ছিল, 'আমাদের এই মিটিংটা হচ্ছে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে।' আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী অবস্থা মনে হচ্ছে আপনার?' এই কথা বলে তিনি সরাসরি মূল আলোচনায় প্রবেশ করলেন। আমি উনাকে বললাম, একজন কৌতূহলী দর্শক হিসাবে সব ঘরানার সংবাদপত্র থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিয়ে যে সংবাদ দেখি তাতে আমি উদ্বিগ্ন। তবে আওয়ামী লীগের প্রধান হিসাবে আপনিই বরং বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা ভালোভাবে করতে পারবেন। আপনার কাছে সেটা শুনতে চাওয়াটাই বেশি সঙ্গত।*

২। *শেখ মুজিব বললেন, তাঁর মতে, বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা একমাত্র ভুট্টোর কুমন্ত্রণার কারণে হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন না। বরং ভুট্টো এমন একটা অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন, যা তৈরি হয়েছে সেইসব মানুষের দ্বারা যারা আইয়ুবকে সমর্থন করেছিল। তিনি বলেন, ভুট্টো সম্ভবত নিজের ইচ্ছায় চলছেন না। কারণ তাঁর যথেষ্ট সংগঠিত কোনো রাজনৈতিক দল নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি কিছু সামরিক অফিসারের সাহায্য ও নেতৃত্ব ছাড়া ভুট্টো অচল। ঠিক এই কারণেই ভুট্টো সামরিক প্রস্তুতির জন্য মাত্রাতিরিক্ত খরচ করার পক্ষে।*

৩। *ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন কি-না আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি মনে করেন ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন। কারণ আওয়ামী লীগ ভুট্টোকে, তাঁর ভাষায় 'চেপে ধরেছে' বলে মনে করেন তিনি। যদিও তিনি বললেন, তিনি অনুমান করছেন ভুট্টো, যাকে তিনি 'হাদা গরু' বলে অভিহিত করেন, সেই ভুট্টো তাঁর দলের লোকদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষেই নিয়ে যাবেন। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের জীবন সংগ্রাম শুরু হবে।*

৪। *আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, পিপিপি এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অবস্থানের দূরত্ব কতটুকু? তিনি বললেন, বিশাল দূরত্ব এবং এই দূরত্ব এতই বিশাল যে, কোনো মতৈক্যে আসা রীতিমতো অসম্ভব। আরো বিশেষ করে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ এবং সেই দলের নির্বাচিত নেতা*

www.bjilibrary.com

হিসাবে তিনি ছয় দফা প্রশ্নে কোনো আপোস করবেন না এবং তা করতেও পারেন না। এই ছয় দফাকে তিনি প্রায় এক দশক ধরে নিজের জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। তিনি বললেন, ভুট্টো চান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মনোনীত করার অধিকার পেতে। শেখ মুজিব বললেন, ভুট্টোর পররাষ্ট্রনীতি, তাঁর মতে যাচ্ছেতাই, ভুট্টোর কমিউনিস্ট চীনের প্রতি রয়েছে প্রবল অনুরাগ এবং ভারতের প্রসঙ্গে তিনি একরোখা। শেখ মুজিব এরপরে তাঁর কমিউনিস্টবিরোধী অবস্থানের কথা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন চীন এই অঞ্চলের জন্য কী বিপদ সৃষ্টি করছে। ভারত প্রশ্নে তিনি মনে করেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অবশ্যই ঐতিহাসিক ভালো সম্পর্ক পুন:স্থাপন করা দরকার এবং আগের বাণিজ্য রুটগুলো চালু করা দরকার। তিনি এই মত দিলেন, ভুট্টো যা চান এবং বাংলাদেশের মানুষ যা দাবি করে এই দুই বিষয়ের পার্থক্য অনতিক্রম্য।

৫। এরপরে তিনি পুরো ১০ মিনিটের একটা ভাষণ দিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতার অংশ হতে পারত। তিনি বললেন, "তাঁর দেশের" জনগণ তার পিছনে আছে, তিনি অল্প কিছু ছোট ছোট হার্ডকোর কমিউনিস্টদের দৌড়ের ওপর রেখেছেন। ভাসানীর ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। তিনি বললেন, কমিউনিস্টরা তাঁর দলের তিনজন নেতাকে খুন করেছে। তিনিও পাল্টা প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রত্যেক নিহত আওয়ামী লীগ নেতার জন্য কমিউনিস্টদের তিনজনকে খুন করবেন এবং 'এইটাই আমরা করেছি'। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের হাতে যে কয়দিন জেলে কাটিয়েছেন সেটা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি ঐক্য রক্ষা করা না-ই যায়, তবে 'বুলেটের মুখে দাঁড়াতে' তাঁর কোনো ভয় থাকবে না। তিনি নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন, তিনি জেলের ভয়ে ভীত নন, এমনকি তাঁকে 'টুকরো টুকরো করে ফেললেও' জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। তিনি স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকলেন, তিনি বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, বরং তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে এমন একটি কনফেডারেশন, যেখানে বাংলাদেশের জনগণ বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ২০% নয় বরং একটা ন্যায্য হিস্যা পাবে। যেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ৬০% আসে সে অংশকে কীভাবে ইসলামাবাদ ভিখিরির মতো এই সামান্য ভাগ ছুঁড়ে দেয় ?

৬। বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে শেখ সাহেব বললেন, পাকিস্তান এই মুহূর্তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভয়াবহ সংকটে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কার্যত শূন্য। এটা অবশ্য বাংলাদেশের জন্য শাপেবর হয়েছে। কারণ তাঁর দলকে বশে আনার জন্য আর্থিক সঙ্গতি পশ্চিম পাকিস্তানের নেই। তিনি আরো বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান জাপানের কাছে একটা বড় ধরনের সাহায্য চাচ্ছে, সেটা যদি তারা পেয়ে যায় তবে তারা আমাদের অবস্থা খারাপ করে দেবে।'

www.bjilibrary.com

সেই মুহূর্তে তিনি স্পষ্টতই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমেরিকা এবং কনসোর্টিয়াম কি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সাহায্য করবে ? আমি তাঁকে বললাম, একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আগ্রহী। তবে আমাদের এবং কনসোর্টিয়ামের আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে দু'টো সীমাবদ্ধতা আছে :

১) আর্থিক সাহায্যের জন্যে যে ফান্ড এখন আছে, তা আগের তুলনায় সীমিত।

২) আর্থিক সাহায্যের প্রজেক্টগুলো সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা হয় এবং মনিটর করা হয়। বিশেষ জোর দেয়া হয় সাহায্যগ্রহীতা দেশের জনশক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ফান্ডের ব্যবহারের বিষয়ে দক্ষতা জ্ঞান এবং প্রকল্পের প্রশাসনিক দিক সামলানোর ক্ষমতার ওপরে।

আমি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ফান্ডের অপ্রতুল ব্যবহার এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবের বিষয়ে আমার উদ্বেগের কথা তাঁকে জানালাম।

৭। এরপরে শেখ মুজিব দীর্ঘ সময় নিয়ে জানালেন, কেন পূর্ব পাকিস্তান একটা টেকসই অঞ্চল হিসাবে দাঁড়াতে পারে। তিনি গ্যাসের বিশাল রিজার্ভের কথা জানালেন, যা শুধু একটা পেট্রো-কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য স্থানীয়ভাবেই ব্যবহার করা যাবে তাই নয় বরং ভারতেও রপ্তানি করা যাবে। তিনি বললেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুই বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বোরো ধান চাষাবাদ হবে তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানের অবিশ্বাস্য জন্মহারের কথা মনে করিয়ে দিলাম, তখন তিনি বললেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে। আজকে যেভাবে পরিবার ছোট করার জন্যে চাপ দিতে হচ্ছে, সেটা না করেই তিনি মানুষকে পরিবার ছোট রাখার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

৮। খুব সিরিয়াস মুডে শেখ মুজিব বললেন, যদিও তিনি বলতে চাচ্ছিলেন না, তবুও তাঁর বলা উচিত, আমেরিকার একটা বদনাম আছে- সে মতের অমিল হলেই তার বন্ধুকে ত্যাগ করে। তিনি মনে করেন, এই অঞ্চল নিয়ে মতের অমিল হবেই, তখন আমেরিকা সত্যিকারের পরীক্ষায় পড়বে। আমি শেখ মুজিবকে বললাম, আমি মনে করি তাঁর বক্তব্যটা খুবই যুক্তিযুক্ত, তবে আমেরিকা তার বন্ধুদের সাহায্যের জন্য কোন ভূমিকা নেয় সে বিষয়ে আরেকদিন আলাপ করব। আমি আরো যুক্ত করলাম, আমরা এই বিশ্বাস থেকেই পাকিস্তানকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি দিয়ে সাহায্য করেছি। শেখ সাহেবের কৌশলী উত্তর ছিল, আমাকে যদি আমেরিকা এক বিলিয়ন ডলার দিত, আমি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আর গণতন্ত্রের শক্ত দেয়াল তৈরি করতাম।

www.bjilibrary.com

৯। এইসব আলাপের পিছনে শেখ সাহেব যা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কী ? সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে আমি আমেরিকান নীতি যা স্টেট ৩৫৫৩৪-এ উদ্ধৃত আছে, তা ব্যাখ্যা করলাম এবং আমি এমনভাবে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কথা তুললাম না যেন কোনো অবস্থাতেই মনে না হয়, বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে আমেরিকার অবস্থান পরিবর্তনীয় নয়। আমি যদিও এটা বলতে ভুললাম না যে, বৈদেশিক সাহায্য প্রাচুর্যের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার নয়, যা থেকে অসীম আর্থিক সাহায্য পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধানের জন্য বেরিয়ে আসবে। এরপরে শেখ সাহেব প্রশ্নের আকারে না বলে বললেন, বাংলাদেশের সকল বন্ধুদের উচিত তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করা, যারা অস্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে আমার 'দেশের জনগণকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে চায়।' তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘসময় ধরে বিশ্ব রাজনীতির ছাত্র হিসাবে এটা জানেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য সাহায্যদাতা দেশগুলোর পশ্চিম পাকিস্তানকে এই ধরনের চাপ দেয়ার ক্ষমতা আছে, যদি তারা সেটা চায়। যেহেতু কোনো প্রশ্ন করা হয়নি তাই তার উত্তর দেয়া থেকে আমি বিরত থাকলাম। তবে এই কথার একটা উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আমরা যে সময়ের কথা চিন্তা করি তার আগেই। তাই এ নিয়ে সিরিয়াসভাবে ভাবা দরকার। আমি ধারণা করেছিলাম শেখ সাহেব স্বীকৃতির প্রসঙ্গটা তুলবেন, যেহেতু তিনি এই বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছিল, যা আমি রিপোর্টে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি তা করেননি।

আমি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আবার কথা বলব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করলাম। যেহেতু এখন পর্যন্ত অনেক বিষয়ই অপরিষ্কার আছে, যা সামনের দিনগুলোতে পরিষ্কার হবে। মুজিব বললেন, তিনি আজকের মিটিংটার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন এবং যেকোনো সময়ে পরবর্তী মিটিং-এ বসতে পারলে খুশি হবেন। এছাড়াও তিনি শুধু আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথাই নিশ্চিত করলেন না, তিনি বাংলাদেশ ও আমেরিকার জনগণের বন্ধুত্বের কথাও নিশ্চিত করলেন। এই আলোচনাটা এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় ধরে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে চলে এবং শেখ মুজিব আমাকে তাঁর অনুরক্ত সমর্থকদের মধ্য দিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।[১৮]

---

[১৮] মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'৭১ - পিনাকী ভট্টাচার্য।।

www.bjilibrary.com

ঢাকায় আহুত গণপরিষদ মুলতবির প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনেক বিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার ঢাকায় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার ঘোষণা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু ক্ষমতালোভী ভুট্টো দু'দফা বিপদের আশংকা করলেন। প্রথমত: শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রীত্বের বিপক্ষে ভূমিকা রাখলে ঢাকায় নাজেহাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত: তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন নাকচ হয়ে যাবে। তিনি ঢাকায় আহুত এ সংসদ অধিবেশনকে 'কসাইখানা' বলে অভিহিত করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ৩রা মার্চ ঢাকায় আহুত গণপরিষদ বৈঠক অন্যায় ও একতরফাভাবে মুলতবি করার দাবি জানান। পরদিন ১লা মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর দাবি মেনে নিয়ে বৈঠক মুলতবি করে দেন। এ ব্যাপারে মেজরিটি পার্টির নেতার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা ও আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা হল না। ১লা মার্চ দুপুরে রেডিও মারফত অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংসদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

৭ মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ সাহেব ঘোষণা দিলেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এরপর থেকেই উত্তেজিত বাংলাদেশীদের মধ্যে স্বাধীনতার বাতাস তীব্র গতিতে বইতে লাগলো। স্বাধীনতার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হলো। ৯ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় মাওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রাম সূচনার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও ইতোমধ্যে ভুট্টোর নীতির তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামীসহ জাতীয় পরিষদের তিনশ' নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে দুশো জন শেখ মুজিবর রহমানের ৪ দফা দাবি সমর্থন পূর্বক তাকে অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠন করার স্বপক্ষে দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করেন।

www.bjilibrary.com

মুজিব-ইয়াহিয়া ঐতিহাসিক সংলাপ

১৯৭১ সালে ১৪ মার্চ বাংলাদেশ বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য শেখ মুজিব ৩৫টি বিধি জারি করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। সাথে আসেন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ। ১৬ মার্চ থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব রহমানের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়। এই সংলাপ ১০দিন ধরে চলতে থাকে। আলোচনার শেষদিকে প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ভুট্টোও আলোচনায় শরিক হন।

১৬ মার্চ সকাল ১১ টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই ঘন্টা আলোচনা শেষে গেটে আসলে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, 'মেহেরবানি করে এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এটা দু'এক মিনিটের ব্যাপার নয়। এজন্য পর্যাপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৭ মার্চ সকাল ১০ টা ৫মিনিট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাইরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, 'আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরো আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।

১৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বলেন,

"আমি পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং যে দলের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে, সে দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কোন শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত করতে পারবে না। জনগণের সরকারের চেয়ে কেউই জাতির উত্তম সেবা করতে পারে ন। .... আমি জনাব ভূট্টোর অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াসের প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

www.bjilibrary.com

১৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে কোন বৈঠক হয়নি। ১৯ মার্চ সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় দফা বৈঠক। বৈঠক চলে দেড় ঘন্টা ধরে। পরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

১৯ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের তিন উপদেষ্টা বিচারপতি এ. আর. কর্ণেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা এবং কর্ণেল হাসানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের তিন প্রতিনিধি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনের দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাঁদের উপদেষ্টাদেরকে নিয়ে দুই ঘণ্টা দশ মিনিট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে ছিলেন বিচারপতি এ. আর. কর্ণেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্ণেল হাসান। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন। আলোচনা শেষে বাসায় ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে।'

ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট টিম নিয়ে ২১ মার্চ ঢাকা আসলেন। ২২ মার্চ সকাল ১১টার দিকে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়। মিটিং চলাকালেই প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান যে প্রেসিডেন্ট ২৫ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন। দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার্থে প্রেসিডেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিন নেতার এই বৈঠক চলে ৭৫ মিনিট ধরে।

www.bjilibrary.com

বৈঠক শেষে বাসভবনে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি যেইসব আলোচনা করেছেন, সেইসব প্রেসিডেন্ট নিজেই জুলফিকার আলী ভূট্টোকে অবহিত করেছেন। আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'যদি কোন অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?'

২২ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন, 'দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমঝোতা ও মতৈক্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। সমঝোতার শর্তগুলো তাঁর দল পরীক্ষা করে দেখছে।'

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস। সেদিন সারা পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন হবার তারিখ। এর আগেই সংলাপ সফল হওয়া অত্যাবশ্যক। এ কথা ইয়াহিয়ার মগজে ছিলো কিনা কে জানে? সংলাপের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাও বুঝবার উপায় ছিলো না। তাই ২৩ মার্চ ছাত্ররা সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ায়। গভর্নর হাউজ ও প্রেসিডেন্ট হাউজ ছাড়া কোন সরকারি ভবনেও পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত পতাকা উড়াতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঢাকায় উপস্থিত থেকে দেখলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানীতে পাকিস্তানের পতাকার বদলে ভিন্ন পতাকা উড়ছে।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ফলাফল যথাযথভাবে জানা না গেলেও আলোচনার প্রকৃতি ও গতি দেখে মনে হয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে ২৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান একটি গ্রহণযোগ্য কনফেডারেশনের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

২৪ মার্চ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টাদের একটি মিটিং হয়। মিটিং শেষে তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, উক্ত মিটিংয়ে তাঁরা তাঁদের সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেই জন্য তাঁদের দিক থেকে আর কোন মিটিংয়ের প্রয়োজন নেই। তাজউদ্দীন আহমদ আরো বলেন, 'সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আর কালবিলম্ব করলে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।'

www.bjilibrary.com

২৪ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের বাস ভবনে কমপক্ষে ৪০টির মতো মিছিল আসে। বাস ভবনের সামনের একটি সমাবেশে তিনি বলেন-

"আমাদের দাবি ন্যায়সংগত এবং স্পষ্ট। এইগুলো গ্রহণ করতেই হবে। জনগণ জেগে উঠেছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের দাবি দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ..... আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই, কিন্তু কেউ যদি তা না চায়, তাহলে তুমি তাদের দমিয়ে দিতে পারবে না। আমি আশা করি কেউ সে চেষ্টা করবেন না। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"[১৯]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সংলাপে কী কী বিষয় আলোচনা হচ্ছে সেই সম্পর্কে কেহই কিছু বলছিলো না। তাই গোটা জাতি সংলাপের বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে যায়।

পরবর্তীতে জানা যায় যে আওয়ামী লীগের উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিলো। প্রস্তাবগুলো ছিলো : অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে কোন রকমের পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং আপাতত রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার বহাল রাখা। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করলো যে, গোড়াতেই জাতীয় পরিষদকে দুইটি কমিটিতে ভাগ করতে হবে। দুইটি কমিটি গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে। কমিটি দুইটি ইসলামাবাদ ও ঢাকাতে বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর দুইটি রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং রিপোর্ট দুইটির মধ্যে একটি আপোস ফর্মুলা বের করে আনার চেষ্টা করবে।

তবে এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেওয়াও মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। সামরিক আইন তুলে নিলে ইয়াহিয়া সরকারের আইনগত বৈধতাই থাকতো না এবং প্রদেশগুলো স্বাধীন সত্তা দাবি করার ব্যাপারে অবাধ অধিকার লাভ করতো।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব

---

[১৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ২য় খণ্ড।*

www.bjilibrary.com

দেয়। এই কনভেনশন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক দুইটি শাসনতন্ত্র তৈরি করবে। জাতীয় পরিষদ এই দুইটি শাসনতন্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করবে। ঐদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা করলেন, তাঁর দল চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা সমঝোতামূলক কিছু করার নেই।

মার্চ মাসের শুরুতে আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেছিলেন, জাতীয় পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া একটি ভুল পদক্ষেপ।

আওয়ামী লীগের সর্বশেষ উপস্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত মিটিংয়ের প্রত্যাশা করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু সেই প্রত্যাশিত মিটিংয়ের ডাক আর এলো না। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা মওদূদী ও পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরামর্শ পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

www.bjilibrary.com

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের আর্মি এ্যাকশন

২৫ মার্চ রাত সাড়ে দশটায় ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে বাসায় ফেরার জন্য উঠলে শেখ মুজিবুর রহমান জানতে চান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অন্যতম উপদেষ্টা লে. জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে তিনি কোন টেলিফোন কল পেয়েছেন কিনা। ড. কামাল হোসেন জানান যে তিনি কোন কল পাননি।

এই সময়টাতেও শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তাঁর সাথীদের কোন নির্দেশ দেননি। তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কিংবা মুক্তি আন্দোলনের কোন নির্দেশিকা উচ্চারিত হয়নি।

রাত সাড়ে দশটার দিকে একটি সেনা ইউনিট ঢাকা রেডিও স্টেশন ও টেলিভিশন সেন্টারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন সেনা ইউনিট পিলখানা (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টারস) এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এসে হামলা চালিয়ে বহুসংখ্যক লোককে হতাহত করে সেইগুলো দখল করে নেয়। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং শিক্ষকদের বাসভবনে ঢুকে এগারো জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। রাত এগারোটার পর থেকে রাজধানীর সাথে দেশের সকল অংশের টেলিযোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশের অন্যত্র ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ওপর অনুরূপ হামলা চালানো হয়।

রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর পাঁচটার দিকে মাইকে ঘোষণা করা হয় যে সারা শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। কেউ বাইরে এলে গুলি করা হবে।

২৬ মার্চ রেডিওর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার ভাষণে সারাদেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপের কথা জানান। সেই ভাষণের কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো-

"পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং যতোশীঘ্র সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই

www.bjilibrary.com

লক্ষ্যেই আমি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে কথা বলি এবং ১৫ মার্চ ঢাকা যাই।

আপনারা জানেন, রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বেশ কয়েকটি মিটিং করি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনার পর এটা করা প্রয়োজন ছিলো যাতে মতৈক্যের ভিত্তি চিহ্নিত করা যায় এবং একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছা যায়। ..... পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনাবাহিনী বিদ্রূপ ও অপমানের শিকার হয়। ..... কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে পারতাম, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আমার পরিকল্পনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার ঐকান্তিক আগ্রহে আমি একের পর এক সংঘটিত বেআইনি কাজ সহ্য করেছি এবং একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছার জন্য সকল সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিপূর্ণ সমাধানে আসার জন্য আমি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেই প্রয়াস চালিয়েছি তা আমি উল্লেখ করেছি। আমরা কোন প্রয়াসই বাকি রাখিনি। কিন্তু তিনি গঠণমূলকভাবে সাড়া দিতে পারেননি। তদুপরি তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সরকারের কর্তৃত্ব নস্যাত করে চলছিলেন, এমনকি ঢাকায় আমার অবস্থানকালেও। একটি প্রোক্লেমেশন যা তিনি প্রস্তাব আকারে পেশ করেছেন, তা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ..... তাঁর একগুঁয়েমি, অনমনীয়তা এবং যুক্তিযুক্ত কথা গ্রহণে অস্বীকৃতি একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারে যে এই ব্যক্তি এবং তাঁর পার্টি পাকিস্তানের দুশমন এবং তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি আলাদা করে নিতে চান। তিনি এই দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর এই অপরাধ শাস্তি না পেয়ে পারে না।

.... তবে দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার প্রেক্ষিতে সারাদেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। আর একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলো। আমি সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিগগিরই বিভিন্ন সামরিক বিধান জারি করা হবে।"[২০]

---

[২০] আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করবেন না এই বিষয়টি যতই প্রকট হয়ে উঠছিল ততই সেনাবাহিনী কর্তৃক এদেশের জনগণের উপর হামলা চালানোর আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপারেশন সার্চলাইট নামে গণহত্যার নীল নকশা সম্পন্ন করে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া অন্য কোন পথ আর রইলো না। তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গেলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাধীনতা ঘোষণা করে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রত্যয় নিয়ে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান রাজী হলেন না। ১৯৭১ ভেতরে বাইরে বইয়ে এ কে খন্দকারও এমনটিই বলেছেন। শারমিন আহমদ লিখিত "তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা" বইয়ে এই বিষয়টি যেভাবে লিখেছেন তা হলো :

"মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকায় একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। বড় কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর, সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু, আব্বুর সাথেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরদিনও (২৭ মার্চ) হরতাল ডেকেছি।' মুজিব কাকুর তাৎক্ষণিক এই উক্তিতে আব্বু বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে বেগম মুজিব ঐ শোবার ঘরেই সুটকেসে মুজিব কাকুর জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখতে শুরু করলেন। ঢোলা পায়জামায় ফিতা ভরলেন। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকুর স্বেচ্ছাবন্দি হওয়ার এইসব প্রস্তুতি দেখার পরও আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে মুজিব কাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন। আব্বু বললেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ রূপেই নেতৃত্ব-শূন্য করে দেওয়া। এই অবস্থায় মুজিব কাকুর ধরা দেওয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যার শামিল। তিনি বললেন, 'মুজিব ভাই, বাঙালি জাতির

www.bjilibrary.com

অবিসংবাদিত নেতা হলেন আপনি। আপনার নেতৃত্বের ওপরই তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে রয়েছে।' মুজিব কাকু বললেন, 'তোমরা যা করবার কর। আমি কোথাও যাব না।' আব্বু বললেন, 'আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় কে নেতৃত্ব দেবে এমন ঘোষণা তো আপনি দিয়ে যাননি। নেতার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হবে, দলকে তো তা জানানো হয়নি। ফলে দ্বিতীয় কারো নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক অনিশ্চিত ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।' আব্বুর সেদিনের এই উক্তিটি ছিল এক নির্মম সত্য ভবিষ্যদ্বাণী।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বু স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন এবং টেপ রেকর্ডারও নিয়ে এসেছিলেন। টেপে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে মুজিব কাকু অস্বীকৃতি জানান। কথা ছিল যে, মুজিব কাকুর স্বাক্ষরকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) অবস্থিত বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তাঁরা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আব্বু বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কারণ কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কী তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে।' মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।'

আব্বুর লেখা ঐ স্বাধীনতা ঘোষণারই প্রায় হুবহু কপি পরদিন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রচারিত হয়। ধারণা করা যায় যে, ২৫ মার্চের কয়দিন আগে রচিত এই ঘোষণাটি আব্বু তাঁর আস্থাভাজন কোনো ছাত্রকে দেখিয়ে থাকতে পারেন। স্বাধীনতার সমর্থক সেই ছাত্র হয়তো স্ব-উদ্যোগে বা আব্বুর নির্দেশেই স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় পৌঁছে দেন।

মুজিব কাকুকে আত্মগোপন বা স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে রাত নয়টার কিছু পরে আব্বু ঘরে ফিরলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে। ..... মুজিব কাকু বাসা থেকে বের হলেন না, কোনো নির্দেশও দিলেন না এই ব্যাপারটি তাকে গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত করে। রাত প্রায় এগারোটার দিকে, মুজিব কাকুর বাসা থেকে ড. কামাল হোসেনকে সাথে করে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আবারও ফিরে আসেন আমাদের বাসায়। আব্বু তখন সামনের ফুল বাগানে ঘেরা লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

www.bjilibrary.com

কথা বললেন আব্বুর সাথে। তিনি বললেন, 'Military has taken over আপনাকে যেতে হবে আমাদের সাথে।' আব্বু প্রচণ্ড অভিমানের স্বরে বললেন, 'কী করব ? কোথায় যাব ?' আমীর-উল ইসলাম যখন আব্বুকে তাঁদের সাথে যাবার জন্য জোর তাগাদা দিচ্ছেন, তখনিই আমাদের বাসার দক্ষিণে ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (পরে বিডিআর-বাংলাদেশ রাইফেলস; এখন বিজিবি- বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ) এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের কুমিল্লা হতে নির্বাচিত এম. এন. এ (মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) মোজাফফর সাহেব দৌড়াতে দৌড়াতে গেটের কাছে এসে বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইপিআরকে নিরস্ত্র করছে। কথাটি শোনার পর আব্বুর মনে পরিবর্তন এল। তিনি মুজিব কাকুর কাছ হতে নির্দেশ না পাওয়া জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেললেন। দ্রুত গতিতে ঘরের ভেতর গেলেন। যখন ফিরে এলেন, কাঁধে তাঁর রাইফেল ঝুলছে, কোমরে পিস্তল গোঁজা। লুঙ্গির ওপর সাদা ফতুয়া স্টাইলের হাফ হাতা শার্ট। সহচরদের সাথে আব্বু বেরিয়ে পড়লেন অজানার পথে। .....

২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় নিরীহ জনগণের উপরে পাইকারীভাবে সামরিক অভিযান শুরু হয়। পাক বাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খান আগেই ঢাকায় এসে প্রেসিডেন্টের দিক নির্দেশনা লাভ করেছেন। এক নাগাড়ে এক তরফাভাবে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ ৩৩ ঘন্টা পর্যন্ত চলে। ইকবাল হল বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি নারকীয় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়। প্রায় দু'শো ছাত্রের লাশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর সামরিক অভিযান যত ব্যাপক হতে থাকে, হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ ততবেশি ভারতে পাড়ি জমাতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতেই চট্টগ্রাম কালুর ঘাট ট্রান্সমিশন ব্রডকাস্টিং এবং আগ্রাবাদ সেন্টার দখলপূর্বক দেশ বাসীর উদ্দেশে মেজর জিয়া ঘোষণা দেন-

"I, Major Ziaur Rahman, head of the Provisionery revoletionary Government of Bangladesh do hereby proclaim and declare the independence of Bangladesh and also appeal to the all Democratic socialist and other countries of the world to immediate recognise our country Bangladesh.....Inshallah, victory is ours.

www.bjilibrary.com

"প্রিয় দেশবাসী,

আমি মেজর জিয়া বলছি। এতদ্বারা আমি স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি...

বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও অপরাপর রাষ্ট্রসমূহকে অনতিবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।... ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংশোধিত ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

I, Major Ziaur Rahman on behalf of our great Leader Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman supreem commander and head of the provisionery Revoletionary Govt of Bangladesh do hereby proclaim and declare the Independence of Bangladesh. .. .[২১]

জিয়াউর রহমানে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে "তাজদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা" বইতে শারমিন আহমদ লিখিছেন :

"কালুরঘাটে চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মেজর জিয়াউর রহমানের (পরবর্তী সময়ে জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট) ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটি অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।"[২২]

মেজর জিয়ার উক্ত ঘোষণা দু'টিই বিদ্যুৎবেগে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সশস্ত্র বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আমলা, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র যুবকসহ সর্বস্তরের জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উজ্জীবিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধে যোগদানের জন্য মনস্থির করে ফেলল। যেন এমন একটি আহ্বানের জন্যই তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার অনধিক দু'সপ্তাহের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর আমবাগানে মুজিবনগর নামে আখ্যায়িত করে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। কর্ণেল ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ পূর্বক ১৭ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

---

[২১] *"জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫", -অলি আহাদ।*

[২২] *"তাজদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা" - শারমিন আহমদ।*

www.bjilibrary.com

কালো পঁচিশ ও মুক্তিযুদ্ধ

প্রথমদিকে পাক বাহিনী সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রাধান্য বিস্তার করলো। এ সময়ে আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের বিপুল জনশক্তি ভারতে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতে যুবকদের মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পূর্ণসহযোগিতা দান করলো। এদিকে মুসলিম লীগ, পিডিপি. জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি ও চীন পন্থী ন্যাপ নেতারা তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে পরিস্থিতির শিকার হয়ে সংগত কারণে বাংলাদেশে থাকতে বাধ্য হন। ভারতের দিকে পা বাড়াবার তাদের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে উল্লিখিত দলগুলোর কর্মীদেরকে জোরপূর্বক ভারতে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন এমনকি হত্যা করা হতো।

প্রথমদিকে পাক বাহিনী পাকিস্তান ও ইসলামপন্থী অধিকাংশ দেশবাসীর সহযোগিতা পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের নৃশংস হত্যা, নির্যাতন ও লুঠতরাজের পাশাপাশি নারী ধর্ষণ চালানোর ফলে মিত্ররাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এসব অসামাজিক ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম জেনারেল টিক্কাখানের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক বলিষ্ট কণ্ঠে বার বার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। তাদের অন্যায় ও অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তৎকালীন ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি সৈয়দ শাহ জামাল চৌধুরী, জামায়াত নেতা অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ জামায়াতে ইসলামীর বেশকিছু লোককে তারা নির্মমভাবে শহীদ করে।

আদর্শহীন নীতিভ্রষ্ট পাক বাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় গোটা দেশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। বিদেশি ও বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জনমত দ্রুতগতিতে পাকিস্তান সরকারের বিপক্ষে চলে যায়। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সুগম হয়ে যায়। পাকিস্তানের মিত্রশক্তি আমেরিকাসহ সব দেশ সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। অপরদিকে ভারতের কূটনীতিক মিশন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ জনমত সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারত

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের সাথে সম্মুখে যুদ্ধে জড়িত হতে একাকীত্ব ভেবে রাশিয়ার সাথে সামরিক চুক্তি করে। উভয়শক্তি এক হলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে যুদ্ধ লাগে। অপরদিকে ভারতের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের অস্ত্রে সুসজ্জিত ও বলীয়ান হয়। তার সাথে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বি.ডি.আর ও পুলিশ বাহিনী মরণপন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ

১৯৭১ সনের ৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপ:

'This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, dispatched from West Pakistan, has unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed thought the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has also arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government of the people of India has always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. Situated as India is and bound

www.bjilibrary.com

as the people of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border.

Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and Solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, Committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and the massacre of defenseless people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of the people which amounts to genocide. [২৩]

অর্থাৎ 'এই হাউস, ইস্ট বেংগলে সৃষ্ট সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর মর্মবেদনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে ইস্ট বেংগল-এর জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য বড়ো আকারের হামলা চালাতে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সনের নির্বাচনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জনগণের যেই রায় প্রকাশ পেয়েছে, তা পাকিস্তান সরকার অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

---

[২৩] *আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে।*

www.bjilibrary.com

পাকিস্তান সরকার কেবল যে বৈধভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই নয়, তারা অযৌক্তিকভাবে জাতীয় পরিষদকে ন্যায়সংগত ও সার্বভৌম ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ইস্ট বেংগল-এর জনগণকে বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাংক, কামান ও বিমান ব্যবহার করে শক্তি প্রয়োগে দমন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভারতের জনগণের সরকার সব সময়ই কামনা করেছে এবং পাকিস্তানের সাথে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছে। ভারতের অবস্থান এবং বহু শতাব্দীর ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যেই বন্ধন এই উপমহাদেশের জাতিগুলোর মধ্যে বিরাজমান, সেই প্রেক্ষিতে সীমান্তের এতো নিকটের এই ভয়ংকর শোকাবহ ঘটনার প্রতি ভারত উদাসীন থাকতে পারে না। আমাদের সারাদেশের মানুষ নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষের ওপর যেই সীমাহীন নৃশংসতা চলছে তার তীব্র নিন্দা করছে।

এই হাউস ইস্ট বেংগল-এর মানুষের প্রতি, যারা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছে, গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

শান্তির প্রতি ভারতের আগ্রহ, মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে ভারতের অঙ্গীকার স্মরণে রেখে, এই হাউস অবিলম্বে শক্তি প্রয়োগ এবং নিরাপত্তাহীন মানুষ নিধন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। এই হাউস পৃথিবীর সকল জাতি ও সরকারসমূহের প্রতি দ্রুত ও গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা, যা আসলে গণহত্যা, বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানাচ্ছে।'

ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবটির তিনটি স্থানে "ইস্ট বেংগল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও তারা পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করেনি। প্রকৃত অর্থে এর মাধ্যমে "ইস্ট বেংগল" পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির প্রতি দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পুরোনো নেতিবাচক মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে।

www.bjilibrary.com

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অতি কাছের মানুষ। ২৫ মার্চ সন্ধ্যার দিকে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ঢাকার কোন শহরতলীতে গিয়ে থাকতে বলেন যাতে প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা একত্রিত হতে পারেন।

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পর এবং লে. জেনারেল টিক্কা খানের উদ্যোগে আর্মি এ্যাকশন শুরু হলে পঁচিশে মার্চ রাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরা (যারা বন্দিত্ব এড়াতে পেরেছেন) কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নির্দেশ ছাড়াই যে যার মতো লড়াই শুরু করেন।

এ সমস্ত ঘটনায় অন্যদের মতো তাজউদ্দীন আহমদও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। ২৭ মার্চ তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। ফরিদপুর-কুষ্টিয়ার পথে অগ্রসর হয়ে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত পৌঁছান ৩০ মার্চ সন্ধ্যায়। তবে নিজের বুদ্ধিতেই তিনি দুইটি লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন-

এক. পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের কারণে যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধ বা মুক্তির লড়াই শুরু করা।

দুই. এই মুক্তি লড়াইকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে ভারত ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল দেশের সহযোগিতা লাভের জন্য অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া।

মুক্তিবাহিনী গঠন

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্ণেল আতাউল গণী ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও কর্ণেল আবদুর রবকে চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করেন। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১১ই এপ্রিল এর বেতার ভাষণে মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশাররফকে যথাক্রমে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চল,

www.bjilibrary.com

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চল ও শ্রীহট্ট-কুমিল্লা অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর বিদ্রোহী বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ৬২ হাজার। ভারতীয় ও রুশরা পর্যায়ক্রমে আরো ১ লাখ ২৫ হাজার বেসামরিক লোককে প্রশিক্ষণ দেয়।

এভাবে মুক্তিবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৫ শ'।"[২৪]

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য রণাংগনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টর কমান্ডারদের নামের ইংরেজী অধ্যাক্ষর 'এস' (S) ফোর্স, 'জেড' (Z) ফোর্স ও 'কে' (K) ফোর্স নামে মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্তি ও পরিচিতি লাভ করে।

১ নাম্বার সেক্টর

চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং ফেনী নদী পর্যন্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর মুহাম্মাদ রফিকের ওপর।

২ নাম্বার সেক্টর

নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এম.টি. হায়দারের ওপর।

৩ নাম্বার সেক্টর

হবিগঞ্জ জেলা, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ, কিশোরগঞ্জ এবং আখাউড়া ভৈরব রেল লাইনের পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর কে.এম সফিউল্লাহ ও মেজর নুরুজ্জামানের ওপর।

---

[২৪] *লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী, দ্যা বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান।*

www.bjilibrary.com

৪ নাম্বার সেক্টর

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এই সেক্টার। এই সেক্টারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর সি.আর দত্তের ওপর।

৫ নাম্বার সেক্টর

সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল ও ডাউকি-ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল ছিলো এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই সেক্টারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর মীর শওকত আলীর ওপর।

৬ নাম্বার সেক্টর

ঠাকুরগাঁও জেলা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় উইং কমান্ডার এম. বাশারের ওপর।

৭ নাম্বার সেক্টর

রাজশাহী জেলা, পাবনা জেলা, দিনাজপুর জেলা, পঞ্চগড় জেলা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর কাজী নুরুজ্জামানের ওপর।

৮ নাম্বার সেক্টর

কুষ্টিয়া জেলা, যশোর জিলা, ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ নিয়ে ও খুলনা জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম.এ মঞ্জুর-এর ওপর।

৯ নাম্বার সেক্টর

বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল জেলা ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। এই সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর এম.এ জলিলের ওপর।

১০ নাম্বার সেক্টর

আভ্যন্তরীণ নদীপথ, দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীপথ, চট্টগ্রাম এলাকার নদীপথ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো এই সেক্টর। নদীপথে পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর হামলা চালাবার জন্য হেড কোয়ার্টার্সের দায়িত্বে ছিলো এটি।

www.bjilibrary.com

১১ নাম্বার সেক্টর

মোমেনশাহী জেলা, টাংগাইল জেলা, শেরপুর জেলা, জামালপুর জেলা ও যমুনা নদীর তীরাঞ্চল নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। মেজর আবু তাহের ও ফ্লাইট লেফটেনেন্ট এম. হামিদুল্লাহ খানের ওপর অর্পিত হয় এই সেক্টরের দায়িত্ব।[২৫]

'মুজিব বাহিনী' গঠন

শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা পৌঁছেন। তাঁদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'মুজিব বাহিনী'। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল উবানের তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের অদূরে চাক্‌রাতা-য় মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়।

মুজিব বাহিনী সম্পর্কে 'মূলধারা '৭১' এর লেখক মঈদুল হাসান বলেন-

> *'মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মুজিব বাহিনীর লক্ষ্য বলে প্রচার করা হলেও এই সংগ্রামে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা, কার্যক্রম ও কৌশল কি, কোন্ এলাকায় এরা নিযুক্ত হবে, মুক্তিবাহিনীর অপরাপর ইউনিটের সাথে এদের তৎপরতার কিভাবে সমন্বয় ঘটবে, কি পরিমাণ বা কোন্ শর্তে এদের অস্ত্র ও রসদের যোগান ঘটছে, কোন্ প্রশাসনের এরা নিয়ন্ত্রণাধীন, কার শক্তিতে বা কোন্ উদ্দেশ্যে এরা অস্থায়ী সরকারের বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে, এ সমুদয় তথ্যই বাংলাদেশ সরকারের জন্য রহস্যাবৃত থেকে যায়।'*[২৬]

---

২৫. *এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।*

২৬. *মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১।*

www.bjilibrary.com

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার অনধিক দু'সপ্তাহের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং তাঁরা ১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন। প্রবাসী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) মনসুর আলী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব খন্দকার মুশতাক আহমদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তি বাহিনী

'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হলে সেই সরকারের আনুগত্য করতে মুক্তিবাহিনী বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেনি। কারণ 'মুক্তি বাহিনীর' মাঝে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা দলীয় স্বার্থ-চিন্তা ছিলো না। এটি ছিলো জাতীয় স্বার্থের প্রতীক।

অন্য দিকে 'মুজিব বাহিনী' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র ধারায় অবতীর্ণ হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে মুজিব বাহিনী স্বাধীনভাবে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে।

'শান্তি কমিটি' গঠন

১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খায়েরউদ্দিন এবং নেযামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল মৌলবী ফরিদ আহমদের উদ্যোগে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান জনাব নূরুল আমীনের বাসভবনে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (মুসলিম লীগ), মাহমুদ আলী (পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক পার্টি), আবদুল জাব্বার খদ্দর (কৃষক শ্রমিক পার্টি), পীর মুহসিনুদ্দীন (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম), এ.এস.এম. সুলাইমান (কৃষক শ্রমিক পার্টি), মাওলানা নূরুয্যামান (পিপলস পার্টি) প্রমুখ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল আমীন। মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রথমে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতারা সরকারের

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা ভারতে পালিয়ে গেলেন। এদিকে সরকার সেনাবাহিনীকে দিয়ে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যে সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছে তাতে নিরীহ জনগণই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। যারা আন্দোলনে সক্রিয় তারা সবাই আত্মগোপন করছে বা ভারতে চলে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রশাসন, পুলিশ, ব্যাংক, আদালত সবই চলছিলো। টিককা খান ঐ সরকার পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে যা কিছু করছেন তাতে নিরপরাধ লোকেরা যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং সেনাবাহিনী যেন বাড়াবাড়ি না করে এমন ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে তারা কার কাছে আশ্রয় পাবে ? আমরা যারা রাজনীতি করি জনগণ তাদের কাছেই সাহায্যের জন্য আসছে এবং আসবে। আমরা তাদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি সেই বিষয়ে মত বিনিময়ের উদ্দেশেই আজকের এই মিটিং।'

এ.কে. রফিকুল হোসেন বলেন, 'আমরা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েম করেছিলাম, সেই পাকিস্তানকে ভারত দখল করে নিক তা আমরা চাইতে পারি না। ভারত আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতারা এই দেশটাকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার এই মহা সুযোগ গ্রহণ করবে। আমার আশংকা যে আমরা দিল্লীর গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছি। ভারতীয় কংগ্রেসের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্যই আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। আমরা আবার সেই কংগ্রেসের অধীন হতে পারি না।'

আবদুল জাব্বার খদ্দর বলেন, 'সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে এই দেশকে ভারতের খপ্পর থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ভারত জয়ী হলে এরা কেউ পালাতেও পারবে না। এই অবস্থায় তাদের এই প্রচেষ্টায় আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা কর্তব্য।'

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, 'এই দেশের রাজনীতিতে আজকের সভাপতি ছাড়া আমরা কেউ গণ্য নই। গত নির্বাচনে আমাদের কারো কোন পাত্তা ছিলো না। একমাত্র নূরুল আমীন সাহেব নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। জনগণের নিকট আমাদের কতটুকু মূল্য আছে ? নির্বাচনে জনগণ যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য

www.bjilibrary.com

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান কেমন জঘন্য চক্রান্ত করেছেন তা জনগণ ও বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে। নির্বাচনের ফলাফলকে চরম অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারকে শেখ মুজিবের আনুগত্য করতে দেখেও ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সংলাপে কোন সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেন না। রাজনৈতিক মতবিরোধকে রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসা করতে হয়। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তা করা যায় না। ইয়াহইয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিলেন। আমরা জনগণের প্রতিনিধি নই। আমরা এই সমস্যার কী সমাধান দেবো ? সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, কোন সামরিক শক্তি ১৯৪৭ সনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ করেনি। শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই ঐক্য বহাল রাখা যাবে না। আমরা কিভাবে টিক্কা খানের সাথে সহযোগিতা করবো ? তারা যা করছেন তাতে কি আমাদের কোন পরামর্শ চেয়েছেন? তারা কি আমাদের কথা মতো চলবেন ? এসব কথা বিবেচনা করেই আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। পাকিস্তান টিকে থাকুক, আমাদের দেশ ভারতের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকুক, এটা অবশ্যই আমাদের সবার আন্তরিক কামনা। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের হাতে কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। তাই আমি মৌলবী ফরিদ আহমদের প্রস্তাব সমর্থন করি এবং অসহায় জনগণের যতটুকু খিদমত করা সম্ভব, সেই প্রচেষ্টায়ই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।"

সভায় আরো অনেকেই বক্তব্য রাখেন। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে 'শান্তি কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৭]

খাজা খায়েরউদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন- এডভোকেট এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মাসুম, জনাব আবদুল জাব্বার খদ্দর, মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ, জনাব আবুল কাসেম, জনাব মোহন মিয়া, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, ব্যারিস্টার আখতারউদ্দীন, পীর মুহসিনুদ্দীন, জনাব এ.এস.এম. সুলাইমান, জনাব এ.কে. রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোয়াহা বিন হাবীব, মেজর (অব.) আফসারউদ্দীন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এবং হাকিম ইরতিয়াজুর রহমান।

---

২৭. *অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড।*

www.bjilibrary.com

জনগণের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নিরপরাধ জনগণকে সেনাবাহিনীর যুল্‌ম থেকে বাঁচানোর জন্য শান্তি কমিটি প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। মুসলিম লীগ বড় সংগঠন হওয়ায় থানা পর্যায়েও মুসলিম লীগের লোকেরাই শান্তি কমিটির নেতৃত্ব লাভ করেন। মুসলিম লীগের পর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দলেরই জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের নিচে সংগঠন ছিলো না। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন তখনো মহকুমা স্তরের নিচে বিস্তার লাভ করেনি।

রেযাকার বাহিনী গঠন

১৯৭১ সনের ২রা অগাস্ট পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লে. জেনারেল টিককা খান The East Pakistan Razakars Ordinance 1971 জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে The Ansars Act 1948 বাতিল করা হয় এবং আনসার বাহিনীর টাকা-পয়সা, রেকর্ডপত্র এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি Razakar বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।[২৮] আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হয় রেযাকার বাহিনী।

বর্তমানে যাদেরকে ইউ.এন.ও. বলা হয় তখন তাদেরকে বলা হতো সার্কেল অফিসার। সামরিক সরকারের নির্দেশে সার্কেল অফিসারগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে হাটে বাজারে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিয়ে রেযাকার রিক্রুট করা শুরু করেন।

"স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়" গ্রন্থে কামরুদ্দিন আহমদ রেযাকার বাহিনীর কমপোজিশন সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন :

"(ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিলো। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেওয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতোদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিলো, তাদের এক অংশ ঐ বাহিনীতে যোগদান করলো।

(খ) এতোদিন পাকসেনার ভয়ে গ্রামগ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসাবে তারা রাজাকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

---

২৮ *এড. মো. খায়রুল আহসান (মিন্টু), আর্মি, বিডিআর ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আইন ও অধ্যাদেশ।*

www.bjilibrary.com

(গ) এক শ্রেণির সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।"[২৯]

পুল ও কালভার্ট পাহারা দেওয়াসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে সেই জন্য পাহারাদার হিসাবে রেযাকারদেরকে নিয়োজিত করা হয়। ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কেন্দ্রগুলোতে রেযাকারদেরকে পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

একজন মুক্তিযোদ্ধার লিখিত চিঠিতে আমরা রেযাকার বাহিনী গঠন ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাই–

"অবশ্য আজকাল পাকিস্তানিরা একটা নতুন বাহিনী গঠন করেছে। নাম দিয়েছে রাজাকার। এরা অধিকাংশই মুসলিম লীগের লোক। অনেক জায়গায় আবার জোর করে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ঢুকাচ্ছে। এক এক মহল্লায় গিয়ে সেখানকার চেয়ারম্যান অথবা সরদার গোছের লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে বলছে যে তোমাদের মহল্লা থেকে এতজন লোক রাজাকার বাহিনীতে না দিলে তোমাদের মহল্লা বা গ্রাম ধ্বংস করে দেব। এই রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল দেওয়া হয় আর তারা ব্রিজ, রাস্তা ইত্যাদি পাহারা দেয়, যাতে মুক্তিবাহিনী এগুলো ধ্বংস না করতে পারে। যদি কোন এলাকার Bridge ইত্যাদি ধ্বংস হয় তাহলে আশপাশের তিন-চার মাইলের মধ্যে বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেয়। তাই লোকেরা ব্রিজ ধ্বংস করতে গেলে তারা... Fight করে, না হয়তো হাতে পায়ে ধরে তাদের ব্রিজ উড়াতে মানা করে। অবশ্য রাজাকাররা অনেক জায়গায় আমাদের সাহায্য করেছে, আবার অনেক জায়গায় গ্রামবাসীর ওপর খুব অত্যাচার করেছে। অবশ্য রাজাকাররা আমাদের খুবই ভয় করে (They are no match for us) এবং প্রায় অনেক রাজাকার Defect করে MB তে যোগ দিচ্ছে।"[৩০]

রেযাকার বাহিনীর দুইটি উইং ছিলো : আল বদর বাহিনী ও আশ্ শামস বাহিনী। এ সম্পর্কে লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী বলেন-

"Two separate wings called Al-Badr and Al-Shams were organized. Well-educated and properly

---

২৯ *এ কে এম নাজির আহমদ, রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী।*

৩০ *মুক্তিযোদ্ধা টিটো, একাত্তরের চিঠি।*

www.bjilibrary.com

motivated students from schools and madrasas were put in Al-Badr wing, where they were trained to undertake 'specialized operations', while the remainder were grouped together under Al-Shams, which was responsible for the protection of bridges, vital points and other areas."[৩১]

'আল বদর ও আশ্ শামস নামে দুইটি আলাদা 'উইং' গঠন করা হয়। স্কুল-মাদ্রাসার সুশিক্ষিত ও যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্য চালাবার জন্য আল বদর উইং গঠন করা হয় এবং পুল, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অন্যান্য স্থান পাহারা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকে নিয়ে গঠন করা হয় আশ্ শামস উইং'।

উপরোক্ত বর্ণনায় বুঝা যায়, 'আল বদর বাহিনী' ও 'আশ্ শামস বাহিনী' নামে স্বতন্ত্র কোন বাহিনী ছিলো না। 'আল বদর বাহিনী' ও 'আশ্ শামস বাহিনী' রেযাকার বাহিনীরই দুইটি ভাগ ছিলো মাত্র।

ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৭১ সনের অক্টোবর মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এটি ছিলো প্রকৃত পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

"১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর অক্টোবরে ভারতের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাত দফা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। চুক্তিটি ছিলো নিম্নরূপ :

১। *যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকিদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।*

২। *বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।) ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনর্নিরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।*

---

[৩১] *Lieutenant General (R) A.A.K. Niazi, The Betrayal of East-Pakistan.*

www.bjilibrary.com

৩। *বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।*

৪। *আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করা হবে।*

৫। *সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।*

৬। *দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলাবাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছরওয়ারী এবং যার পাওনা, সেটা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা হবে।*

৭। *বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।*

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত উক্ত সাত দফা গোপন চুক্তির তথ্য সাংবাদিক মাসুদুল হককে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী প্রদান করেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের পরপরই তিনি মূর্ছা যান।"[৩২]

পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠন

১৯৭১ সনের ১লা সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহহিয়া খান কঠোর প্রকৃতির মানুষ লে. জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে মুসলিম লীগের ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিক গভর্ণর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালাবার লক্ষ্যে তিনি একটি সিভিলিয়ান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। জনাব আবুল কাসেম অর্থ দফতর, জনাব আব্বাস আলী খান শিক্ষা দফতর, জনাব আখতার উদ্দিন বাণিজ্য ও শিল্প দফতর, জনাব এ.এস.এম. সুলাইমান শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতর, মি. অং শৈ প্রু বন, সমবায় ও মৎস্য দফতর, মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ রাজস্ব দফতর, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা বিষয়ক দফতর, জনাব নওয়াজিশ আহমদ খাদ্য ও

---

৩২. *মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা।*

www.bjilibrary.com

কৃষি দফতর, জনাব মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ মজুমদার স্বাস্থ্য দফতর এবং অধ্যাপক শামসুল হক সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। নব নিযুক্ত গভর্নর মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সুলাইমান ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগের পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্কে মামা এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘকালের সহকর্মী এডভোকেট জহিরুদ্দিন।[৩৩]

লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণ

১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের বিমান বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা ফেলে এটি অকেজো করে দেয়। ১৪ই ডিসেম্বর গভর্ণর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিক গভর্ণর হাউসে মন্ত্রিসভার মিটিং ডাকেন। খবর পেয়ে যায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী। ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক ঝাঁক হান্টার বিমান গভর্নর হাউসের ওপর বোমা হামলা চালায়। গভর্নর ডা. এ. এম. মালিক দৌড়িয়ে নেমে যান ভূ-গর্ভস্থ বাংকারে। সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সমেত পদত্যাগ করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি ঘোষিত নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সেনাগণ মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেক্টর কমান্ডারদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাগণ এগিয়ে আসছিলেন ঢাকার দিকে। এইদিকে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ-র কাছ থেকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ পেতে থাকেন। লে. জেনারেল নিয়াজী এবং ফিল্ড মার্শাল মানেক শ-র মাঝে কী কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার কিছুই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার জানতো না, জানতেন না মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীও।[৩৪]

---

৩৩. *এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।*

৩৪. *আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে।*

www.bjilibrary.com

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল দুইটার দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জ্যাকব তাঁর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সহকর্মীকে নিয়ে তিনটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ঢাকা আসেন। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ৮/১০টি সামরিক হেলিকপ্টারে করে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর সহকর্মীগণকে নিয়ে ঢাকা পৌছেন। তাঁর সাথে এসেছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।

বিকেল চারটা উনিশ মিনিটে রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সম্মুখে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। হাজার হাজার মানুষ এবং শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করেন।

লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজী যখন আত্মসর্পন দলিলে সই করছিলেন সে মুহূর্তে তার অনুভূতি :

> *"কাঁপা কাঁপা হাতে যখন আমি দলিলটি সই করছিলাম, তখন আমার বুকের ভেতর থেকে দুঃখ-বেদনা উথলে উঠেছিল, হতাশা আর আশাভঙ্গের অশ্রুতে দুই চোখ কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে একজন ফরাসি সাংবাদিক আমার কাছে এসে বললেন, 'এখন আপনি কেমন বোধ করছেন টাইগার ?' আমি উত্তর দিলাম, 'হতাশা অনুভব করছি।' অরোরা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি মন্তব্য করলেন, 'অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাকে একটা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। অন্য কোনো জেনারেল হলে এই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো করতে পারতেন না।"*[৩৫]

আত্মসমর্পনের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার, এতো বড়ো ঘটনায় ভারত সরকার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রী কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীকে হাজির রাখার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। সন্দেহ নেই এতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব ম্লান হয়েছে। আর এতে এদেশের সচেতন প্রতিটি মানুষের মনেই নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল। যে প্রশ্ন সর্বদাই ব্যথিত করবে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষকে।

---

৩৫. *দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান, - লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এ. এ. কে. নিয়াজি, অনুবাদ ঃ কাজী আখতার উদ্দিন ।*

www.bjilibrary.com

আত্মসমর্পণ দলিল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্সে দেশরক্ষা বাহিনীর যৌথ কম্যান্ড প্রতিনিধিদ্বয় ভারতীয় সেনা বিভাগের লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা ও বাংলাদেশ দেশরক্ষা বাহিনীর এ. কে খন্দকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলে পাক দেশরক্ষা বাহিনীর ৭৫ হাজার ও বেসামরিক ১৮ হাজার যুদ্ধবন্দিকে ভারত ভূমিতে স্থানান্তরিত করে তথায় আটক রাখা হয়। যে দলিলের মাধ্যমে এই আত্মসমর্পণ সংঘটিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ-[৩৬]

Text of Instrument of Surrender

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding-in-Chief of the Indian and Bangladesh force in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN Land, Air and Naval forces as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument is signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpreatation of the surrender terms. Lieutenant General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA convention and guarantees the safety and well-being of all Pak Military and Paramilitary forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Aurora.

JAGJIT SINGH AURORA
Lieutenant General
General Officer Commanding in Chief
Indian and Bangladesh Forces
in the Eastern Theatre
16, December, 1971

AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI
Lieutenant General
Martial Law Administrator
Zone B and Commander
Eastern Command (Pakistan)
16, December, 1971

---

[৩৬] জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, - অলি আহাদ ।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ-

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইতেছে। পাকিস্তান স্থল, বিমান ও নৌ এবং প্যারামিলিটারী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এই আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনীরা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন নিকটবর্তী সামরিক বাহিনীর নিকট অস্ত্র জমা দিবে। এই পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার পরিচালনাধীন হইবে। এই আদেশের লঙ্ঘন আত্মসমর্পণের শর্ত লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ও যুদ্ধনীতি অনুসারে ইহার বিচার হইবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলির অর্থ বা ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ উত্থিত হইলে লেফটেন্যন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, জেনেভা কনভেনশনের নিয়মাবলী অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের সহিত সম্মানজনক আচরণ করা হইবে এবং আত্মসমর্পণকারী সকল পাকিস্তান সামরিক প্যারামিলিটারী বাহিনীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হইবে। জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা পরিচালনাধীন বাহিনী সকল বিদেশি নাগরিক নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তিবর্গের রক্ষাণাবেক্ষণ করিবে।

স্বাঃ/জগজিৎ সিং অরোরা
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ
পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও
বাংলাদেশ বাহিনী
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

স্বাঃ/ আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর
জোন-বি এবং কমান্ডার
পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড (পাকিস্তান)
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

www.bjilibrary.com

জামায়াত নেতৃবর্গের পশ্চিম পাকিস্তান সফর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ এর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী রহমত ইলাহী ও ডা. নাজির আহম্মদ এম এন এ প্রমুখ একবার এ অঞ্চলে সফরে আসেন এবং তাঁরা বিভিন্ন এলাকার হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে দারুনভাবে মর্মাহত ও উৎকণ্ঠিত বোধ করেন। নেতৃবর্গ বুঝতে পারেন এ দাবানল সারা দেশকে গ্রাস করবে এবং মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস পাবে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও জামায়াতে ইসলামীর করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার জরুরি বৈঠক ডাকেন। উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুর রহীম ও পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম লাহোর যান।

অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের কর্মপরিষদ বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের চলমান পরিস্থিতি তুলে ধরলে মাওলানা মওদূদী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে স্বাক্ষাত করে তা তাকে অবহিত করতে বলেন। তাঁর কথা মতো প্রেসিডেন্টের অফিসে যোগাযোগ করে তিন দিন পর সাক্ষাতের সময় পাওয়া যায়। পরবর্তী ঘটনা অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

"আমি যথাসময়েই প্রেসিডেন্ট হাউজে পৌঁছলাম। আমাকে সামরিক পোশাক পরিহিত একজন অফিসার গেট থেকে নিয়ে গেলেন এবং সরাসরি প্রেসিডেন্টের সামনে পৌঁছিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট তার আসন থেকে উঠে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং হাত ধরে একই সোফায় তার পাশে বসালেন। জানালেন যে, অন্য প্রোগ্রাম কেনসেল করে আমার জন্য এ সময়টা বের করা হয়েছে। আমি শুকরিয়া জানালাম এবং বললাম যে, আজ সাক্ষাতের সময় না পেলে আপনার সাথে দেখা না করেই আমাকে চলে যেতে হতো। আমি অবিলম্বে ঢাকা ফিরে যেতে চাই।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কবে এসেছেন? সেখানকার অবস্থা কেমন? জওয়াবে বললাম যে, ৫/৬ দিন আগে লাহোর পৌঁছেছি। সেখানকার অবস্থা আপনাকে অবগত করার জন্যই পিণ্ডি এসেছি। তা না হলে

www.bjilibrary.com

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে ঢাকা ফিরে যেতাম। তারপর বললাম, "আপনি তো পূর্ব-পাকিস্তানেরও প্রেসিডেন্ট। ২৫ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান সামরিক অপারেশন শুরু করার পর গত আট মাসের মধ্যে আপনি একবারও সেখানকার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য গেলেন না। জনগণের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপনার সাক্ষাতের সুযোগ পেলো না। সেখানে গেলে জনগণের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখে আসতে পারতেন।"

তিনি যেতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং কিছু অজুহাতও দেখালেন।

আমি তাঁর নিকট পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা ঠিক ঐ ভাষায়ই পেশ করলাম, যেভাবে জামায়াতের কর্মপরিষদে পেশ করেছিলাম। তিনি এ সব শুনে বললেন যে, আমি যা বলেছি মোটামুটি অনুরূপ রিপোর্ট তিনিও পেয়েছেন। তবে সেনাবাহিনীর অন্যায় আচরণের খবর পাননি বলে বুঝা গেলো তাঁর একটি কথায়।

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশে বললেন, "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তান সঙ্কটের সমাধানের একটা ফর্মুলা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এ মুহূর্তে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। একটা মীমাংসা হয়ে যাবে বলে আশা করি।"

আমি বললাম, "জনগণের নির্বাচিত নেতা ও দলের সাথে মীমাংসা করা ছাড়া কোন সমাধানই টিকবে না। তারা তো পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত ও রাশিয়ার সমর্থন পেয়েই গেছে। এ অবস্থায় মীমাংসার পথ কী করে আছে?

এর জওয়াবে বললেন, "তাদের সাথেই মীমাংসা করার চেষ্টা চলছে। দেখা যাক কি করা যায়।"

আমার শেষ কথা ছিলো, "আপনি পূর্ব-পাকিস্তানে কবে যাবেন এবং সেখানে আপনার সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা?

তিনি এ কথা বলে আমাকে বিদায় করলেন, "মীমাংসার ফর্মুলা নিয়ে এখন মহাব্যস্ত। এ প্রচেষ্টা সফল হলে অবশ্যই যাবো।"[৩৭]

পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পাবনা জেলা আমীর ও প্রাদেশিক নেতা সাবেক এম পি মাওলানা আবদুস সোবহান এবং কুষ্টিয়ার এডভোকেট সা'দ আহম্মদ, রাজশাহীর এডভোকেট আফাজ উদ্দীন পাকিস্তান সফরে যান। ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেলে লাহোর থেকে প্রত্যাগত অধ্যাপক গোলাম আযম এর বিমান ঢাকার স্থলে সৌদী আরব (জেদ্দায়) অবতরণে বাধ্য হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের অনুপস্থিতিতে প্রাদেশিক সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল খালেক এমারতের দায়িত্ব পালন করেন।

---

৩৭. *জীবনে যা দেখলাম তৃতীয় খণ্ড, - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

নাখালপাড়ায় প্রাদেশিক অফিসে জয়েন্ট সেক্রেটারি ও শ্রমবিষয়ক সেক্রেটারি মাস্টার সফিক উল্লাহ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল জব্বার, বাইতুলমাল সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান ও অফিস সহকারী আমিনুর রহমান মঞ্জু দায়িত্ব পালন করছিলেন। সারাদেশে আওয়ামী শক্তির আক্রমণ ও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে শত শত জামায়াত নেতা ও কর্মী নাখাল পাড়া প্রাদেশিক অফিসের আশে পাশে আশ্রয় নেন।

এ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তি বাহিনীর সাথে পাক বাহিনীর চূড়ান্ত সংঘর্ষ চলছে। স্থানে স্থানে রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জামায়াতের লোকেরা ঢাকা ও সারাদেশে পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে নিরীহ পুরুষ মহিলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তারাও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। জামায়াত নেতৃবৃন্দ কোথাও শান্তি কমিটির সদস্য হিসাবে কোথাও ব্যক্তিগতভাবে সারাদেশে যত লোকের সম্ভব উপকার করেছেন। বিগ্রেডিয়ার রাও ফরমান আলী গংদের কাছে সুপারিশ পূর্বক অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগ সমর্থক জনৈক সাইফুদ্দীন মিয়াসহ বহু মজলুমকে পাক বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করেছেন।

যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক অফিসে নেতৃবৃন্দের অবস্থান দূরুহ হয়ে পড়লো। তেজগাঁ বিমান বন্দরে বিমান হামলা হলো। ঝাঁকে ঝাঁকে মিগ জঙ্গী বিমান এয়ারপোর্টের রানওয়ের উপর শেলিং করতে থাকলো। এ সময়ে পাকবাহিনীর পক্ষ থেকে বিমান বিধ্বংসী কামান ভারতের ১১টি জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করলো বটে কিন্তু তারা তেজগাঁ বিমান বন্দরের রানওয়ে বোমা মেরে সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়ে গেল। ফলে পাকিস্তানী ৩৫টি জঙ্গী বিমান বাংলাদেশে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকলো। রাশিয়ান মিগ জঙ্গী বিমান ও বৈমানিক দিয়ে চললো ভারতের একতরফা বিমান হামলা।

অবশেষে নয় মাসব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উন্নীত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ দখলদার পাকবাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

www.bjilibrary.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৯৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা

১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে কেহ-কেহ প্রশ্ন তোলেন। আসলে দেশের সত্যিকার স্বাধীনতার প্রশ্নে কারো কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতার সাথে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথা বলা হচ্ছিল, তা একজন মুসলমানের জন্যে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ভৌগলিক ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সব কিছুই ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার একেবারে পরিপন্থী। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শপথদীপ্ত এক আন্দোলন। তা কি করে ইসলাম বিরোধী ধারণা মতবাদ গ্রহণ করতে পারে ? তাই জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয় ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিল যে, যে পদ্ধতিতে এবং যেসব শ্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল এবং যেসব শক্তি পশ্চাৎ থেকে মদদ ও প্রেরণা যোগাচ্ছিল, তাতে করে দেশ বাহ্যত স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহিঃশক্তির গোলাম হয়ে পড়বে, মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে তথায় পৌত্তলিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া হবে।

যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, বিগত দু'যুগেও তা যখন করা হয়নি, তখন সে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যদি স্বাধীনতা আন্দোলন করা হতো, তাহলে জামায়াতে ইসলামী তার সর্বাগ্রে থাকতো। কিন্তু ঘটনার পটপরিবর্তন এমন ঝড়ের বেগে হচ্ছিল যে, ঐ ধরনের কোনো আন্দোলনের না সুযোগ ছিল, আর না কোনো পরিবেশ।

ইসলামের এ মৌলিক আদর্শের উপর অবিচল থাকার জন্যে শত শত জামায়াত কর্মী পৈশাচিক অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শত শত কর্মীর তাজা খুনে ধরনি রঞ্জিত হয়েছে। শত শত কর্মীর বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ধ্বংস করা হয়েছে। কোটি-কোটি টাকার সম্পদ লুট করা

www.bjilibrary.com

হয়েছে। অনেকে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরপরও একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, দেশের স্বাধীন সত্তাকে জামায়াত কর্মীগণ তখনই মেনে নিয়েছে। শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি ও শাসন পদ্ধতি সদা পরিবর্তনশীল। জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সংগ্রাম করছে এবং করতে থাকবে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্যেও জামায়াত দৃঢ়-সংকল্প। কারণ, দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন না থাকলে, জামায়াতের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও অর্থহীন হবে। তাই স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রতিটি জামায়াত কর্মী তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

১৯৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর কি ভূমিকা ছিল তা তখনকার পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম "পলাশী থেকে বাংলাদেশ বইয়ে" যা লিখেছেন তা এখানে তুলে ধরা হলো-

"জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমানের ভূমিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে জামায়াত আপসহীন। দুনিয়ার কোন স্বার্থে জামায়াত কখনও আদর্শ বা নীতির সামান্যও বিসর্জন দেয়নি। এটুকু মূলকথা যারা উপলব্ধি করে, তাদের পক্ষে '৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রথমত, *আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দু'টো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।*

দ্বিতীয়ত, *পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এদেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করাও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সঙ্গত কারণেই তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মঙ্গলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।*

তৃতীয়ত, *জামায়াত একথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের*

www.bjilibrary.com

হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।

চতুর্থত, জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশি কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

পঞ্চমত, পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পলিসির কারণে এ অঞ্চলে স্থানীয় পুঁজির বিকাশ আশানুরূপ হতে পারেনি। এ অবস্থায় এদেশটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খপ্পরে পড়লে আমরা অধিকতর শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হব বলে জামায়াত আশংকা পোষণ করত।

জামায়াত একথা মনে করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতের সাথে সমমর্যাদায় লেনদেন সম্ভব হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব জিনিস এখানে আমদানি করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমাণে নিতে পারবে না। কারণ রফতানির ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিযোগী দেশ হওয়ায় আমরা যা রফতানি করতে পারি, তা ভারতের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়ব এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ষষ্ঠত, জামায়াত পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে বে-ইনসাফী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে।

এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখন আলাদা হবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল, তারা বাস্তব সত্য হিসাবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত জামায়াতের লোকেরা এমন কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাথে শরীক হয়নি যা বাংলাদেশের অনুগত্যের সামান্য বিরোধী বলেও বিবেচিত হতে পারে। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা বাস্তব কারণেই যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তারা কোন প্রতিবেশী দেশের আশ্রয় পাবে না। তাই এ দেশকে বাঁচাবার জন্য জীবন দেয়া ছাড়া তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।"[৩৮]

---

৩৮ পলাশী থেকে বাংলাদেশ, অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.bjilibrary.com

১৯৭১-এর পরিস্থিতি ও জামায়াতের বিশ্লেষণ[৩৯]

১৯৭১ সালের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত সামনে আনা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা মনে করি চিন্তাশীল ও বিবেকবান পাঠকগণের কাছে এ বিশ্লেষণ সমাদৃত হবে।

জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪১ সাল থেকে সংগ্রাম করছে, সে আদর্শের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মজলিসে শূরা ১৯৭১-এর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ করে নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবেই নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পর্যায়ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার পক্ষে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় ১৯৭১-এর জানুয়ারি মাসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।.অবশ্য এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব জামায়াত গ্রহণ করেনি। কিন্তু যদি আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেবার পর এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে জামায়াত-এর কোনরূপ বিরোধিতা করবে না বলেই সিদ্ধান্ত ছিল।

২। জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন কখনই মনে করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের জনগণের সর্বমোট সংখ্যা থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি ছিল। গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনই পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। এ সংখ্যার অনুপাতেই পাকিস্তান জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ৪টি প্রদেশের মোট আসন সংখ্যা ছিল ১৩৮। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কোন নযীর নেই যেখানে সংখ্যাগুরু এলাকা সংখ্যালঘু এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।

৩। জামায়াত একথা বিশ্বাস করতো যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যদি সৎ, যোগ্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন

---

৩৯. *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

করে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার যথাযথরূপে আদায় করা সম্ভব। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ব্যবস্থা করা হয়। আইয়ুব আমলে পূর্ব ও পশ্চিমের সমান সংখ্যক সদস্য ছিল। অবশ্য পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদেও পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পূর্ব পাক প্রতিনিধিগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪। ১৯৪০ সালে লাহরে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের পেশকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালেই পূর্ব পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে যাত্রা শুরু করতে পারতো। তাহলে ১৯৭১ এর সংকট সৃষ্টিই হতো না। কিন্তু ১৯৪৬ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের টিকেটে গোটা ভারত থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রবাদ পুরুষ জনাব হোসেন সোহরাওয়ার্দীই পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তাব পেশ করেন। কায়েদে আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে এ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়। ভারতের দুশমনীর মুকাবিলায় শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে তুলবার যুক্তি দেখিয়েই এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

৫। জামায়াত একথাও বিশ্বাস করতো যে, ভারতের দু'প্রান্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থানের দরুন উভয় এলাকা ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকাই সমর কৌশলের দিক দিয়েও অধিকতর যুক্তিপূর্ণ।

৬। ১৯৭১-এ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ভারতের অভিভাবকত্ব স্বীকার করা ছাড়া পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন উপায় ছিল না। এ কারণেই আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ভারতের নেতৃত্বে প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে বলে জামায়াত মোটেই বিশ্বাস করতে পারেনি। পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভারতের আধিপত্য কায়েম হবার আশংকাই জামায়াতকে সবচেয়ে বেশি পেরেশান করেছিল।

www.bjilibrary.com

৭। জামায়াতের নিকট আদর্শিক সংকট মারাত্মক আকারে দেখা দিল। ইসলামের নামেই এ ভূখণ্ডটি ভারত থেকে আলাদা হয়েছিল। এ সত্ত্বেও নেতাদের মুনাফিকীর কারণে ইসলামী আদর্শের লালন না করায় আদর্শিক শূন্যতা দেখা দিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র আদর্শিক ময়দান দখল করতে চাইল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান শ্লোগানে পরিণত হলো। ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব মতবাদকে সমর্থন করা জামায়াতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এতে ঈমানের প্রশ্ন জড়িত।

৮। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জনগণের নিকট ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ইস্যু বানানো হয়নি। এসব বিষয়ে ভোটাররা শেখ মুজীবকে কোন ম্যান্ডেট দেয়নি। ১৯৭১-এর ১লা জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত যাদের নেতৃত্বে ময়দান গরম করা হচ্ছিল তারা জনগণের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ৬-দফার ভিত্তিতে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জননেতা শেখ মুজিবের পরিকল্পনা ও নির্দেশ ছাড়াই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঢাকায় সর্বত্র পাকিস্তান পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। অথচ এ পতাকা শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ ডিজাইন করেননি। এ পতাকার উদ্ভাবক ও প্রথম উত্তোলনকারী হবার দাবিদার যিনি, তিনি আর যা-ই হোন ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নমীনি ছিলেন না।

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একটা দেশের কিসমতের ফায়সালা এবং সে দেশের আদর্শ ও পতাকার সিদ্ধান্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 'ফরমালি' আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করেননি। রাজপথে শ্লোগানদাতাগণের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে।

৯। দেশের জনগণ ১৯৭১-এর আগে এবং পরে কোন সময়ই ভারতকে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করেনি। ভারতের কাছ থেকে ১৯৪৭-এর পর থেকে এ পর্যন্ত যে আচরণ পাওয়া গেছে তাতে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯৭১-এ ভারতের ভূমিকা যা ছিল তাও তাদের

www.bjilibrary.com

নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থের বলেই জনগণ মনে করে। জামায়াত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে, ভারতের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হবার পর এর আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ভারত এদেশে এমন লোকদেরকেই ক্ষমতায় দেখতে চাইবে যারা তার আধিপত্য মেনে চলবে। ফলে সত্যিকার স্বাধীনতা কতটুকু লাভ হবে তা একেবারেই অনিশ্চিত।

১০। জামায়াতের এ বিষয়েও প্রবল আশংকা ছিল যে, যাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বানাবার প্রচেষ্টা চলছে তারা ক্ষমতাসীন হলে তাদের প্রধান টার্গেটই হবে ইসলাম। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পথ তারা চিরতরে রুদ্ধ করার ব্যবস্থা করবে। ভারতের তাবেদারী করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকবে না। ভারতের সাথে আদর্শিক দূরত্ব দূর করাই তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণামে এ দেশের স্বাধীন সত্তা হারাবার আশংকাও রয়েছে।

জামায়াতের সামনে ৩টি পথ[৪০]

আদর্শভিত্তিক সংগঠন হিসেবে জামায়াতের মজলিসে শূরায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনটি পথের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা সম্ভব ও সমীচীন তা বিবেচনা করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছে। পথ তিনটি হলো :

১। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।

২। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে নিষ্ক্রিয় হয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা।

৩। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যুলুম থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবং জনগণকে ভারতের আধিপত্য সম্পর্কে সাবধান করা।

প্রথম পথটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য ছিল না :

ক) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে আদর্শিক কারণেই সহযোগিতা করা সঠিক হতো না।

---

৪০. *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

খ) আওয়ামী লীগ নেতাদের মতো জামায়াত নেতাদের ভারতে আশ্রয় নেবার চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না।

গ) ভারতের হাতে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তুলে দেবার মতো মনোভাব জামায়াতের থাকার কথা নয়।

ঘ) জামায়াত এটাকে অনিশ্চিত পথ মনে করেছে বলে এ পথে যেতে পারেনি।

ঙ) যেটুকু স্বাধীনতা আছে ভারতের আধিপত্যে তাও হারাবার আশংকাই জামায়াত করেছে।

দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বাস্তবেই অসম্ভব। রাজনীতিতে নিরপেক্ষতার কোন সুযোগ নেই। রাজনীতি না করার সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো নিরপেক্ষ থাকা যায়। জামায়াত একটি আদর্শবাদী আন্দোলন এবং সুশৃংখল সংগঠন। সংগঠনের হাজার হাজার কর্মীকে কাজ না দিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখার মানে সংগঠন ভেংগে দেয়া। ১৯৭০-এর নির্বাচনের যে ১২ লাখ লোক জামায়াতকে ৬৫টি আসনে ভোট দিয়েছে তারা ঐ পরিস্থিতিতে কী করবে তার পথনির্দেশনা জামায়াতের কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইবে ? এসব কারণে জামায়াতের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা স্বাভাবিক ছিল না। তাই জামায়াত একমাত্র বিকল্প পথ হিসাবে যা করা কর্তব্য তাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ভারত ভীতির কারণ

ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতার কারণে কিছু বামপন্থী প্রায় সকল ডানপন্থী ও সকল ইসলামী দলগুলোসহ প্রায় সকল সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ভারতের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সঠিক মনে করেনি। ভারতের সাহায্য ব্যতীত যদি মুক্তিযুদ্ধ হতো তাহলে হয়ত তারা সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো।

এখানে ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণের কিছু স্মৃতি তুলে ধরা হলো। যা উপরোক্ত কথাগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করবে।

www.bjilibrary.com

(ক) কংগ্রেস কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতার স্মৃতি

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর দাবি ছিলো ভারতীয়রা সকলে মিলে একটি জাতি। আর এই জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হচ্ছে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এ সংগঠনটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলো। অতএব বৃটিশ সরকার দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার সময় এই দলটির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে যেতে হবে। অন্যদিকে "অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ" দাবি করলো যে উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি। অতএব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

কংগ্রেসের 'এক জাতি তত্ত্বে'র বিপরীতে মুসলিম লীগের 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (two nation theory) সমর্থন করে গোটা উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কোমর বেঁধে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে। মি. গান্ধীতো বলেই ফেললেন, "ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করার আগে আমার অঙ্গচ্ছেদ কর।"

> *"যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত ত্যাগ করতে ব্রিটিশ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন কংগ্রেসই যে তার একমাত্র যথার্থ ও একক উত্তরাধিকারী, এই দাবির বিরুদ্ধে সব মহল থেকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়।*
>
> *১৯৪৫-৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় খুবই ভালো করে, কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের দাবি প্রমাণে সে ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মোট মুসলমান ভোটের মধ্যে শতকরা ৮৬.৭ ভাগ ভোট পায়; অথচ এর বিপরীতে কংগ্রেস পায় শতকরা ১.৩ ভাগ।*
>
> *প্রদেশগুলোতে সব মুসলিম ভোটের মধ্যে মুসলিম লীগ ভোট পায় শতকরা ৭৪.৭ ভাগ, আর কংগ্রেস পায় শতকরা ৪.৬৭ ভাগ।"*[৪১]

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন ১৯৪৫ সনে এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর নির্বাচন ১৯৪৬ সনে অনুষ্ঠিত হয়।

---

৪১. *জয়া চ্যাটার্জি, বেঙ্গল ডিভাইডেড : হিন্দু কমিউনালিজম এন্ড পার্টিশান, বাংলা অনুবাদ ঃ আবু জাফর, বাঙলা ভাগ হল।*

www.bjilibrary.com

দেশ ভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে দেখে হিন্দুদের উগ্র অংশটি মারমুখো হয়ে ওঠে। তারা ভাবলো, 'ভারত মাতা'কে ভাগ করার আন্দোলন ঠেকাতে হলে মুসলিমদেরকে নির্মূল করতে হবে। এই চিন্তারই ফসল ১৯৪৬ সনের দিল্লী রায়ট। এর পর ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগাস্ট রায়ট শুরু হয় বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতায়। কলকাতা রায়টে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। ক্রমশ হিন্দু-মুসলিম রায়ট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সনের ১৮ই জুলাই বৃটেনের হাউস অব কমন্স-এ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি উত্থাপিত The Indian Independence Act 1947 পাস হয়। কংগ্রেস যখন দেখলো দেশ ভাগ ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন দলটি দাবি করলো পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশকে মুসলিম ও অমুসলিমদের ঘনত্বের নিরিখে দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে। শত চেষ্টা করেও মুসলিম লীগ পাঞ্জাব প্রদেশ ও বাংলা প্রদেশের বিভক্তি ঠেকাতে পারলো না।

বৃটিশ সরকারকে পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশ ভাগ করতে সম্মত করাতে পেরে কংগ্রেস অনিচ্ছাসত্ত্বেই দেশ ভাগ মেনে নেয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন, খণ্ডিত পাঞ্জাব ও খণ্ডিত বাংলা নিয়ে পাকিস্তান হবে একটি দুর্বল রাষ্ট্র। ফলে এই রাষ্ট্র বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।

সেই সময় সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন,
'আমি জানিনা পাকিস্তানে তাঁরা কী করতে পারবেন, তাঁদের ফিরে আসতে খুব বেশিদিন লাগবে না।"[৪২]
জওহর লাল নেহরু তাঁর ভাইপো বি.কে. নেহরুকে বলেন,
'দেখা যাক কতদিন ওরা আলাদা থাকে।'[৪৩]

খ) ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখল করে নেওয়ার স্মৃতি

হায়দারাবাদ ছিলো বৃটিশ শাসিত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে সবচে' বড়ো দেশিয় রাজ্য। আয়তনে এটি ছিলো বৃটেনের চেয়েও বড়ো।

---

৪২. *Jaswant Singh, Jinnah : India-Partition-Independence, বাংলা অনুবাদ: শামসুল ইসলাম হায়দার, জিন্নাহ : ভারত-দেশভাগ-স্বাধীনতা।*

43. *Jaswant Singh, Jinnah : India-Partition-Independence, বাংলা অনুবাদ: শামসুল ইসলাম হায়দার, জিন্নাহ : ভারত-দেশভাগ-স্বাধীনতা।*

www.bjilibrary.com

The Indian Independece Act 1947-এ প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী হায়দারাবাদের ঐতিহ্যবাহী বংশের নিযাম হায়দারাবাদকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত হায়দারাবাদ আক্রমণ করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঁচটি রুটে হায়দারাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। নিযামের কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিলো না। তাঁর অনুগত ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রী কাসেম রিজভীর নেতৃত্বে রেযাকার বাহিনী গঠন করে ভারতের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনীর সাথে তারা এঁটে উঠলো না। ভারতীয় সৈন্যরা প্রাসাদে ঢুকে নিযামকে ঘিরে ফেলে। ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি The Instrument of Accession to India স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।

এইভাবে ভারত হায়দারাবাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়।

গ) ভারত কর্তৃক জম্মু-কাশ্মীর দখল করে নেওয়ার স্মৃতি

দূর অতীত থেকে শুরু করে আঠারো শতক পর্যন্ত কাশ্মীর মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১৮১৯ সনে পাঞ্জাবের শিখ রাজা রণজিৎ সিং দুররানী বংশের হাত থেকে কাশ্মীর কেড়ে নেন। গুলাব সিং নামক একজন প্রশাসকের সার্ভিসে সন্তুষ্ট হয়ে রণজিৎ সিং ১৮২০ সনে তাঁকে জম্মুর রাজা বানান। ১৮৪৫ -১৮৪৬ সনে ইংরেজদের সাথে শিখদের যুদ্ধ হয়। এই সময় জম্মুর রাজা নিরপেক্ষ থাকেন। যুদ্ধের পর ইংরেজগণ ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে জম্মুর রাজা গুলাব সিং-এর হাতে কাশ্মীর তুলে দেন। গুলাব সিং-এর পর যথাক্রমে রণবীর সিং, প্রতাপ সিং এবং হরি সিং জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হন।

বৃটিশ শাসনকালে জম্মু-কাশ্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসেবে পরিগণিত ছিল। ১৯৪৭ সনে বৃটিশগণ উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার সময় দেশিয় রাজ্যগুলোর সামনে তিনটি অপশন রেখে যায়। যথা-

(১) রাজ্য ইচ্ছা করলে ভারতে যোগ দিতে পারবে।
(২) রাজ্য ইচ্ছা করলে পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে।
(৩) রাজ্য ইচ্ছা করলে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বতন্ত্র থাকতে পারবে।

www.bjilibrary.com

জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের শতকরা ৭৭ জন ছিলেন মুসলিম। তাঁরা চাচ্ছিলেন পাকিস্তানে যোগ দিতে। মহারাজা হরি সিং চাচ্ছিলেন স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর ছিলো "দি ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের" নিকট অতি লোভনীয় একটি স্থান। তদুপরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন কাশ্মীরের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি চাচ্ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। নানা কৌশল ও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় মহারাজার ওপর। তিনি এই চাপ প্রতিরোধ করতে না পেরে ১৯৪৭ সনের ২৭শে অক্টোবর মহারাজা হরি সিং Instrument of Accession to India নামক দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। অতি দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা গোটা জম্মু-কাশ্মীর দখল করে ফেলে। কেড়ে নেওয়া হয় জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীনতা।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতার বিরোধিতা এক কথা নয়

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতার বিরোধিতা করা এক কথা নয়। ১৯৭১-এ যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি, তারা সকলে দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। ভারতের অধীন হবার ভয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার আশংকার কারণে তারা ঐ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলো। তারা তখনও অখণ্ড পাকিস্তানের নাগরিকই ছিল। তারা রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত ছিল না বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করেনি বরং নিজ দেশের কল্যাণের চিন্তা করেই তারা ঐ অবস্থান নিয়েছিলেন।

ইংরেজ হঠাও আন্দোলনে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীন হতে না হয় সে জন্য মুসলিম লীগ পৃথকভাবে আন্দোলন চালায়। তারা ভারত বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান দাবি করে। ফলে মুসলিম লীগের আন্দোলন একই সঙ্গে ইংরেজ ও কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মতবিরোধকে কতক কংগ্রেস নেতা

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রচার করত। অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর লিখিত পলাশী থেকে বাংলাদেশ বইতে এ সম্পর্কে লিখিছেন-

"কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাবি করতো এবং গোটা ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ জানত যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ইংরেজের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েও মুসলমানদেরকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীন থাকতে হবে। তাই ঐ স্বাধীনতা দ্বারা মুসলমানদের মুক্তি আসবে না। তাই মুসলিম লীগ পৃথকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চালালো এবং ভারত বিভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান দাবি করল। ফলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন একই সঙ্গে ইংরেজ ও কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেল।

কংগ্রেস নেতারা মুসলিম লীগ নেতাদেরকে ইংরেজের দালাল ও দেশের স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দিতে লাগল। কংগ্রেসের পরিকল্পিত স্বাধীনতাকে স্বীকার না করায় মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী বলাটা রাজনৈতিক গালি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হতে পারে না।

ঠিক তেমনি যে পরিস্থিতিতে ভারতের আশ্রয়ে বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, সে পরিবেশে যারা ঐ আন্দোলনকে সত্যিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বলে বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদেরকে স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দেয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যতই প্রয়োজনীয় মনে করা হোক, বাস্তব সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

বিশেষ করে স্বাধীনতার নামে প্রদত্ত শ্লোগানগুলোর ধরন দেখে ইসলামপন্থীরা ধারণা করতে বাধ্য হয় যে, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ বানাতে চায়, তারা এদেশে ইসলামকে টিকতে দেবে না, এমনকি মুসলিম জাতীয়তাবোধ নিয়েও বাঁচতে দেবে না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের (মুসলিম জাতীয়তার বিকল্প) এমন তুফান প্রবাহিত হলো যে, মুসলিম চেতনাবোধসম্পন্ন সবাই আতংকিত হতে বাধ্য হলো। এমতাবস্থায় যারা ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারল না, তাদেরকে দেশের দুশমন মনে করা একমাত্র রাজনৈতিক হিংসারই পরিচায়ক। ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারতের অধীন হবার আশংকা যারা করেছিল, তাদেরকে দেশপ্রেমিক মনে না করা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ এত কিছু লিখে গেছেন, যা অন্য কেউ লিখলে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে পরাজিত পক্ষকে বিজয়ী পক্ষ দেশদ্রোহী হিসাবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে এ ধরনের অপবাদ টিকে থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

আজ এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবিদার কিছু নেতা ও দলকে দেশের জনগণ বর্তমান ভারতের দালাল বলে সন্দেহ করলেও বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেনি, সে সব দল ও নেতাদের সম্পর্কে বর্তমানে এমন সন্দেহ কেউ প্রকাশ করে না যে, এরা অন্য কোন দেশের সহায়তায় এ দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে চায়।

তারা গোটা পাকিস্তানকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে রক্ষা করা উচিত বলে বিবেচনা করেছিল। তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবার পর তারা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে যায়নি। যদি বর্তমান পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে ভৌগোলিক দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হতো, তাহলেও না হয় এ সন্দেহ করার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা হয়তো আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তাহলে তাদের ব্যাপারে আর কোন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকতে পারে? বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা এবং দেশকে রক্ষা করার লড়াই করার গরজ তাদেরই বেশি থাকার কথা।

বাংলাদেশের নিরাপত্তার আশংকা একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হতে পারে। তাই যারা ভারতকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করে, তারাই হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। কিন্তু যারা ভারতের প্রতি অবিশ্বাসের দরুন '৭১ সালে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তায় পৃথক রাষ্ট্র বানাবার পক্ষে ছিল না, তারাই ভারতের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন দেবে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার মানসিক, আদর্শিক ও ঈমানী প্রেরণা তাদেরই, যারা এদেশকে একটি মুসলিম প্রধান দেশ ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সাথে ভাষার ভিত্তিতে যারা বাঙালি জাতিত্বের ঐক্যে বিশ্বাসী, তাদের দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার আশা কতটা করা যায় জানি না। কিন্তু একমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবোধই যে বাংলাদেশের পৃথক সত্তাকে রক্ষা করতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিতদের হাতেই বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ।[৪৪]

রাজনৈতিক মতপ্রার্থক্য ও স্বাধীনতার বিরোধিতা এক কথা নয়। এ কথাটি আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে সক্ষম হবো তত তাড়ারাড়ি আমরা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারবো।

অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর লেখা পলাশী থেকে বাংলাদেশ বইয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদাহরণ টেনে রাজনৈতিক মত প্রার্থক্য ও স্বাধীনতার বিরোধিতা যে এক কথা নয় তা নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন-

---

৪৪. *পলাশী থেকে বাংলাদেশ, - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

শেরে বাংলার উদাহরণ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সে ঐতিহাসিক দলিলের প্রস্তাবক ছিলেন। অথচ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে এ ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মিলান এবং পাকিস্তান ইস্যুতে ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেন। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়িতে সসম্মানে থাকতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হতে পারতেন। কিন্তু যখন পাকিস্তান হয়েই গেল, তখন তাঁর মতো নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক কিছুতেই নিজের জন্মভূমিতে না এসে পারেন নি। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও এদেশের জনগণ শেরে বাংলাকে পাকিস্তানের বিরোধী মনে করেনি। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাঁরই নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের উপর এত বিরাট বিজয় লাভ করে। অবশ্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে গালি দিয়ে তাঁর প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় সরকারই তাঁকে প্রথমে গোটা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরও নিযুক্ত করে। এভাবেই তাঁর মতো দেশপ্রেমিককেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহী বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদাহরণ

জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে যখন বংগদেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত হয়, তখন গোটা বঙ্গদেশ ও আসামকে মিলিয়ে "গ্রেটার বেঙ্গল" গঠন করার উদ্দেশ্যে তিনি শরৎ বসুর সাথে মিলে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো না। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের স্বার্থরক্ষা এবং কোলকাতা মহানগরীকে এককভাবে হিন্দুদের হাতে তুলে না দিয়ে বাংলা ও আসামের মুলসমানদের প্রাধান্য রক্ষাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি পূর্ববঙ্গে আসেন, তখন তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে পাকিস্তানের দুশমন বলে ঘোষণা করা হয় এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য তিনিই পরে পাকিস্তানের উযিরে আযম হবারও সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের গালি দ্বারা কোন দেশপ্রেমিক জননেতার জনপ্রিয়তা খতম করা সম্ভব হয়নি।

তাই '৭১-এর ভূমিকাকে ভিত্তি করে যে সব নেতা ও দলকে "স্বাধীনতার দুশমন" ও "বাংলাদেশের শত্রু" বলে গালি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যতই বিষোদগার করা হোক, তাঁদের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও জনপ্রিয়তা ম্লান করা সম্ভব হবে না।

www.bjilibrary.com

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা আগমন

১৯৭১ সনের ২২শে ডিসেম্বর একটি ভারতীয় বিমানে করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদ ঢাকা পৌঁছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করতে না পারায় পাকিস্তানের জনগণ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহহিয়া খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহহিয়া পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯শে ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভূট্টো আমেরিকা থেকে পাকিস্তান পৌঁছে দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭২ সনের ৩রা জানুয়ারি করাচির এক জনসভায় জুলফিকার আলী ভূট্টো শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।৭ই জানুয়ারি দিবাগত রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে তাঁকে লন্ডনের পথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় তিনি পৌঁছেন হিথরো বিমান বন্দরে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমান বন্দরে তাঁকে রিসিভ করেন। তিনি ওঠেন হোটেল ক্ল্যারিজে। সন্ধ্যায় তিনি ১০ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমান 'কমেট' শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে দিল্লীর 'পালাম' বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর তিন প্রধান প্রমুখ তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

অতপর তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। বিকেল তিনটায় 'কমেট' শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করে। অগণিত

www.bjilibrary.com

জনতার ভীড়। তেজগাঁও থেকে রেসকোর্স পৌঁছতে তাঁর প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগে যায়। রেসকোর্সে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন-

"আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি কামনা করি আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মা-বোনের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই।"

"বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুসিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরই এর স্থান। মুসলিম সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বে-ইজ্জত করেছে। আমি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। যার যা ধর্ম তা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালন করবে।"[৪৫]

স্বাধীন বাংলায় আওয়ামী শাসন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিপূর্বে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহম্মদকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। এই সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার নতুন উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ পুনরায় ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১২ জানুয়ারি এক ঘোষণায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

---

৪৫. *এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।*

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বাংলাদেশে ভারতীয় কতিপয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান।

কলকাতা সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এমন প্রস্তাবে ইন্দিরা গান্ধী অপ্রস্তুত হয়ে যান এবং বলেন, বাংলাদেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতিতো এখনও নাজুক। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

অবশ্য এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ়তার কারণে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে নাখোশ করা সমীচীন মনে করেননি। তাই ১৯৭২ সালের ১৭ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নি:সন্দেহে এটি ছিলো শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড়ো কৃতিত্ব।

www.bjilibrary.com

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এটাই ছিলো প্রথম অধিবেশন। মজলিসে শূরাতে পূর্ব-পাকিস্তানের ৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ঘটনাক্রমে অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ওখানে উপস্থিত থাকায় আমীরে জামায়াত তাদেরকেও হাজির হতে দাওয়াত দেন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করলেন। এ বিষয়ে তার দীর্ঘ বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ :

"পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য ১০ কোটি ভারতীয় মুসলমানদেরকে ডাক দিলেন। শ্লোগান ছিলো "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ ডাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সাড়া দিয়েছে বাঙালি মুসলমান ও ভারতের সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা।

নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছেন এবং মুসলিম জাতির সমর্থনে তা কায়েম হয়েছে। তারা ইসলামের দোহাই দিয়ে সমর্থন আদায় করলেও ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রটি গড়ার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেননি। ফলে ইসলামের নামে কায়েম করা রাষ্ট্রটি তারাই পরিচালনা করেন, যারা বংশে ভারত উপমহাদেশের লোক হলেও মন-মগজ ও চরিত্রে ইংরেজই ছিলেন।

শাসকগণ ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতিতেই গড়া থাকায় তারা ইসলামী আদর্শে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার যোগ্য ছিলেন না। ইসলামের বন্ধনই পূর্ববঙ্গের মুসলমান এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তের মুসলমানদেরকে এক রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত করেছিলো। শাসকগণ ইসলামের ঐ বন্ধনকে মযবুত করার পরিবর্তে অমুসলিম শাসকদের মতোই দেশ শাসন করতে থাকলেন।

পাকিস্তান মুসলিম জনগণের ভোটের মাধ্যমেই জন্মলাভ করে। কিন্তু তাদের নির্বাচিত নেতারা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণদাবিকে দাবিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে জনগণের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান গণবিরোধী সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করার সুযোগ পেয়ে যান।

www.bjilibrary.com

যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের জন্ম দিলো এর লালন না করায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকাভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা ঐ শূন্যস্থান পূরণ করে। এ সত্ত্বেও যদি জনগণের নির্বাচিত সরকারকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারতো না এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিকট এমন অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হতো না।

এখনও যদি অবশিষ্ট পাকিস্তানের শাসকগণ মুসলিম জাতীয়তার চেতনার লালন করে দেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা না চালান, তাহেল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচি ও পাঠান জাতীয়তা দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে সক্ষম হবে।"

আমীরে জামায়াতের উপরিউক্ত বক্তব্য এমন এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, মজলিসে শূরার সকল সদস্য অবশিষ্ট পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারেও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। মি. ভুট্টোর হাতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কতটুকু নিরাপদ হবে এ বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অবশেষে মাওলানা জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে দৃঢ়তার সাথে ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেশবাসীকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

মাওলানা মওদূদী ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার উদ্বোধনী ভাষণের পরপরই মাওলানা আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৭০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শূরার অধিবেশনে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিলো যে, জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রধানকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুতেই এর অনুকূল নয়। তাই নতুন কোন আমীরের উপর দায়িত্ব না দিলে জামায়াত ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মজলিসে শূরা আবেগতাড়িত হয়ে মাওলানার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এতে জামায়াতের যে ক্ষতি হয়েছে সে কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তাফহীমুল কুরআনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, সিরাতে সারওয়ারে আলমের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে

www.bjilibrary.com

আমীরে জামায়াতের বিরাট দায়িত্ব থেকে অবসর না দিলে এ দু'টো কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যগত কারণেও তাঁকে দায়িত্বমুক্ত করা জরুরি বলে তিনি মজলিসে শূরাকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দিলেন।

আমীরে জামায়াতের এ বক্তব্যের পর তেমন কোন আলোচনা ছাড়াই শূরা সদস্যগণ মাওলানাকে অব্যাহতি দেবার জন্য মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত বলে বুঝা গেলো। তাই মাওলানার বক্তব্যের পর সবাইকে নিশ্চুপ দেখে তিনি জানতে চাইলেন, "আপনারা কি আমাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত আছেন ?" সবাই একসাথে সম্মতিসূচক আওয়াজ দিলে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে, সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সবাই অনুভব করলেন যে, মাওলানার অসুস্থতার কারণে তাফহীম ও সিরাতের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্তটি খুবই সঠিক হয়েছে।

আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর। তিনি যতবার জেলে গিয়েছেন কারারুদ্ধ থাকাকালে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করেছেন। যতবার নির্বাচন হয়েছে প্রতিবারই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। হয়তো কোন রুকন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভোটই দেননি।

মাওলানা ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার পর আগের মতোই আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা, না নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হলো। এ পর্যন্ত যে নিয়মে নির্বাচন হয়েছে তা অত্যন্ত সহজ। রুকনগণের নিকট ব্যালট পেপার বিলি করার পর তাদের ভোট সংগ্রহ করে গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হতো। জামায়াতের কোন পর্যায়েই নির্বাচনে প্রার্থিতা নেই, কেউ প্রার্থী হয় না। ভোট গণনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যার নামে পড়ে নির্বাচন কমিশন তাকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন।

মজলিসে শূরার বৈঠকে একজন প্রশ্ন তুললেন যে, মাওলানা মওদূদীর পর জামায়াতের আমীর পদের জন্য কে সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা রাখে বিবেচনা করা সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রুকনদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

www.bjilibrary.com

বিশেষ করে মহিলা রুকনদের জন্য এটা আরও কঠিন ব্যাপার। মাওলানা মওদূদীর যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। মাওলানার অব্যাহতি নেওয়ার পর ভোটাররা এ পদের জন্য কাকে ভোট দেবেন এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোন ধারণা দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ প্রশ্নটির গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করলেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ শূরার সামনে আসতে থাকলো। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচনের জন্য নতুন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সে পদ্ধতি হলো :

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তিনজনের একটা প্যানেল গঠন করবে। শূরার সদস্যগণ প্রত্যেকে তিন জনের নাম প্রস্তাব করবেন। যাকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করবেন তাঁর নাম প্রথমে লিখবেন। এরপর দ্বিতীয় যোগ্য লোকের নাম ও সর্বশেষে তৃতীয় যোগ্য ব্যক্তির নাম। যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ভোট যিনি পাবেন প্যানেলে তাঁর নাম প্রথমে লেখা হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোগ্য ব্যক্তির নাম পরপর থাকবে।

নির্বাচনী ব্যালটে নির্বাচন কমিশন এ ক্রম অনুযায়ীই তিনটি নাম মুদ্রিত করবে। তবে রুকন ভোটারদেরকে এ ইখতিয়ার দেওয়া হবে, আমীরে জামায়াত হিসাবে তারা এ তিনজনের যে কোন একজনকে অথবা এ তিনজনের বাইরে যে কোন একজন রুকনকে ভোট দিতে পারবেন।

আমীরে জামায়াত নির্বাচনের জন্য প্যানেল গঠন

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যগণ প্যানেল নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট দেন। ভোট গণনার পর নির্বাচন কমিশনার নিম্নক্রম তিনজনের নাম ঘোষণা করেন :

১) মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ
২) প্রফেসর গোলাম আযম ও
৩) প্রফেসর খুরশীদ আহমদ।

এ প্যানেল ঘোষণার পর অধ্যাপক গোলাম আযম বিস্মিত হন এবং বৈঠক শেষে শূরা সদস্যদের অনেকের সাথেই বলেন যে, আল্লাহ আমাকে যে ভূখন্ডে পয়দা করেছেন আমি যদি সেখানে যেতে না-ও পারি তবুও বিদেশে থাকতে হলেও ঐ এলাকার ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করবো। আমার পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। তাই প্যানেলে আমার নাম থাকা অর্থহীন।

www.bjilibrary.com

দালাল আইনে অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৯৭২ সনের ২৪শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ" জারি করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যেইসব সিভিলিয়ান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছিলো তাদের বিচারের জন্য তৈরি হয় এই আইন।

১৯৭২ সনের মার্চ মাসেই দালাল আইনের অপব্যবহার দেখে আতাউর রহমান খান বলেন, 'জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য'।

তিনি বলেন, 'যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোনো উপকার হবে না।'[৪৬]

[উল্লেখ্য যে ১৯৭২ সনের ২৯শে অগাস্ট সরকার দালাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই সংশোধিত আইনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন সাজা তিন বছর কারাদণ্ড করা হয়।]
১৯৭২ সনের ২০শে নভেম্বর "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইনে" পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্ণর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক আবুল ফজল, ড. আলিম আল-রাজী প্রমুখ ব্যক্তি "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইনে"র বিরোধিতা করতে থাকেন। বন্দি ছিলো বিপুল সংখ্যক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোন তথ্য-উপাত্ত সরকারের হাতে ছিলো না।

১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর সব কিছু বিবেচনা করে শেখ মুজিবুর রহমান দালাল আইনে আটক ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর মুসলিম লীগ, ডিমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর ৩৪,৬০০ জন নেতা ও কর্মী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৪৭]

---

৪৬. *মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল।*

৪৭. *এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ।*

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ এবং হিন্দু ও খৃস্টানদের একটি অংশ অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ছিলেন বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো এবং মহাসচিব ছিলেন অধ্যাপক ননী গোপাল বড়ুয়া। তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন।

চাকমা জনগোষ্ঠী তাঁদের রাজা ত্রিদিব রায়ের অনুসরণে অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ভাই জনি রায় এবং রাংগামাটির অজিত কুমার চাকমা, নোয়াচন্দ্র চাকমা, নীরোলেন্দু চাকমা প্রমুখ দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

খৃস্টানদের মধ্য থেকে রাংগামাটি ব্যাপ্টিস্ট মিশনের রেভারেন্ড শৌল্যা প্রু, মিসেস ম্রাসং চিং, মিসেস ত্রুই, মিস টেলার, মাস্টার চং সুই প্রু এবং রাংগামাটি ক্যাথলিক মিশনের উইলিয়াম লুসাই প্রমুখ দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

হিন্দুদের মধ্য থেকে ফরিদপুরের দীপ্তি কুমার বিশ্বাস, গোপালগঞ্জের শান্তি রঞ্জন শীল, বরিশালের নরেশ পাল, ভোলার অঞ্জলী পোন্দার বি.এ. (মহিলা), সিরাজগঞ্জের মনোরঞ্জন দত্ত, সুশীল কুমার দত্ত, জয়পুরহাটের মঙ্গলা রাম, মোমেনশাহীর শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বশর্মা প্রমুখ দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' গঠন

১৯৭২ সনের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে একটি প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করেন এবং ১ ফেব্রুয়ারি তারিখ থেকে এই আদেশ কার্যকর গণ্য হবে বলে নির্দেশ দেন।

এই আদেশে বলা হয় যে 'সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।'

'আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মনে করতেন যে প্রাতিষ্ঠানিক কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ দ্রুততর গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী থাকা উচিত।'

www.bjilibrary.com

'আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর মতো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি একটি হুমকি হিসেবেই মনে করতেন।'

'প্রকৃতপক্ষে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো।'[৪৮]

স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর পুনর্গঠন

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' কায়েম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে জামায়াতে ইসলামীও ভাগ হয়। পাকিস্তান এলাকায় বসবাসকারী রুকনগণ 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' নামে পৃথক সংগঠন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এ এলাকায় বসবাসকারী রুকনগণের পক্ষ থেকে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে নতুন করে সংগঠন কায়েমের উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রকাশ্যে কোন সম্মেলন ডেকে তা করার কোন পরিবেশ ছিলো না। তাই গোপনেই এর উদ্যোগ নিতে বাধ্য হতে হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর নিরাপত্তার প্রয়োজনেই জামায়াতের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। জামায়াতের প্রাদেশিক কোন দায়িত্বে ছিলেন এমন কোন একজনের পক্ষেই নতুন করে সংগঠন চালু করার উদ্যোগ নিলে তা সঠিক হয়। কিন্তু এমন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন যিনি ঢাকা শহরে প্রকাশ্যে চলাফেরা করলে জামায়াতের বাইরের কোন লোক চিনবে না।

জামায়াতের প্রাদেশিক সেক্রেটারি জনাব আবদুল খালেক জয়েন্ট সেক্রেটারি ও শ্রম-বিভাগের সেক্রেটারি মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এ উদ্যোগ নেবার অবস্থায় ছিলেন না। ১৯৭১ সালের শেষ দিকে মোমেনশাহী জেলার আমীর মাওলানা আবদুল জাব্বারকে প্রাদেশিক সাংগঠনিক সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ঢাকায় আনা হয়। তিনি ঢাকায় মোটেই পরিচিত ছিলেন না। একমাত্র তার পক্ষেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো। সংগঠন শুরু করার জন্য তিনিই উদ্যোগ নিলেন। প্রথমে

---

৪৮ *মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল।*

www.bjilibrary.com

তিনি যাদেরকে সাথে পেলেন তারা হলেন, ঢাকা শহর জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রাদেশিক অফিসের সহকারী জনাব আমীনুর রহমান মঞ্জু এবং চাষীকল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি ডা. ময়েযুর রহমান। মাস্টার শফীকুল্লাহ একজায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন। আমীনুর রহমান মঞ্জু তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এইভাবে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ

দেশ ও জাতিগঠনের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অশান্তি দূরীকরণ। কিন্তু আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এমনটি দেখা যায়নি। হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অতীত ভূমিকার সূত্রধরে পাকিস্তান সরকার হিন্দু মহাসভা কিংবা পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করেনি। অথবা পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকার দরুন কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ কিংবা কারো নাগরিকত্ব বাতিল করেনি। শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ১৯৪৭ সালের ভূমিকা পাকিস্তানের জন্মলগ্নে ঘোর আপত্তিজনক হলেও পরবর্তীকালে পাকিস্তানে তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ণ করা হয়। অথচ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ সরকার মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পি, ডি, পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক মতভেদ প্রসূত অতীত ভূমিকার দরুন হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে দালাল আইনে আটক কিংবা হতাহতের শিকার হতে হয়।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক ও সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম এ জলিল, কমরেড সিরাজ সিকদারসহ অসংখ্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা নিপীড়নের নির্মম শিকার হন। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অবৈধভাবে সাবেক ডাকসুনেতা, ভাষা সৈনিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর নেতা হবার অপরাধে (?) আরো ৮২ জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে জন্মগত নাগরিকত্বহরন করা হয়।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আব্দুস সুবহানকে পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া জামায়াত নেতৃবৃন্দ মাওলানা মওদূদীর সাথে পরামর্শ করে লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ সেখান থেকে ঢাকায় প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা সহজ হবে। এরপর পাসপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। পাসপোর্ট পাওয়ার পরপরই মাওলানা আবদুর রহীম করাচী চলে যান। অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আব্দুস সোবহান ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে থেকে যান।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক মি. ভুট্টো ফরমান ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানী যারা পাকিস্তানে রয়েছেন তারা প্রেসিডেন্টের অনমুতি ছাড়া পাকিস্তানের বাইরে যেতে পারবেন না। ফলে তাদের লন্ডন যাবার প্রচেষ্টা সফল হলো না।

জামায়াতের দায়িত্বশীল মহলে জানাজানি হয়ে গেলো যে, যারা ঘটনাক্রমে পাকিস্তানে রয়ে গেছে তাদেরকে সরকার অন্য কোথাও যেতে দিচ্ছে না। তাই তাদেরকে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।

রহীম ইয়ার খান জেলার আমীর জনাব আশরাফ বাজওয়া মাওলানা আবদুস সুবহান সাহেবকে অফার দিলেন তিনি যেন ঐ জেলায় বসবাস করেন। তাকে বলা হলো যে, তাঁর এলাকায় যে পরিমাণ জমিজমা ছিলো এর দ্বিগুণ জমি তাঁকে দান করা হবে। তিনি তাঁর পরিবারকে নিয়ে আসলে তাদের বসবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে। মাওলানা আবদুস সুবহান আবেগপূর্ণ ভাষায় শুকরিয়া জানান এবং দোয়া চান যেন দেশে ফিরে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন চিন্তা-ভাবনা তাদের মোটেই ছিলো না।

জেনারেল (অব.) ওমরাও খান হঠাৎ একদিন ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে অধ্যাপক গোলাম আযমের কক্ষে হাজির হলেন। তিনি এক সময় পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর জি ও সি (General officer

www.bjilibrary.com

commanding) ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি জামায়াতের নমিনী ছিলেন। সাক্ষাতকালের ঘটনা অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

"বিনা খবরে তিনি (জেনারেল অব. ওমরাও) সোজা আমার কামরায় ঢুকে পড়লেন। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একটু বিব্রত বোধ করলেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। কোলাকুলি করার সময় তিনি কিছু সময় আঁকড়ে ধরে থাকলেন এবং আমাকে চুমু দিলেন।

জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি তেমন কোন ভূমিকা ছাড়াই আমার উদ্দেশ্যে বলে ফেললেন, "জানতে পারলাম যে, আপনাকে পাকিস্তানেই থাকতে হচ্ছে। সরকার বাইরে যেতে দিচ্ছে না। তাই লাহোরে আমার যে বাড়িটি ভাড়া দিয়ে রেখেছি তা আপনাকে গিফট হিসাবে দেবার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছি। আমার এ অফার কবুল করলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো।"

আমি তাঁর মহব্বত ও আন্তরিকতার শুকরিয়া জানিয়ে কিছুটা হালকাভাবেই বললাম, "ভাই, আল্লাহ যদি কোন দিন ঢাকায় নিজের বাড়িতে থাকার সুযোগ দেন সে অপেক্ষায়ই থাকবো। আর কোথাও বাড়ির মালিক হবার ইচ্ছা নেই। তাছাড়া আমি যখনি সুযোগ পাই পাকিস্তান থেকে বাইরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

তিনি নিশ্চুপ বসে রইলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দু'চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "আপনার অফার গ্রহণ না করায় মনে এতো কষ্ট পাবেন বলে ধারণা করিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" তিনি বললেন, "আপনার ন্যায় দীনের একজন খাদিম গৃহহীন অবস্থায় আছেন, এতেই আমি বেদনা বোধ করছি।" তাঁর এ আন্তরিক সহানুভূতি আমার অন্তর স্পর্শ করলো। আমি অনুভব করলাম যে, তিনি খুবই আন্তরিক বলেই চোখের পানিতে প্রমাণ দিলেন।"[৪৯]

---

৪৯ *জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লীতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ১৩ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ১৬ মে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যুক্ত ইশতেহারে শেখ মুজিব কার্যত ভারতের নিকট দাসখত দিয়ে আসেন। যেমন-

১। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ী ভারতকে দান।

২। বছর শেষে বাংলাদেশের আটটি জেলায় প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের চুক্তি ব্যতীতই ফারাক্কা বাঁধ চালু। পশ্চিম বঙ্গ ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অধিকার দান, অন্য কথায় বাংলাদেশের ভূমির ওপর দিয়ে করিডোর প্রদান এবং

৩। ভারত বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক ভেনচার যথা যৌথ পাট কমিশন, যৌথ শিল্প উদ্যোগ এবং ভারতীয় পন্য ক্রয় নিমিত্ত আটত্রিশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করার পরিকল্পনা প্রণয়ন।'[৫০]

দেশব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) ও তাফসির মাহফিল

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার এক বছরের মধ্যে প্রায় চারশো বছরের ইসলামী ঐতিহ্যবাহী ঢাকা শহরে ১৯৭৩ সালে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে চক বাজারে প্রথম সিরাতুন্নবী কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা সিটির আদি বাসিন্দা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জনাব আলহাজ্জ আবদুল ওহাব উক্ত সিরাত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। মূলত ইসলামপন্থীদের উদ্যোগেই ঢাকাসহ দেশব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

উক্ত কমিটির উদ্যোগে ঢাকার চকবাজারে প্রথম সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ ও প্রধান মেহমান হিসেবে ছিলেন হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

---

৫০. *অলি আহাদ- জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫।*।

www.bjilibrary.com

মাহফিলের শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় দায়িত্বশীলদের ওপরে ছিল।

তৎকালে সারাদেশে ইসলাম বিরোধী উত্তপ্ত পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ সাহসী ভূমিকায় আল্লাহর মেহেরবানিতে আশাতীতভাবে মাহফিল সফল হয়। উক্ত মাহফিল উপলক্ষে বিশিষ্ট সাহিতিক অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুকের সম্পাদনায় প্রকাশিত সিরাত স্মরণিকা সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উক্ত সিরাত সেমিনারের প্রভাব সারাদেশে দ্রুত প্রচার ও প্রসার লাভ করে। অতঃপর আল্লাহ প্রেমিক ও নবীর অনুসারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে ও গোটাদেশে সিরাতুন্নবী ও তাফসিরুল কুরআন এবং ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ওলামায় কেরামের মুখ খোলার আয়োজন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তখনকার দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সিরাতুন্নবী (সা.) সম্মেলনে সুললিত ও তেজোদীপ্ত কণ্ঠের ওয়াজ নসিহত মুসলমানদের তৃষ্ণার্ত মনে আলোড়ন ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। ফলে পূর্নাঙ্গ ইসলামের দাওয়াতী কাজের সীমিত আকারে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঢাকার চকবাজারে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের পরই উল্লেখযোগ্য ৭ দিনব্যাপী চট্টগ্রাম সাতকানিয়া চুনতির আল্লাহওয়ালা হযরত হাফিজ সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল। অতঃপর কক্সবাজার কুতুবদিয়া দ্বীপে হযরত শাহ আবদুল মালেকের ব্যবস্থাপনায় তিন দিনব্যাপী এক আজিমুশ্বান সিরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার টেকনাফ রঙ্গীখালী জঙ্গলী ফকিরের আয়োজনে সিরাত মাহফিল হতে থাকে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত সব আঞ্চলিক সিরাত মাহফিলের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালের ৩, ৪ ও ৫ মার্চ তিনদিনব্যাপী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত তখনকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক এক সিরাতুন্নবী (সা.) মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাসুম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সর্বস্তরের ৬৪ জন দেশ বরেণ্য ওলামা-মাশায়খ বক্তব্য রাখেন। প্রায় ১০ লাখ আশেকে রাসূলের (সা.) সমাবেশে তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াব অংশগ্রহণ করেন এবং এত বড় মাহফিলে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা দেখে খুশি হন।

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা উত্তর কালে ইসলামী রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে তৎকালীন সরকারের নির্দেশে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ ইত্যাদি ইসলাম ও মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাধীনতা বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করে বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯৭২ সালে গণপরিষদের মাধ্যমে প্রণীত সংবিধানে আধিপত্যবাদী ভারত ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূলনীতি ও আদর্শ বানানো হয়। ইসলামের নামে দল কিংবা সংগঠন করাই শুধু নিষিদ্ধ হয়নি, যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলিম নাম অংকীত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামকে মুছে ফেলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজধানী ঢাকার মাত্র কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাজি খালাক' উঠিয়ে দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া হয়। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি হিসাবে পরিচিত নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির উপর চাপিয়ে দেবার বন্দোবস্তও পাকাপোক্ত হয়।

www.bjilibrary.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৭৩ সনের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গঠিত "অল পার্টিজ এ্যাকশন কমিটি" ২০১ জন প্রার্থী দাঁড় করায়। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ২২৫ আসনে এবং মেজর (অব.) এম.এ. জলিল এবং আ.স.ম. আবদুর রব গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২৩৭ আসনে প্রার্থী দেয়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসনে, জাসদ ১টি আসনে, জাতীয় লীগ ১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫টি আসনে বিজয়ী হন।

ঐ সময় মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামী সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ ছিলো। তাছাড়া এইসব দলের নেতা ও কর্মীদের অনেকেই ছিলেন বন্দি। ফলে এই নির্বাচনে ইসলামী শক্তি কোন ভূমিকা পালন করার সুযোগ পায়নি।

নির্বাচনে সরকার পুলিশবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে বিরোধী দলের নমিনিদের পরাজয় নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ভোট গণনাকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান মেজর (অব.) এম.এ. জলিল সরকারি দলের প্রার্থীর চেয়ে অনেক ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও টেলিভিশনে হঠাৎ ফল প্রচার বন্ধ করে, পরে তাঁকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়।[৫১]

---

[৫১]. *এ কে এম নাজির আহমদ : রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী।*

www.bjilibrary.com

যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ক্ষমা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এবং পাকিস্তানের ৯৫ হাজার সেনা সদস্য সেদিন আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা করে। সে তদন্তের আওতায় ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহায়ক বাহিনীগুলো। তদন্তের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হওয়া এবং তাদের বিচারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। প্রেস রিলিজটি নিম্নরূপ :

Press release of the Government of Bangladesh on war crimes trial (17 April 1973)

'Investigations into the crimes committed by the Pakistani occupation forces and their auxiliaries are almost complete. Upon the evidence, it has been decided to try 195 persons of serious crimes, which include genocide, war crimes, crimes against humanity, and breaches of article 3 of the Geneva conventions, murder, rape and arson.

Trials shall be held in Dacca before a special tribunal, consisting of judges having status of judges of the Supreme Court.

The trials will be held in accordance with universally recognized judicial norms, eminent international jurists will be invited to observe the trials. The accused will be afforded facilities to arrange for their defence and to engage counsel of their choice including foreign counsel.

A comprehensive law providing for the constitution of the tribunal, the procedure to be adopted and other necessary materials is expected to be passed this month. The accused are expected to be produced before the tribunal by the end of May 1973.'

www.bjilibrary.com

[অর্থাৎ ঃ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (১৭ এপ্রিল ১৯৭৩) :

পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী বাহিনীসমূহের অপরাধের তদন্ত প্রায় শেষ। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মারাত্মক অপরাধের দায়ে ১৯৫ জনের বিচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তারা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ জেনেভা কনভেনশন এর আর্টিকেল ৩ লঙ্ঘনজনিত হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ এর মতো গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত।

সুপ্রীমকোর্টের বিচারকদের মর্যাদাসম্পন্ন বিচারকদের নিয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ঢাকায় এই বিচার কার্য সম্পন্ন হবে।

সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত পন্থায় এই বিচারকার্য সম্পন্ন হবে যেখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞদেরকে বিচারকার্য পর্যবেক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হবে। আসামীগণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে এবং তাদের পছন্দমত দেশী-বিদেশী আইনজীবীদের সাথে তারা পরামর্শ করতে পারবেন।

এই ট্রাইবুনাল গঠন সংক্রান্ত বিস্তারিত আইন ও পদ্ধতি তৈরি এবং অন্যান্য বিষয়াদির অনুমোদন এ মাসেই হবে। মে ১৯৭৩ এর শেষের দিকে আসামীগণকে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির করা হবে।]

বাংলাদেশ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা তৈরি হয় তারা সকলেই ছিল পাকিস্তানের উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা। এই তালিকায় কোন বেসামরিক ব্যক্তি বা বাংলাদেশির নাম ছিল না। এদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ১৯শে জুলাই ১৯৭৩ একটি আইন পাশ করা হয়। এই আইনটির নাম হচ্ছে International Crimes (tribunal) Act 1973. এই আইন পাস করার আগে ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে সংবিধান সংশোধন করা হয়। কারণ এই আইনের অনেক বিধান সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। পরবর্তী এক বছরের বিভিন্ন সময় পাকিস্তান ও ভারত, বাংলাদেশ ও ভারত এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার ফল হিসাবে উপমহাদেশের শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে এবং পাকিস্তান সরকারের ভুল স্বীকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে forgive and forget-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল

www.bjilibrary.com

হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরন সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ। এই চুক্তির ১৩, ১৪, ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্তানুযায়ী যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তালিকাভুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিষয়টি মীমাংসা করা হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উদ্ভূত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুর ইতি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়নি কিংবা রাজনৈতিক বিরোধিতা করেছে কিংবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছে কিংবা কোন অপরাধ করেছে তাদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলাবরেটর্স এ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের আওতায় লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্য থেকে অভিযোগ আনা হয় ৩৭ হাজার ৪ শত ৭১ জনের বিরুদ্ধে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬ শত ২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়নি। ২ হাজার ৮ শত ৪৮ জনকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭ শত ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিরোধ বিতর্ক, বিভেদ মুছে ফেলার জন্যই বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ক্ষমা ঘোষণার ফলে কলাবরেটর্স এ্যাক্টের অধীনে ছোটখাট অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত বা অভিযুক্তরা সকলেই জেল থেকে মুক্তি পায়। সাধারণ ক্ষমায় কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধকে ক্ষমা করা হয়নি। অর্থাৎ যারা এসব অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তাদের অভিযুক্ত ও শাস্তি দেয়ার দরজা খোলা রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশে কলাবরেটর্স আইনটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর আরো ২ বছর এক মাস সময় অতিবাহিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে ঐ চার অপরাধের জন্য উক্ত আইনের অধীনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়নি। সম্ভবত এই কারণেই জিয়াউর রহমান আইনটি বাতিল করেন।

www.bjilibrary.com

সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

১৯৭২ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করেন। সে অনুযায়ী অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদি মন্ত্রিসভার সাবেক সদস্য শায়খ আহমদ সালাহ জামজুমের সাথে সাক্ষাৎ করে বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহের কথা জানালেন। শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে সৌদি বাদশাহর কাছে নিয়ে গেলেন। বাদশাহর কাছে পৌঁছার পর জামজুম সাহেব অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাদশাহর সাথে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, তিনি পাকিস্তানের উস্তায আবুল আ'লা মওদূদীর নায়েব হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আপনাকে সেখানকার হাল অবস্থা জানাতে চান। এরপরের ঘটনা অধ্যাপক গোলাম আযম এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"বাদশাহ আমার সাথে হাত মিলিয়ে হাত ধরে রেখেই তার পাশে নিয়ে বসালেন। আমি অনুভব করলাম যে, মাওলানা মওদূদীর প্রতিনিধি হিসাবেই এ মর্যাদা পেলাম। জামজুম সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে সোফায় বসলেন। হলের দেয়াল ঘেঁষে চারদিকেই সোফা পাতা আছে। হলের মাঝখানে মেঝেতে কার্পেট ছাড়া আর কিছুই নেই। সবটুকু হলই খালি। একসাথে অনেক লোক সমবেত হলে হয়তো তাদের চলাচলের জন্য মাঝখানটা খালি রাখা হয়েছে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমি কিছু বলার আগেই বললেন, "আমি নিয়মিত বিবিসি'র খবর শুনি। বিশেষ মনোযোগ সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবরগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি। আপনি যা বলতে চান বলুন।"

বাদশাহ ফায়সাল বহু বছর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজি বলার যোগ্যতা অবশ্যই রাখেন। তবু তিনি আরবিতেই বললেন। রয়াল চিফ প্রটোকল আবদুল ওহাব চমৎকার ইংরেজিতে তা অনুবাদ করে শুনালেন।

আমি আরবিতে বলতে অক্ষম বলে ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হলাম। আমি ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করলাম না। আমার আসল বক্তব্য ছিলো ভারত সম্পর্কে। আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য আন্তরিক গভীর শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সাথে দুশমনি করে এসেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। এর আসল উদ্দেশ্য ঐ দুশমনি। পূর্ব-পাকিস্তানের চারদিকে ভারতের সাতটি প্রদেশ রয়েছে। ঐসব প্রদেশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনও রয়েছে। ঐ

www.bjilibrary.com

প্রদেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে পূর্ব-পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বিরাট বাধা। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করার বাহানায় ভারত অতি উৎসাহের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদিক দিয়ে সংগঠিত করেছে এবং ত্বরান্বিত করেছে। আমরা আশংকা করি যে, ভারত বাংলাদেশের উপর যে চরম আধিপত্য বিস্তার করেছে তাতে বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা। বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। আপনি হারামাইন শরীফাইনের মহান খাদিম। আপনার উপর বিশ্বের সকল মুসলমানেরই হক আছে। আমি কোটি কোটি বাংলাদেশি মুসলমানের পক্ষ থেকে এ আবেদন জানাতে এসেছি যে, "ভারত কাশ্মীরের মতো বাংলাদেশকে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সেদিকে আপনি বিশেষ লক্ষ্য লাখবেন। সে দেশের মুসলমানরা ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশটি তিন দিক দিয়ে ভারত দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আছে। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, কিন্তু সে সমুদ্রও ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারতের মুসলমানদের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ কেমন তা আপনার অজানা নয়। বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারতের আধিপত্যের পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কিত।

এ কথাগুলো আমি একটানা বলিনি। একটি বাক্য বলার পরই চিফ প্রটোকল আরবিতে অনুবাদ করে বাদশাহকে শুনান। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে অনুবাদ করছিলেন। আমার কথার ফাঁকে তিনি হাতে ইশারা করে আমাকে থামিয়ে অনুবাদ করতে থাকেন। আমার কথা বলার সময় বাদশাহ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য যে তিনি বুঝতে পারছেন তা স্পষ্টই টের পেয়েছি। কিন্তু তাদের নিয়ম পালনের জন্য আমার সব কথারই আরবিতে অনুবাদ করে শুনালেন।

আমার কথাগুলো শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, "পশ্চিম-পাকিস্তানের সাথে আপনারা যে রাজনৈতিক ঝগড়া করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। একত্র থাকতে পারলেন না বলে আলাদা হয়ে গেলেন, এতেও আমার আপত্তি করার অধিকার নেই। এটা আপনাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যদি আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবেই ঘোষণা করতেন তাহলে আমরা দুঃখবোধ করতাম না। আমি বিবিসি'র মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের যে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে তাতে সেকুল্যারিজম ও সোস্যালিজমকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত মানসিক যাতনাবোধ করছি। যে রাষ্ট্রটি পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ ছিলো তা এভাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার ঘটনাটি অত্যন্ত বড় দুর্ঘটনা।

তাঁর এ কথাগুলো একটানা বলেননি। একটু বলে তিনি থামলে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এভাবে তার বক্তব্য শেষ হলে আমি আবার বললাম,

www.bjilibrary.com

"পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি। সেক্যুলারিজম ভারতীয় আদর্শ। ভারতের আধিপত্যের কারণেই ঐ আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই ভারত ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি বললেন, "আপনি বলছেন যে, সে দেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলিম। আপনারা যদি নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ত্যাগ না করেন তাহলে ভারত শক্তি প্রয়োগ করে কিছুই করতে পারবে না। মুসলিম নেতারাই যদি ভারতীয় আদর্শ মেনে নেয় তাহলে বাইরে থেকে আমরা কী করতে পারি ? তবে ভারত যদি কাশ্মীরের মতো দখল করতে চায় তাহলে মুসলিশ বিশ্ব চুপ করে থাকবে না। আমি ভারতকে এতো বোকা মনে করি না। ভারত সরাসরি এমন কিছু করবে না। ভারত এটাই চাইবে যে, বাংলাদেশে তাদের তল্পীবাহক সরকার কায়েম থাকুক।"

তাঁর এ যুক্তিপূর্ণ কথার পর আমার বলার আর কিছুই থাকলো না। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

এ সাক্ষাতে ২৫ মিনিট সময় লেগেছে।

প্রটোকল অফিসার বাদশাহর দৃষ্টি গোচর হওয়ার মতো করে কয়েকবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেও বাদশাহ আমার কথা শুনতে থাকলেন এবং তিনিও বলতে থাকলেন।"[৫২]

১৯৭৪ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর আরেকটি দল সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম এর আগে ১৯৭২ সালে জেদ্দায় রাজপ্রাসাদে সর্বপ্রথম সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সময় সাবেক মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে নিয়ে সরাসরি বাদশাহর নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি নিজে না গেলেও চিফ প্রটোকল অফিসার জনাব আবদুল ওহ্যাবের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবদুল জাব্বার ও ছাত্রনেতা আবু নাসের একসাথে বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বাদশাহ দু'বছর আগে সাক্ষাতকারের ঘটনার কথা মনে আছে বলে জানান।

অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদি বাদশাহর কাছে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষাবস্থার করুণ অবস্থা তুলে ধরে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের

---

৫২. *জীবনে যা দেখলাম, চতুর্থ খণ্ড, - অধ্যাপক গোলাম আযম।*

www.bjilibrary.com

কোটি কোটি মুসলিমকে এ কঠিন সময়ে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য আবেদন জানান। এছাড়া বর্তমান অসহায় অবস্থার সুযোগে ভারত ঐ দেশটিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে বলে তিনি তাঁর আশংকার কথা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে জনাব শামসুর রহমান এবং আবু নাসের সাহেবও কিছু কথা বললেন। বাদশাহ জওয়াবে "হাযা ওয়াজিবী" (এটা আমার কর্তব্য) বলে জানান।

সে সাক্ষাৎকারে আবু নাসের অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে সৌদি বাদশাহকে জানান, "বাংলাদেশ সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে। অথচ আমরা তাঁকে দেশে পেতে চাই।" বাদশাহ ফয়সাল শুধু বলেছিলেন, "হুয়া আখী" (তিনি আমার ভাই)।

মাওলানা আবদুর রহীম জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন

১৯৭১ এর নভেম্বরের শেষ দিকে মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে যোগদানের জন্য একসাথেই লাহোর গিয়ে আটকা পড়েন । ১৬ ডিসেম্বরের পর মাওলানা আবদুর রহীম অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আবদুস সুবহান হজে চলে যান। মাওলানা আবদুর রহীম করাচি রয়ে গেলেন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি নেপাল থেকে লেখা মাওলানা আবদুর রহীমের চিঠি পেয়ে লন্ডনে অবস্থানরত অধ্যাপক গোলাম আযম বুঝতে পারলেন যে, তিনি পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে নেপাল পৌঁছেছেন এবং গোপন পথেই দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম অনুভব করলেন যে, দেশে যাবার আগে তাঁর সাথে মাওলানা আবদুর রহীমের সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের গোপনে চোরাপথে নেপাল থেকে ভারতের সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে বে-আইনিভাবে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে বিরাট কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারে। তাই অধ্যাপক গোলাম আযম মাওলানা আবদুর রহীমকে হজে আসার ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁর জন্য বিমানের টিকেট পাঠালেন।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক গোলাম আযমসহ পাঁচজন দায়িত্বশীল একসাথে হজ করলেন। হজের আগে ও পরে দীর্ঘ বৈঠক করে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দ্বিতীয় নির্বাচিত আমীর মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ ঢাকা এলেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা আবদুর রহীম এবং মাওলানা আব্দুস সুবহান পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। মক্কা শরীফে মাওলানা আবদুর রহীম একান্ত সাক্ষাতে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে বলেছিলেন, "তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করাই আমার এখন প্রধান ধান্দা। তাই নেপালে প্রবাসকালেও আমি এ কাজ করেছি। আমি দেশে গিয়ে এ কাজটি সমাধা না করে আর কোন দিকে মনোযোগ দেবো না।" অধ্যাপক গোলাম আযম এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দেন ও তাঁর এ সিদ্ধান্তের জন্য মুবারকবাদ জানান।

মাওলানা আবদুর রহীম আরও জানান, তিনি রুকনিয়াতের দায়িত্ব আর নিতে চান না। লেখার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের খিদমতেই বাকি জীবন নিয়োজিত করতে চান। ১৯৭২ সালের জুন মাসে মাওলানা জামায়াতের রুকনিয়াত থেকে ইস্তফা দেন। এরপর অধ্যাপক গোলাম আযম কয়েকবার করাচিতে মাওলানা আবদুর রহীমের সাথে দেখা করে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৭৪ সালের মে মাসে করাচি থেকে ছদ্মনামে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশের অধিবাসী যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন তারা অনেকেই ঐ সময় দেশে ফিরে আসার সুযোগ পান। ১৯৭৫-এর মে মাসে তিনি রুকন হন এবং উপনির্বাচনে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে প্রথম ও ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় আইডিএল নামেই নির্বাচন করে জামায়াত। মুসলিম লীগের সাথে আইডিএল-এর সমঝোতার ভিত্তিতে আইডিএল ৭২টি আসনে এবং অবশিষ্ট ২২৮ আসনে মুসলিম লীগ নমিনেশন দেয়। উক্ত নির্বাচনে

www.bjilibrary.com

মুসলিম লীগ ১৪টি ও আইডিএল ৬টি আসনে বিজয়ী হয়। আইডিএল নিজস্ব কোন প্রতীক দাবি না করে মুসলিম লীগের হারিকেন প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে আইডিএল-এর নিম্নলিখিত ৬ জন নির্বাচিত হন :

১। পিরোজপুর জেলা থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।
২। লক্ষীপুর থেকে মাস্টার মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ।
৩। ঝিনেদাহ থেকে মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী।
৪। ঝিনেদাহ থেকে এ এস এম মোজাম্মেল হক।
৫। গাইবান্ধা থেকে অধ্যাপক রেজাউল করীম।
৬। কুড়িগ্রাম থেকে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

মুসলিম লীগের সাথে এক প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিলেও সংসদে এ ছয়জন পৃথক পার্লামেন্টারি গ্রুপ হিসাবেই আসন গ্রহণ করেন। মাওলানা আবদুর রহীম গ্রুপ লিডারের দায়িত্ব পালন করেন ।

উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাত্র ৩৯টি আসন লাভ করে। ময়মনসিংহের জনাব আসাদুযযামান খান পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার নির্বাচিত হন। সংসদে আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসাবে তিনিই 'লিডার অব দ্য অপজিশন' হন। মুসলিম লীগ সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বিরোধী দল, যার পার্লামেন্টারি লিডার হন খান আবদুস সবুর খান। আইডিএল তৃতীয় বিরোধী দল হিসেবে গণ্য হয়। জিয়াউর রহমানের বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন দখল করতে সক্ষম হয়। লিডার অব দ্য হাউস হন শাহ আজিজুর রহমান এবং স্পিকার হন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফীজ ।

একদলীয় শাসন প্রবর্তন

স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার দেশে সুশাসন কায়েম করতে পারেনি। গণমানুষের সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা ছিলো বিশাল। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। মানুষের মাঝে অস্বস্তি, অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

এই সময় আওয়ামী লীগ ও পুঁজিবাদবিরোধী বামদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি "স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশ ভারতের পদানত" বলে প্রচারণা চালাতে থাকে।

www.bjilibrary.com

১৯৭৩ সনে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে থাকে। গুপ্ত হত্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সনে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন থানার ওপর সশস্ত্র হামলা বৃদ্ধি পায়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান এক অদ্ভূত সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গোটা দেশ কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বহু দলীয় ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এক দলীয় শাসন কায়েমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এ লক্ষ্যেই ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপিত ও গৃহীত হয় এবং ঐদিনই শেখ মুজিবুর রহমান নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারি তিনি ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তবে তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২৪শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) একীভূত হয়ে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ" (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে।

এই দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন-

১. শেখ মুজিবুর রহমান (চেয়ারম্যান)
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৩. ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী (সেক্রেটারি জেনারেল)
৪. খন্দকার মুশতাক আহমদ
৫. এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
৬. আবদুল মালেক উকিল
৭. শ্রী মনোরঞ্জন ধর
৯. ড. মুজাফফর আহমদ
১০. শেখ আবদুল আযিয
১১. মহিউদ্দিন আহমদ ১২. গাজি গোলাম মুস্তফা।

মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামী পূর্ব থেকেই বেআইনি ছিলো। এবার বেআইনি দলের তালিকায় যুক্ত হলো : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, জাতীয় গণতন্ত্রী দল, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি।

www.bjilibrary.com

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ সরকার মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের দরুন এই দলগুলোর হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে জেলে পুরে জাতীয় বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে।

প্রশাসনের দলীয়করণ অন্যান্য দলের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব সৃষ্টি করে। দলীয় বিবেচনায় প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। রক্ষীবাহিনীর দাপটে মানুষ ছিলো শংকিত। সারাদেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জবর দখল ও হত্যাকাণ্ড বাড়তে থাকে। দ্রব্যমূল্য ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

"দশ আনা-বারো আনা সেরের চাউল দশ টাকা, আট আনা সেরের আটা ছয়-সাত টাকা, দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, আট আনা সেরের লবন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তেল ত্রিশ-চল্লিশ টাকা, এক টাকা সেরের মসূর ডাল আট-নয় টাকা, পাঁচ টাকার শাড়ি পঁয়ত্রিশ টাকা, তিন টাকার লুঙ্গি পনের-বিশ টাকা এবং একশত চল্লিশ-দেড়শত টাকার এক ভরি স্বর্ণ নয়শত-এক হাজার টাকায় এসে দাঁড়ায়।[৫৩]

কল-কারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব দেখা দেয়। অর্ধাহারে থাকতে হয় অগণিত মানুষকে। পথে পথে কংকালসার মানুষ দৃষ্ট হয়।

১৯৭৪ এর শেষভাগে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে বহুসংখ্যক মানুষ। এমতাবস্থায় সমালোচনার মুখ বন্ধ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সনের ১৬ই জুন The Newspaper (Annulment of Declaration) Act 1975 জারি করেন। সরকার বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক অধিগ্রহণ করে। বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সনের ২৩শে জুন সারাদেশকে একষট্টি জেলায় বিভক্ত করে একষট্টি জন গভর্নর নিযুক্ত করে শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসনের ভিত মজবুত করার চেষ্টা করেন। গোটা দেশে একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

ঠিক এমনি এক সময়ে ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্ট মর্মান্তিকভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। বহু আপনজনসহ নিহত হন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

---

৫৩ *অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫।*

www.bjilibrary.com

১৯৭৫ সনের নভেম্বর বিপ্লব

১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্ট ঘটনার পর নেতৃবৃন্দের অনুরোধে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি মুশতাক আহমদ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মোহাম্মদউল্লাহকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেন এবং দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন –
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রফেসর ইউসুফ আলী, বাবু ফনীভূষণ মজুমদার, জনাব সোহরাব হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, বাবু মনোরঞ্জন ধর, জনাব আবদুল মমিন এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান। এঁরা সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতা। অবশিষ্ট দুইজন ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক এবং ড. মোজাফফর আহমদ।

তাছাড়া রাষ্ট্রপতি ১১ জনকে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন–
জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, জনাব মোমেনউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জনাব মোসলেম উদ্দিন খান, জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান, ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল, জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন। এঁরাও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা।
২৪শে অগাস্ট তিনি চীফ অব স্টাফ পদ থেকে মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সরিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উক্ত পদে নিয়োগ দেন।
২৮শে অগাস্ট তিনি একষট্টি জেলায় একষট্টিজন গভর্নর নিয়োগের আদেশ বাতিল করেন।
১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করেন।
২৬শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি একটি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্টের ঘটনার সাথে জড়িত কারো বিরুদ্ধে দেশের কোন আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৬ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে খন্দকারকে বিমানবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে এম.এ.জি.তাওয়াবকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

৩রা নভেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী। ঐ দিনই ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে ঢাকাস্থ পদাতিক ডিভিশন এবং বিমানবাহিনীর একটি অংশের সাহায্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান।

অভ্যুত্থানকারীরা চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্টে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারা বংগভবনে অবরদ্ধ করতে সক্ষম হয় রাষ্টপতি খন্দকার মুশতাক আহমদকে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান এবং তাঁর সাথীদেরকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। কর্নেল ফারুক রহমান এবং তাঁর সংগীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। বঙ্গভবনে একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সময় জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী একটি জীপে সাদা পতাকা উড়িয়ে বঙ্গভবনে উপস্থিত হন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর একটি সমঝোতা হয়। লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর আযিয পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর শাহরিয়ার, মেজর বজলুল হুদা, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর নূর, মেজর শরফুল হোসেন, লে. কিসমত হোসেন, লে. খায়রুজ্জামান, লে. আবদুল মাজেদ, হাবিলদার মুসলেহউদ্দিন, নায়েক মারফত আলী এবং নায়েক মুহাম্মাদ হাশেমকে একটি বিমানে করে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

৪ঠা নভেম্বর রেডিওতে ঘোষণা হয় যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর নতুন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন। ৫ই নভেম্বর রেডিওতে ঘোষণা হয় যে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ

www.bjilibrary.com

সামরিক বিধি সংশোধন করে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিধান সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
৬ই নভেম্বর নতুন রাষ্ট্রপ্রতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম।

এই দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সংঘটিত অভ্যুত্থান একটি প্রো-ইন্ডিয়া অভ্যুত্থান। সারা দেশের ক্যান্টনমেন্টগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর আসতে থাকে যে যশোর, রংপুর, বগুড়া এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরা খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। ৬ই নভেম্বর মধ্যরাতের পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরাও অফিসারদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পড়ে।

অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ও কর্ণেল হায়দার বংগভবন থেকে বেরিয়ে শেরেবাংলা নগরে উপস্থিত হন রংপুর থেকে আগত সেনাদের সাথে কথা বলার জন্য। কিছুক্ষণ পরই মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ও কর্ণেল হায়দার সিপাহীদের গুলিতে নিহত হন।

প্রায় একই সময় বংগভবনে গুলিবিদ্ধ হয়ে গ্রেফতার হন কর্নেল শাফায়াত জামিল। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ত্বরিৎ ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ৭ই নভেম্বর ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় বীর বিপ্লবী সিপাহীরা ক্ষমতা দখল করেছে এবং অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছে।
রাতে ঘোষণা করা হয় যে রাষ্ট্রপতি এ.এস.এম সায়েমের নিকট প্রধান সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন।
সেইদিন অস্ত্র হাতে সিপাহীরা দলে দলে রাজপথে নেমে আসে। ট্রাকে ট্রাকে সিপাহীরা রাজপথে টহল দিতে থাকে। তাদের সাথে মিলিত হয় হাজার হাজার মানুষ। মিছিলে মিছিলে ভরে যায় ঢাকা শহর। নানা রকমের শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বাতাস। মহা উল্লাসে গলা ফাটিয়ে লোকেরা শ্লোগান দিতে থাকে : "আল্লাহু আকবার", "সিপাহী জনতা ভাই ভাই", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।" সেই দিনের গগণবিদারী "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি সত্যিই এক অবিস্মরণীয় আবহ সৃষ্টি করেছিলো।

www.bjilibrary.com

ষোড়শ অধ্যায়

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিরাতুন্নবী সম্মেলন

৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের ফলে দেশ জুড়ে বয়ে যায় স্বস্তির পরশ। নিরাপত্তাহীন অবরুদ্ধ জীবনের অবসান ঘটায় তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে। রক্ষী বাহিনী বহু মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বহু আলেম ওলামা, মাদরাসার হুজুর, মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিনকে হত্যা করেছিল। যারা বেঁচে যায় তাদের ঠিকানা হয় জেলখানা। এ দেশের ইসলামপ্রিয় ঈমানদার মুসলমানরা মুক্ত পরিবেশে শ্বাস নিতে পেরে হাফ ছেড়ে বাঁচে। সারাদেশে ইসলামী জলসা ও সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের ধুম পড়ে যায়। ৭ নভেম্বরের ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক সিরাতুন্নবী সম্মেলন।

এই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মাসুম এবং সেক্রেটারি ছিলেন পুরাতন ঢাকার কৃতি সন্তান জনাব আবদুল ওয়াহিদ। সম্মেলনে আগত লক্ষ জনতার উদ্দেশে আবেগময় বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম.এ.জি তাওয়াব।

১৯৭৬ সালের ৩, ৪ ও ৫ মার্চ তিন দিনব্যাপী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, তখনকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে এ ঐতিহাসিক সীরাতুন্নবী (সা.) মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাসুম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে হযরত মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মদ, হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান, মাওলানা আবদুল কাদের, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ পর্যায়ক্রমে সর্বস্তরের ৬৪ জন দেশবরেণ্য ওলামা-মাশায়েখ বক্তব্য রাখেন। প্রায় ১০ লাখ আশেকে রাসূলের (সা.) এ মাহফিলের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা মানুষকে চমৎকৃত ও আশাবাদী করে তোলে। আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ক্ষিপ্ত জনগণের বাঁধভাঙ্গা আবেগের প্রকাশ ছিল এ সম্মেলন।

এটি ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশ। সারা দেশ থেকে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ছুটে এসেছিল মানুষ। এই সম্মেলন শাসকদেরকে একটি বার্তাই দিয়েছিল, ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীসহ বাংলাদেশের মানুষ

www.bjilibrary.com

ইসলামী চেতনার সাথেই তাদের জীবন মরণ সঁপে দিয়েছে। শত বাঁধা ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এদেশের মানুষ ঈমানের ওপর, ইসলামের ওপরই টিকে থাকতে চায়। ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা তারা মানবে না। এ সম্মেলনে ইসলামী চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা ছিলো সত্যিই অতুলনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি সরকারের মনোভাব

স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পর ১৯৭৫ সালে সৌদী আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্রদূত এদেশে পাঠায়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে সৌদী আরব সফরে যেয়ে বাদশাহ খালেদকে বাংলাদেশে সৌদী রাষ্ট্রদূত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। বাদশাহ বলেছিলেন- শাসনতন্ত্র থেকে ইসলাম বিরোধী আদর্শ খারিজ করলেই আমরা রাষ্ট্রদূত পাঠাব। জিয়াউর রহমান শাসনতন্ত্র সংশোধন করার পর ঐ বছরই শেষের দিকে সৌদী আরব বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত পাঠায়।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার

১৯৭৬ সনের ৩ মে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদটি বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়।

বাংলাদেশে জামায়াতের তৎপরতা

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক দল নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়।

ইকামাতের দ্বীনের কাজ করা ফরয বিধায় কোন অবস্থায়ই জামায়াতে ইসলামীর কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। যাদের এ বুঝ রয়েছে তারা সর্বাবস্থায় যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকু কাজ করার জন্য পেরেশান থাকেন।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের জুন মাসে রুকনদের ভোটের মাধ্যমে মাওলানা আবদুল জাব্বার আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের

www.bjilibrary.com

এপ্রিল মাসে মাস্টার শফীকুল্লাহ আমীর নির্বাচিত হন এবং এ বছর তিনি জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জে গমন করেন।

১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে হজ্জ থেকে দেশে ফিরে মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেব জানতে পারলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেই জনাব আবদুল খালেক আমীর নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি পদত্যাগ করলে মসলিসে শূরা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীকে অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নির্বাচিত করে।

১৯৭৫ সালের মে মাসে উপনির্বাচনে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে পুনরায় মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৭৭-১৯৭৯ সেশনের জন্য তিন বছরের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে আসলে উপ-নির্বাচনে তিনি আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে হোটেল ইডেনে রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে জনাব আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করেন। আর নির্বাচিত আমীর হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম আভ্যন্তরীণ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশ রাজনৈতিক দলবিধি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ইসলামী দলসহ পূরনো রাজনৈতিক দলগুলো পুরুজ্জীবনে আর কোন বাঁধা থাকলনা। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলোর নেতারা বিভিন্ন কারাগারে আটক থাকাকালে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন জেল খানা থেকে বের হয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দলগঠন পূর্বক ইসলামী তৎপরতা চালাবেন। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি বাংলাদেশের জনৈক প্রভাবশালী পীর সাহেব ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন বলে তাঁর কারাজীবনের সাথী কতিপয় ওলামা থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ তাদের দলীয় নাম ত্যাগ না করায় ঐ ওয়াদা

www.bjilibrary.com

পুরোপুরি পূরণ হতে পারেনি। মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ একজোট হয়ে জনাব আবদুস সবুর খানকে সভাপতি ও শাহ আজিজুর রহমানকে সেক্রেটারি জেনারেল বানিয়ে তাদের দলকে পুনর্গঠন করে।

এদেশের দুর্ভাগ্য মুষ্টিমেয় কতিপয় পীর সাহেব ব্যতীত বড় বড় খানকার গদ্দিনশীন পীর-মাশায়েখদেরকে ঐক্যের নেতৃত্ব দেয়াতো দূরের কথা, কেউ তাদের সসম্মানে ও সবিনয়ে আহবান জানালেও তাঁরা সাড়া দিতে রীতিমতো দ্বিধাবোধ এমনকি আপত্তি করে থাকেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পি,ডি,পি, ইসলামিক পার্টি, ইমারত পার্টি ও বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি এই সাত দলের নেতৃবর্গ এক ঐক্যের সনদে স্বাক্ষর করেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ঐক্যসনদে স্বাক্ষর দেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে নতুন দলের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ সংক্ষেপে আই, ডি, এল। ১৯৭৬ সালের ২৪শে আগস্ট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর কনভেনশনে আই,ডি,এল বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। উল্লিখিত সাতটি দলের মধ্যে সাংগঠনিক ও জনশক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান এক নম্বরে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নেজামে ইসলামী পার্টির (১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অঙ্গদল হিসেবে পূরনো পরিচিতি থাকলেও) চেয়ে জামায়াত তিনগুন বেশি ভোট পায়। নতুন দলটি গঠন করার সময়ই পদ বন্টনের ব্যাপারে ছোট দলগুলোর নেতারা এক জোট হয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার কারণে জামায়াতের সবাই স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মিত হয়। আই, ডি,এল এর চেয়ারম্যান করা হয় নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা মাওলানা সিদ্দিক আহম্মদকে। বর্ষিয়ান নেতা হিসেবে এতে জামায়াতের কোন আপত্তি ছিল না। সেক্রেটারি জেনারেলের পদও জামায়াতের কোন নেতাকে না দিয়ে পি,ডিপি এর এডভোকেট শফিকুর রহমানকে দেয়া হয়। দলকে কর্মতৎপর করার প্রধান দায়িত্ব এ পদাধিকারী ব্যক্তির উপরেই ন্যস্ত থাকে। জামায়াতকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাওলানা আবদুর রহীমকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং মাওলানা আবদুস সুবহান ও এডভোকেট সা'দ

www.bjilibrary.com

আহম্মদকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। এভাবে দলগঠনের শুরুতেই ঐক্যের বদলে বিভেদ জিইয়ে রাখার অবকাশ থাকলো। সবাই যদি আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতেন, তাহলে প্রধান দু'টো পদের একটি সবচেয়ে বড় দলের নেতাদের মধ্যে কারো উপর অর্পিত হতো। সংগঠন গড়ে তোলা কর্মীদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দেয়া সর্বত্র দলের শাখা কায়েম করার জন্য যে ধরনের তৎপরতা প্রয়োজন, তার অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশে জামায়াতের সক্রিয় জনশক্তি উদ্বেগ ও অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো।

দলের সাংগঠনিক সম্প্রসারণের বদলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, কুৎসা রটনা ও দোষারোপ চলতে লাগলো। এর ফলে দলটি ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হতে লাগলো। এ পরিস্থিতিতে আই,ডি,এল গঠনের একবছর পরেই ১৯৭৭ সালের ২৩ আগস্ট জামায়াত নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে দলের কাউন্সীল বৈঠক আহবান করার রিক্যুইজিশন দেয়া হলো। কাউন্সিলের ঐ সভায় মাওলানা আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান ও মাওলান আবদুস সুবহানকে সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। এভাবে ৭ দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় এবং আই, ডি, এল জামায়াতের একক দখলে চলে আসে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ

১৯৭৭ সনের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

১৯৭৭ সনের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সনের সংবিধানের শিরোনামে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সংযোজন এবং চার মূলনীতি 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাগুলোর পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' কথাগুলো প্রতিস্থাপন করেন।

www.bjilibrary.com

১৯৭৭ সালের গণভোট

১৯৭৭ সনের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি গণভোটের আয়োজন করেন। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রতি জনগণের সমর্থন আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ছিলো এই গণভোট। ভোটারগণ বিপুলভাবে তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই গণভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭২ সনের ২২ এপ্রিল সংবিধানের শিরোনামে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সংযোজন এবং রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' কথাগুলোর প্রতি জনগণ সর্বাত্মক সমর্থন ও আস্থা ব্যক্ত করে। এর মাধ্যমে জনগণ বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাম্যের প্রতিই যে তাদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে তা পুনর্ব্যক্ত হয়।

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ সনের ৩ জুন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই তিনি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছেন। জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক গোলাম আযমের স্বদেশ প্রত্যার্বতন

১৯৭১-'৭৮ প্রায় ৭ বছর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবাসে কাটিয়ে ১৯৭৮ সালের ১০ জুলাই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব তাঁর বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ আম্মাকে দেখার জন্য স্বদেশে আসার অনুমতি পান। ১৯৭৬-'৭৭ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ও স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর একাধিকবার নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া ও জন্মভূমিতে ফিরে আসার আবেদন করে তিনি ব্যর্থ হন। অতঃপর ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে তাঁর আম্মার আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালের ১১ মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেশে আসার অনুমতি

www.bjilibrary.com

দেয়। ঐ সময়ে সপরিবারে কূয়েত প্রবাসী অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭৮ সালের জুন মাসে লন্ডন হয়ে সেখান থেকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে ঢাকা আসেন। তাঁর অমর স্মৃতি কথা 'জীবনে যা দেখলাম' -৫ম খণ্ডে তাঁর নিজের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"১০ জুলাই (১৯৭৮) রাতে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে বৃটিশ এয়ারওয়েজে আসি। আমার স্ত্রী এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ছেলেসহ ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। একটানা ১৪ ঘন্টা আকাশ পথে সফর শেষে জন্মভূমিতে ফিরে আসার উত্তেজনায় ঘুমাতে পারলাম না। ছয় বছর আট মাস পর দেশে যাচ্ছি- দেশে ও বাড়ির কত কথা মনে জাগতে লাগলো। সবচে বেদনাময় অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো আব্বার স্মৃতি। '৭১ সালের নভেম্বরে আব্বাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রেখে এলাম। এবার আর গিয়ে আব্বাকে দেখতে পাবনা-এ চিন্তা নতুন করে মনকে বিষণ্ন করে তুলল। একান্ত প্রিয়ভাই মাওলানা আজহারী দাদা ডেকে আর সম্ভাষণ জানাবেন না।

এর পরেই জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভাবনা জাগলো। তখন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম আমীরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে একাধিকবার চিঠি লিখে আমাকে তাকিদ দিয়েছেন দেশে ফিরে এসে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। আমি দেশে না থাকায় তিনি এ দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রতি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। তাই বুঝতে পারলাম, দেশে ফিরে এলে এ দায়িত্বের বোঝা আমার উপর পড়বে। কিন্তু আমার নাগরিকত্বের সমস্যা নিয়ে কেমন করে এ দায়িত্ব পালন করা যাবে সে কথা ভেবে কোন কূলকিনারা পেলামনা। সারাপথ এসব চিন্তা আমাকে জাগ্রত করে রাখলো।"[৫৪]

জামায়াতে ইসলামীর আমীর পদে উপনির্বাচন

মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৭৭-১৯৭৯ সেশনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি একসাথে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও আই ডি এল-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং আইডিএল-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পৃথক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। মাওলানা আবদুর রহীম

---

[৫৪] *অধ্যাপক গোলাম আযম "জীবনে যা দেখলাম" ৫ম খন্ড।*

www.bjilibrary.com

আইডিএল এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সেপ্টেম্বর '৭৮ থেকে ডিসেম্বর '৭৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য উপনির্বাচনের মাধ্যমে আমীরে জামায়াত নির্বাচন করা হবে।

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের আলোকে উপনির্বাচন হয় এবং ঐ উপনির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীরে জামায়াত নির্বাচন করা হয়। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমীর পরিবর্তন হলে মজলিসে শূরা পুনর্নির্বাচন হতে হবে। তাই অবশিষ্ট সময়ের জন্য মজলিসে শূরারও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে মাওলানা এ কে এম ইউসুফকে নায়েবে আমীর এবং জনাব শামসুর রহমানকে সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ প্রদান করেন। উল্লেখ যে, মাওলানা এ কে এম ইউসুফ ইতিপূর্বে সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী তখনো প্রকাশ্যে কর্মতৎপরতা শুরু করেনি। জামায়াতের স্থায়ী চার দফা কর্মসূচির প্রথম দু'দফা নীরবে পালন করা হচ্ছিল। তৃতীয় দফার কাজ সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে এবং চতুর্থ দফা (রাজনৈতিক) কর্মসূচির কাজ আই ডি এল-এর মাধ্যমে পালন করতে হয়েছিল। পিপিআর-এর অধীনে দরখাস্ত করে জামায়াত তখনো অনুমতি পায়নি। অনুমতি লাভের জন্য জামায়াত দরখাস্ত দিয়েছিল, কিন্তু আরও কিছু তথ্য চেয়ে তা ফেরত পাঠানো হয়। জামায়াত এরপর আর কোন দরখাস্ত দেয়নি।

একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন

১৯৭৮ সনের ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ফরমান জারি করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশের জনগণ অনুভব করেন যে তাদের বুকের ওপর থেকে একটি জগদ্দল পাথর অপসারিত হয়েছে। এই আদেশের ফলে বিলুপ্ত ঘোষিত আওয়ামী লীগ যেমন নতুন করে রাজনীতি করার সুযোগ পায় তেমনি জামায়াতে ইসলামীসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী দলগুলোও নতুন করে রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে। এর ফলে আওয়ামী লীগের হাতে নির্বাসিত 'গণতন্ত্র' আবার পুনর্জীবিত হয়। দেশ থেকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং নতুন করে জনগণের সরকার কায়েম হয়।

www.bjilibrary.com

১৯৭৯ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচন ও আই, ডি, এল

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফলে হঠাৎ করেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে যান। দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, অদম্য সাহস, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও নিষ্ঠাবান সৈনিকসুলভ আচরণ তাঁকে রাজনৈতিক ময়দানে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় করে তুলে।

১৯৭৭ সালের এপ্রিলে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী ঘোষণা পূর্বক এর পক্ষে গণভোটের মাধ্যমে তিনি জনগণের সম্মতি ও আরো অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পরবর্তী বছর ১৯৭৮ সালের জুন মাসে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা সুসংহত করেন। অতঃপর মাত্র আট মাসের মধ্যেই ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৭, আওয়ামী লীগ ৩৯, মুসলিম লীগ ১২ ও আই ডি এল এর ৬ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় আই, ডি, এল নামেই জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম লীগের সাথে আই,ডি,এল এর সমঝোতার ভিত্তিতে আই,ডি,এল ৭২টি আসনে এবং অবশিষ্ট ২২৮ আসনে মুসলিম লীগ নমিনেশন দেয়। আই,ডি,এল নিজস্ব কোন প্রতীক দাবি না করে মুসলিম লীগের হ্যারিকেন মার্কা নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আই,ডি,এল-এর নির্বাচিত ৬ জন এমপি হলেন-

১) মাওলানা আবদুর রহীম- পিরোজপুর, গ্রুপ লীডার
২) মাস্টার মুহাম্মদ সফিকউল্লাহ- লক্ষ্মীপুর, ডেপুটি লীডার
৩) অধ্যাপক রেজাউল করিম- গাইবান্ধা, হুইপ
৪) মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী- ঝিনেদাহ
৫) এ এস এম মোজাম্মেল হক- ঝিনেদাহ
৬) অধ্যাপক সিরাজুল হক- কুড়িগ্রাম

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, উক্ত ছয়জন এমপি এর মধ্যে কেবল মাত্র মাস্টার মুহাম্মদ সফিকউল্লাহ ও এ.এস.এম মোজাম্মেল হক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে ছিলেন, বাকি ৪ জন আই, ডি, এল-এ থেকে যান।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ফলে এদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বন্দ হয়ে যায়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌমভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকেই জামায়াতে ইসলামী এবং তার সমস্ত জনশক্তি মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নেন এবং আন্তরিকভাবে তারা নিজ মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ৬ই জুন থেকে তারা ব্যক্তি গঠন এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। একই সাথে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও জামায়াতের তৎপরতা শুরু হয় এবং শুধু তিন দফা দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখে।

১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে বাকশাল গঠন করলে এদেশে সকল দলের রাজনৈতিক তৎপরতা বে-আইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ সনের ৩রা মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জারিকৃত একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদটি বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সনের ৩০ মে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অনুমোদিত হওয়ায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পথ সুগম হয় এবং ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

১৯৭৮ সালে ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ফরমান বলে এক দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। ফলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালের ৬ জুলাই স্বনামে পুনর্গঠিত হবার লক্ষ্যে সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য- তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য একটি বিধি জারী করেন। মূলত ঐ বিধির অধীনে অনুমোদন লাভের উদ্দেশে আবেদন করা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। এ

www.bjilibrary.com

লক্ষ্যে জামায়াতের সিনিয়র নেতা জনাব আব্বাস আলী খানকে আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের মে মাসের ২৫,২৬ ও ২৭ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী এক কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক করা হয় সিনিয়র নেতা জনাব শামছুর রহমানকে এবং জামায়াতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক করা হয় অধ্যাপক সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীকে।

১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে উক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে প্রায় ১,০০০ (এক হাজার) প্রতিনিধি উক্ত কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৪৮ জন ছিলেন রুকন যার মধ্যে ১১ জন ছিলেন মহিলা। সর্বসম্মতিক্রমে জামায়াতে ইসলামীর স্বনামে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনসহ সম্মেলনের সকল অধিবেশনেই জনাব আব্বাস আলী খান সভাপতিত্ব করেন। জামায়াতের সবচেয়ে বর্ষিয়ান নেতা জনাব শামসুর রহমান সম্মেলন পরিচালনা করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন অন্য দুই সিনিয়র নেতা মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও জনাব আবদুল খালেক। অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে সম্মেলনের কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারেননি। তিনি শুধু সমাপনী অধিবেশনে 'বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি কার্যসূচি' শিরোনামে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন উহাই পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৯ সালের আভ্যন্তরীন সাংগঠনিক নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমীর নির্বাচিত হন এবং ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব আব্বাস আলী খান। এ সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। জীবনে যা দেখলাম - অধ্যাপক গোলাম আযম।
২। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা - অধ্যাপক গোলাম আযম।
৩। পলাশী থেকে বাংলাদেশ - অধ্যাপক গোলাম আযম।
৪। মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস - আব্বাস আলী খান।
৫। স্মৃতি সাগরের ঢেউ - আব্বাস আলী খান।
৬। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস - আব্বাস আলী খান।
৭। রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী - এ. কে. এম. নাজির আহমদ।
৮। একশ' বছরের রাজনীতি - আবুল আসাদ।
৯। কালো পঁচিশের আগে ও পরে - আবুল আসাদ।
১০। মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১ - পিনাকী ভট্টাচার্য।
১১। জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ - অলি আহাদ।
১২। মূলধারা '৭১ - মঈদুল হাসান।
১৩। তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা - শারমিন আহমদ।
১৪। দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান - লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এ. এ. কে. নিয়াজি।
১৫। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল - মওদুদ আহমদ।
১৬। অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন - মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার।
১৭। একাত্তরের চিঠি - মুক্তিযোদ্ধা টিটু।
১৮। আর্মি, বিডিআর ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আইন ও অধ্যাদেশ - এড. মোঃ খায়রুল আহসান মিন্টু।
১৯। রাজভবন থেকে বঙ্গভবন - আবু জাফর।

www.bjilibrary.com